সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
হইতে শ্রীবীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

চৈত্র ১৩৫৩

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, বি-এ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

আমার যে সমস্ত সাহিত্যিক নিবন্ধ প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া নানা মাসিক পত্রে ও বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, সরস্বতী লাইব্রেরীর সত্বাধিকারীর উৎসাহে ও কয়েকজন ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনা সহকর্মীবৃন্দের আগ্রহে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু কালক্রমের দিক্ দিয়া মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। 'রূপকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমার সর্বপ্রথম রচনা, বাংলা সাহিত্যের অনভ্যস্ত ক্ষেত্রে পদক্ষেপের প্রথম প্রচেষ্টা। 'শৈলী ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিবর্ষ-সমাপ্তির উপলক্ষে লিখিত—কাজেই বর্তমান সময়ের পাঠকের পক্ষে ইহার অসম্পূর্ণতা সহজেই অনুভূত হইবে। রবীন্দ্র-কাব্যের পরবর্তী স্তরের যে আলোচনা আর দুইটি প্রবন্ধে অনুসৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা মোটামুটি সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উপর লিখিত নিবন্ধগুলি মূলতঃ রসানুভূতির দিক্ হইতে লেখা। এগুলিতে তাঁহাদের সম্পর্কে যে দুরূহ সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার সমাধান-চেষ্টা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তাঁহাদের স্থান-নির্ণয় গৌণভাবে আলোচিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের যে নূতন পুঁথিটি বনপাশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এখনও ছাপিতে পারা যায় নাই। নবাবিষ্কৃত পদগুলি সহ সম্পূর্ণ পুঁথিটি প্রকাশিত হইলে চণ্ডীদাস-সমস্যার উপর যে নূতন আলোকপাত হইবে ইহা আশা করা যায়। তবে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও অনাবিষ্কৃত উপকরণগুলির সংগ্রহের উপর নির্ভর করে।

এই প্রবন্ধসমূহের ভিতর দিয়া হয়ত আলোচনার মূলসূত্র বা সমালোচকের দৃষ্টিভংগীর বৈশিষ্ট্যের আভাস মিলিতে পারে। কিন্তু আমি জ্ঞাতসারে কোনও বিশেষ সমালোচনা-নীতি অনুসরণ করি নাই। প্রাথমিক সূত্রের আলোচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ কবি বা সাহিত্যিকের মধ্যে এই সূত্রসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ, তাঁহাদের সৌন্দর্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের নির্ধারণ ও রসোপভোগ-প্রয়াসই আমার নিকট অধিক প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয়। কাজেই যাঁহারা সাহিত্যালোচনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেন,

তাঁহারা হয়ত এই রচনাগুলিতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন না। সাহিত্য-রসাস্বাদন কার্যে নানা বিচিত্র দৃষ্টিভংগী ও আলোচনা-পদ্ধতির অবসর আছে—এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচকের সমবেত প্রচেষ্টায়ই সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয়-লাভ সম্ভব। অনন্ত-বিচিত্র রসসমুদ্র হইতে আমার ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে যতটুকু উঠিয়াছে তাহাই পাঠকবর্গের মধ্যে পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আমার আলোচ্য বিষয়গুলির যে অন্যান্য দৃষ্টিভংগী হইতে আলোচনা সম্ভব ও সমীচীন, তাহা স্বীকার করিতে আমার কোন কুণ্ঠা নাই। ইংরেজী ও অন্যান্য প্রগতিশীল ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলা সাহিত্যের রসমূলক আলোচনা পরিমাণে অল্প ও পরিধিতে সংকীর্ণ; সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে ইহার যত বেশী প্রসার হইবে ততই ইহার সৌন্দর্যের নূতন নূতন দিক উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। সমালোচনা-জাতীয় রচনার প্রসারই এখন বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রয়োজন এবং ভরসা করি আমাদের মধ্যে যাঁহারা মৌলিক স্রষ্টা নহেন, তাঁহাদের মুখ্য প্রচেষ্টা এইদিকেই নিয়োজিত হইবে। নূতন সৃষ্টির জোয়ার আসিবার পূর্বে, পুরাতনের উপভোগ ও মূল্য নির্ধারণ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করাই নবীনের প্রত্যুদ্গমনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।

বিনীত—

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ,
কলিকাতা
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৩ সাল

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	৴০—৵০
রূপকথা	...	১—৮
বিদ্যাপতি	...	৯—৪৯
গ্রীয়ারসন সংগৃহীত বিদ্যাপতির পদের আলোচনা	...	৫০—৭২
চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি	...	৭৩—১৩৪
উপন্যাসের প্রকৃতি ও বিচার পদ্ধতি	...	১৩৫—১৪৪
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র	...	১৪৫—১৫৮
শৈলী ও রবীন্দ্রনাথ	...	১৫৯—১৭৯
রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য	...	১৮০—২০৪
রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা	...	২০৫—২৩১
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যাযের কবিতা	...	২৩২—২৫০
রাজলক্ষ্মী ও কমললতা	...	২৫১—২৬১
বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব	...	২৬২—২৭৬
বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ	...	২৭৭—২৯৮

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

রূপকথা

(১)

রূপকথা বা উপকথা—কোন্‌টি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধরূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণরা করিবেন। কিন্তু এই দুইটি নামের অন্তরালে দুই বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের, দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উপকথা নামটির পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞা সেই ভাব। কোন গুরুগম্ভীর বয়স্কলোক শিশুদের খেলা দেখিয়া যে একপ্রকার সহানুভূতিমিশ্র নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন, উপকথার উপর সাংসারিক লোকের যেন সেই প্রকারের নাসিকা-কুঞ্চন। পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত, সংকুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই অতীতে প্রত্যাবর্তন সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে

প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন-চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায় আবিষ্কার, তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্ম-মোচনের চেষ্টা। অতীতের সরল, সমস্যা-বিরল, মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসংকুল জীবনকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মত রক্ষণ-শীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, সুতরাং এই নব জাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার, অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ কেবল যে একটা নূতন ধরণের সাহিত্যিক খেলা তাহা নহে, একটা পবিত্র কর্তব্যও বটে। সেইজন্য অতীতের মন্দিরতলে দুইদল সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকৃতির লোক যাইয়া সমবেত হইতেছে ;—এক স্বপ্নপ্রবণ বিরাম-বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তি-কুঞ্জ রচনা করিতেছে ; আর এক উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল তাহাদের সমস্ত কৌতূহলের সহিত তাহার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রবল কৌতূহলের ধারা রূপকথাকেও ঠাকুরমার মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে এবং আধুনিক সমালোচকেরা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি ; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য : সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ আশা-আশংকা-উদ্বেল শিশুহৃদয়, এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর ; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা ষ্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বইএর পাতায় ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের

কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি—যাঁহার মনে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া করিয়া দিয়াছে,—তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশ্‌গুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্যে, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।

(২)

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ—ইহার অলীকতা ও অবাস্তবতা। অবশ্য, বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নাই, এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গাড়িলেই, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্বাসিত করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ, বিড়ম্বিত জীবন-নাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের মত বিস্তৃত, ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রকৃতি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলে মানব-মন তাহার অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব

নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল, যাহারা মুহূর্তমাত্র হৃদয়ে উঠিয়া পরমুহূর্তেই বিলীন হয়, যাহারা আমাদের বাহ্যজীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে না ও যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই প্রায় অচেতন, তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং তাহারাও বাস্তবতার দাবী করিতে পারে। সুতরাং রূপকথা আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অসম্ভব আশা-কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহারা যে অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়,' একথা বলিতে পারি না। তাহারা এখন অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে, কিন্তু স্ফুটতাই বাস্তবতার একমাত্র লক্ষণ নহে।

রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদেব মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ লাভ, পাপপুণ্যের জয় পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব রাক্ষস-খোক্কস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা-বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র; যে অনুকূল দৈব বেংগমা-বেংগমীর রূপে সেই-সমস্ত রাক্ষস-খোক্কসের মৃত্যুরহস্য আমাদিগকে শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলংকের স্খালন করেন এবং তাঁহার উপেক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গূঢ় অভিমান পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবালপালংকে নিদ্রামগ্না থাকেন, তিনি আমাদের

গোপন অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী ; যে বাধাবিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার রাজপুত্র নিজ প্রিয়াকে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্তমান বণিক্‌ধর্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মাত্র। পাতালপুরে নাগকন্যার প্রাসাদ-প্রাংগণে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার মণিমাণিক্য-দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, পরিচিততম সূর্যালোকের দর্শন পাই।

(৩)

এই রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক-সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন, এখানে ব্যক্তি-বিশেষের কোন কথা নাই, সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাংক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি অদ্ভুত গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যেন জাতির আত্মা বৃন্তহীন পুষ্পসম 'আপনাতে আপনি বিকশি'ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে-গাথায়ও সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের অভাব লক্ষিত হয় ; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম—কোথাও লেখকের নিজের এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। রাজা-রাজড়ার কথা ইহার বিষয়-বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ, সাময়িক সংকেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য যখন উদিত হইয়াছে, তখন তাহার কিরণ হইতে তাঁহার দরিদ্র উপকারকও বঞ্চিত হয় নাই। সর্বত্রই একটা সাম্য-শান্তির ভাব, সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরংগভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার ভাষা একেবারে মৌন হইয়া আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই

রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে! ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায় যে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িণীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভংগ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্ত্রীর করুণার্দ্র, অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য ও সৌন্দর্য আছে; ইহার অন্তর্নিহিত, গভীর, করুণ রস সরল, শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যিকতা-বর্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দ্রবীভূত করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত সুদুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্মর জাগাইয়া তোলে। এইরূপে রূপকথা বাস্তবজীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয়; এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

(৪)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। এখন রূপকথা আমাদের জীবনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের মধ্যে যাহারা কবি-প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেকে অনেক সময় এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের

মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখেন। সেখানকার মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্ব-শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, যেখানে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোনপ্রকার দুঃসাহসিকতার অবসর থাকে না সেখানে অনেক সময় এই রূপকথার খোলা জানালা দিয়াই আমরা বিচিত্র কল্পলোকের পরিচয় লাভ করি ও 'বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী' আমাদের কর্ণপথে ধ্বনিত হয়। অনেক ইংরেজ কবি রূপকথার প্রতি তাঁহাদের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছিল, কিরূপে ইহার সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুচিত্তের উপর রূপকথার এই মায়াময় স্পর্শটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবিত্ব-সৌভাগ্যের অনধিকারী তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও তাহার অন্তরে একটি কুহেলিকাময় প্রদেশ আছে, যাহা হইতে তাহার সমস্ত রঙীন, অসম্ভব কল্পনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা সমস্ত তর্ক যুক্তি বাস্তবতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মনে একটি ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পনালোক রচনা করে। প্রত্যেকেই তাহার প্রাত্যহিক, নীরস, যন্ত্রবদ্ধ কাজের অবসরে এই কল্পলোকে, এই কল্পনার দুর্গে ক্ষণিক আশ্রয় গ্রহণ করে ; এখানে বসিয়াই সে আকাশকুসুম চয়ন করে ও শূন্যে প্রাসাদ-নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদেব জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের উন্মুখ আশাকে 'পতংগবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' আকর্ষণ করে,—এই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক-রচনায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম ভিত্তি-স্থাপনের প্রশংসা রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথারাজ্যের যে মেঘখণ্ড আমাদের শিশু-অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয়, তাহাই পরবর্তী জীবনের রহস্যবোধকে, তাহার সমস্ত আলো-ছায়া-ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনে : এবং সেই সঞ্চিত মেঘরাশির

চতুর্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুৎবিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক ও উচ্ছ্বাস-চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ়জীবনের উপরও তাহার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

বিদ্যাপতি

(১)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের আদিম উৎস। ভগীরথ যেমন মহাদেবের জটাজালবদ্ধ ভাগীরথীকে সাধারণ ব্যবহারের সমতল ভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সংস্কৃত পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের সুদৃঢ় বেষ্টনী হইতে মুক্তি দিয়া নবজাত প্রাদেশিক ভাষার উচ্ছ্বসিত, কূলপ্লাবী প্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত জনসাধারণ ও কাব্যরসিকের মনে প্রেমানুভূতির যে আবেগ যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, হাসিকান্নার যে নিবিড় আবেশ অপরূপ ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়াছে, ইঁহারা সেই সনাতন হৃদয়-লীলার সহিত বৃন্দাবন-লীলার সংযোগের পথ প্রদর্শক। 'দেবতারে প্রিয় ও প্রিয়েরে দেবতা' করিয়া ধর্মসাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সহজ রসমাধুর্য ও সৌন্দর্যবোধের স্ফুরণ করিতে হয়, ইঁহাদের কবিতায় তাহা প্রথম পরিস্ফুট। তাই ইঁহারা যে বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার আবেদন কেবল একটা বিশেষ ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, মানবের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের উৎস শুকাইয়া গেলেও এই কবিতার কোন ক্ষতি হয় নাই। অন্তরের স্বতঃউৎসারিত অফুরন্ত নির্ঝর এই শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হইয়া ইহার শ্যামল সরসতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের হাতে অক্ষয়মিলনের চিহ্নস্বরূপ এক রাগরক্ত রাখীবন্ধন পরাইয়া দিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী যখন সংস্কৃতের গণ্ডী ছাড়াইয়া প্রাদেশিক ভাষার আলোচ্য বিষয় হইল, তখন ইহার একটা গভীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অলৌকিকতার পরিমণ্ডলে জাত, ভক্তি ও সম্ভ্রমে অবগুণ্ঠিত, সংস্কৃত শ্লোকের আবেগহীন শিল্প-সৌন্দর্য ও ছন্দোগাম্ভীর্যের আচ্ছাদনে সুসংবৃত এই ঐশী প্রেম প্রাচীন মৈথিলী ও বাংলার স্পর্শে যেন নূতন প্রাণশক্তিতে চঞ্চল, নূতন আবেগে মর্মস্পর্শী ও নূতন গতিভংগীতে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা ও তাহাদের মনোভাবের স্তর-নির্দেশে প্রাচীন

আলংকারিক রীতি অনুসৃত হইলেও বাস্তব প্রতিবেশের সম্পর্কে, বাস্তব অনুভূতির স্পর্শে এই প্রেমের মধ্যে রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে; পুরাতন ভাব নূতন ভাষায় আত্মপ্রকাশের তাগিদে যেন নব উপলব্ধির প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছে ও অজস্র, অফুরন্ত ছন্দোবৈচিত্র্যে ইহাকে রূপায়িত করিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতায় এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ রূপ প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে কে অগ্রবর্তী তাহা অনিশ্চিত। তবে বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রাচীন ধারার সহিত আরও প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা বলা যাইতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রথম অংশে পুরাতন কাব্য-রীতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ইতর কলহ ও পূর্বরাগবর্জিত লোলুপতার অবাঞ্ছিত প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছে। শেষের দিকে কবি কৃষ্ণকে ঔদাসীন্যে অবিচলিত রাখিয়া রাধার প্রণয়াকাংক্ষাকে বিরহবেদনা ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনের দ্বারা মার্জিত ও বিশুদ্ধ করিয়া আবার সনাতন ভাবমাধুর্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় বড়ু চণ্ডীদাসের প্রথানুগত্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ ইহাই অনুমান হয়। বড়ু যেন মহাজন-নির্দিষ্ট মূল স্রোত ছাড়িয়া এক অখ্যাত, আভিজাত্য-মর্যাদাহীন শাখাপথে তাঁহার কল্পনার তরণীকে বাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; শেষ পর্যন্ত প্রবাহের অনিবার্য আকর্ষণে নৌকার মুখ ফিরাইয়া আবার বৈষ্ণব ভাবধারার সাগরসংগমে অন্যান্য তীর্থযাত্রীর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৈষ্ণবকাব্যের এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ভাষান্তরের পূর্বেই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' লক্ষিত হয়। জয়দেব অবশ্য সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই কাব্য সম্পূর্ণরূপে গীতি-ধর্মী। সংস্কৃতকাব্যের নিরুচ্ছ্বসিত সুরের অনুরূপ সুরগাম্ভীর্য জয়দেবের কাব্যে শ্লোকের বন্ধন ও ভাবের সংযম ছিঁড়িয়া বিগলিত হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত তরংগে নৃত্যছন্দে বহিয়া গিয়াছে। ললিতশব্দ-বিন্যাস, ছন্দোমাধুর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাবেশে প্রেমের ইন্দ্রজালমণ্ডিত আদর্শ পটভূমিকার রচনা—ইহাই জয়দেবের মৌলিক সৃষ্টি। তাঁহার কাব্যে ভাবগভীরতা অলংকারবাহুল্যের প্রাধান্যের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে; শব্দঝংকার সময় সময় অর্থসংগতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে হৃদয়ের গভীরতা হইতে উৎসারিত আবেগের কোন মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি আমাদের মনকে অভিভূত করে না—সৌন্দর্য ও সংগীততরংগে ভাসিতে ভাসিতে আমরা

যেন অসহায়ভাবে এক অস্পষ্ট মোহাবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করি। তাঁহার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় উক্তি

'স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারং'

যেন নিজ অপরূপ সংগীত-গুঞ্জনের অন্তরালে পুরাতন আধ্যাত্মিকতা ও নূতন সৌন্দর্যপিপাসার মধ্যে এক অমীমাংসিত আদর্শ-সংঘাতকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

জয়দেব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে ধর্মশাস্ত্রের আবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া ও ইহাকে সাত শত বৎসর হইতে প্রবাহিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত শৃংগাররসাত্মক কাব্যধারার সহিত সংযুক্ত করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ প্রসার ও পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। জয়দেবে মাধুর্যসৃষ্টি মুখ্য উদ্দেশ্য; আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা অপেক্ষাকৃত গৌণ। দার্শনিক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত অশরীরী, অলৌকিক প্রেমের মধ্যে তিনি প্রাকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ ও রসানুভূতি সঞ্চার করিয়া ইহাকে কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ভবিষ্যৎ যুগের সমস্ত প্রেমের কবি অতঃপর ইহাকে তাঁহাদের হৃদয়াকুতি প্রকাশের প্রধান উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের অন্তর-বিগলিত সমস্ত রসধারা, তাঁহাদের সৌন্দর্য-সৃষ্টির মুখ্য প্রয়াস এই খাতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবাদবাক্যের মূলে আছে প্রধানতঃ জয়দেবের প্রভাব। জয়দেবের দ্বিতীয় অবদান হইতেছে রাধাচরিত্রের এক প্রকার নূতন করিয়া সৃষ্টি। তিনিই রাধিকাকে ধর্মশাস্ত্রের ধূসর অনামিকতা হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে প্রেমিকের হৃদয়াকাশে তীব্র জ্যোতির্ময়ী শুকতারা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জয়দেবই প্রথম রাধার প্রতি অলংকারশাস্ত্রবর্ণিত শ্রেষ্ঠ নায়িকার রূপ-গুণ আরোপ করিয়া পূর্বরাগ, সম্ভোগ, মান, বিরহ প্রভৃতি নানা ভাবান্তরের ভিতর তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিয়া, তাঁহার মধ্যে লোকোত্তর মহিমা ও ললিত মাধুর্যের সমন্বয় ঘটাইয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কেলি-কৌতুক ও গভীরতর কামনা-সাধনার পাত্রী ও প্রেরণাশক্তিরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কাব্যজগতে ও পাঠকের মনোজগতে আদর্শ প্রেমিকার রত্নবেদীতে বসাইয়াছেন।

জয়দেব ঐশী প্রেম আলোচনায় যে শৃংগার-রসপ্রাধান্যের ধারা প্রবর্তন করিলেন বিদ্যাপতি তাহাকেই নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মধুর রসপ্রবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সুরটি কতকটা অধঃকৃত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। আবার, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর, তাঁহার জীবনব্যাপী নিগূঢ় অনুভূতির উৎস-মুখ হইতে উদ্ভূত এক কূলপ্লাবী অধ্যাত্মভাবের প্লাবন পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য-সম্ভোগ বর্ণনার বেগবান তরংগোচ্ছ্বাসের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে। এই চৈতন্যোত্তর কবিতায় দেহসৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্রণের নগ্ন আতিশয্যের মধ্যে এক প্রকার শিশুসুলভ, নিষ্পাপ সরলতা, আত্মবিস্মৃত ভক্তিবিহ্বলতা ও অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা অনুভূত হইয়া ইহাকে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর বিকারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। বিদ্যাপতি জয়দেব ও চৈতন্যদেবের মধ্যবর্তী যুগের লোক। কাজেই সাধারণতঃ তাঁহার কবিতায় চৈতন্যপ্রকটিত ভক্তিবাদের ছাপ দেখিবার আশা করা যায় না। বিচারের এই মানদণ্ড-প্রয়োগে ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ফলে তাঁহার নামে প্রচলিত যে সমস্ত পদে চৈতন্যোত্তর যুগের সুর অনুভূত হয় সেগুলি পরবর্তী বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। তবে প্রতিভার পূর্ব সংস্কার বলে বিদ্যাপতি যে কোন কোন স্থলে এই ভাবগভীরতা অনুভব করেন নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। পরবর্তী লেখকের প্রক্ষেপ বাদ দিয়া বিদ্যাপতির খাঁটি পদগুলি নির্ধারণ তাঁহার সম্বন্ধে একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসিত হইলে বিদ্যাপতির মধ্যে বিশিষ্ট বৈষ্ণব-ভাবধারার পরিমাণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের প্রকাশভংগী ও হৃদয়োচ্ছ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভাবগভীরতার সংযোগ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে 'গীতগোবিন্দের' কয়েকটি অংশের চমৎকার ভাবানুবাদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিও সাধারণভাবে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে পুরাতন ভাবধারার মধ্যে যতটা গভীর ভাবাবেগ সংক্রামিত করা সম্ভব ইঁহারা তাহা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভাব-তন্ময়তা, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণের পূর্বাভাস ইঁহাদের রচনায় কিছু কিছু পাওয়া যায়. তবে ইহা প্রতিভার পূর্বসংস্কারের প্রমাণ না পরবর্তীকালের সংযোজনা তাহা মতভেদের বিষয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতীকরূপেই পরবর্তী যুগের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন—তাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় এই প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদার অন্তরালে অনেকটা আত্মগোপন করিয়াছে। ইঁহাদের নামের চারিদিকে অনেক মধুর পরিকল্পনা, অনেক কবিত্বমণ্ডিত কিংবদন্তী জড়িত

হইয়াছে। মাথুর বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্মিলনের ন্যায় এই দুই ভক্ত কবির গংগাতীরে মিলন ও অশ্রুজলসিক্ত প্রেমালিংগনের কাহিনী কবি-কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে ইতিহাস শুধু যাহা ঘটিয়াছে তাহারই অনুবর্তী নহে, আদর্শ সুষমা ও সংগতির নীতি অনুসারে যাহা ঘটা উচিত ছিল তাহারই প্রকটীকরণ। চৈতন্যদেবের চরিত-গ্রন্থসমূহে তথ্যবিবৃতি এই নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারক্রমে এই ভক্তজনবাঞ্ছিত ও অন্তরপ্রেরণাপ্রণোদিত মিলনের কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। তথাপি এই সমস্ত কল্পনাবিলাস বাদ দিয়াও বিদ্যাপতির বহির্জীবন আমাদের নিকট অনেকাংশে সুপরিচিত। বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীতে তাঁহার জন্য যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকুই তাঁহার সম্বন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(২)

বিদ্যাপতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একেবারে অবিমিশ্র বৈষ্ণব প্রতিবেশ হইতে তাঁহাব কাব্যপ্রেরণা স্ফুরিত হয় নাই। তাঁহার ধর্মমত যে কি ছিল তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চোপাসক ক্রিয়াবান্ মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। খাঁটি বৈষ্ণবেরা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য বৈষ্ণবকবির ন্যায় পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া দাবী করেন। এ প্রশ্নের মীমাংসার যথেষ্ট উপাদান না থাকিলেও, তাঁহার পদাবলীর প্রমাণে বলা যায় যে তাঁহার ভক্তি শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত দেব-দেবীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত কবিতাতে আন্তরিকতার সুরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ আত্ম-বিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তিবিহ্বলতার সহিত রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের মাধুরীর অনুধ্যান করিয়াছেন, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে সেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিষ্ঠার নিদর্শন মিলে না। তাঁহার উদার ধর্মমত ভগবানের সমস্ত রূপের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছে—তাহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব। তিনি যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ মহাদেবের খেয়াল ও পাগলামীতেও স্নিগ্ধ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার রুধিরলিপ্তা, লোলজিহ্ব মহাকালীর মূর্তিরও ভয়াবহ মহিমা

উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্বে, প্রচণ্ড, সর্বগ্রাসী ভক্তিপ্লাবনের বেগ ইহাতে সঞ্চারিত হইবার পূর্বে ইহা একজন বিদগ্ধ, চতুর, রাজসভার আবেষ্টনে বর্ধিত কবির কল্পনাকে কিরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতন্যধর্মে দীক্ষিত খাঁটি বৈষ্ণবকবির সহিত তাঁহার রচনার সুরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কি প্রভেদ, বিদ্যাপতির কবিতা (যদি তাঁহার আসল কবিতা পৃথক করা সম্ভব হয়) আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে।

বিদ্যাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার রচনা হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত হইবে না যে, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী ঠিক খাঁটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার, অপক্ষপাত মনোভাব তাঁহার বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতিমূলক রচনাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটী সুবিখ্যাত পদে তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসনা অতিক্রম করিয়া বিরাট, বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমার জয়গান করিয়াছেন। বরং তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিবের প্রতি পক্ষপাতিত্বই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'কীর্তিলতা'র মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব করা হইয়াছে; জোনপুর নগরের প্রাসাদসৌন্দর্য বর্ণনায় কনক-কলস-মণ্ডিত ধবল শিবমন্দির-শোভা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধঅ ধবল হর ঘর সহস পেখ্খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিআ।"

এইরূপ উপমা ও অলংকার-সন্নিবেশ হইতে লেখকের মানস প্রবণতা, তাঁহার চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। যখন দুই রাজ্যচ্যুত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রজে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সুলতানের নিকট যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া দর্শকদের মনে রাম-লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণ-ন্দ্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে। হয় ত এই গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান, হর বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া ইহাতে মধুর রস অবতারণার বিশেষ অবসর ই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ ইহার বিষয়বস্তুর সহিত খাপ খায় না। হয় যে, যদি লেখকের চিত্ত তাঁহার পরবর্তী যুগের পদাবলী-

রচয়িতাদের ন্যায় এই অনুপম প্রেমরসে অভিষিঞ্চিত থাকিত, তবে কোন না কোন উপলক্ষে, উপাস্য দেবতার প্রতি স্তুতি-নিবেদন বা উপমা-নির্বাচন-ব্যপদেশে এই অমৃতধারার দুই এক বিন্দু যে ক্ষরিত হইত তাহাতে সংশয় নাই। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে যে বিদ্যাপতির স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে কৃষ্ণোপাসনার অসপত্ন একাধিপত্য ছিল না। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্টা কতটা যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুবর্তন, কতটা যে অন্তর্নিহিত ভক্তিপ্রেরণার অনিবার্য প্রকাশ—তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাঁহার রচনায় এই দুই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং সমালোচকের কর্তব্য—এ বিষয়ে কোন পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া, খোলা মন রাখিয়া, প্রত্যেকটী পদের বিচার ও এই বিচার-প্রক্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ।

বিদ্যাপতিব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহার রচনা-তালিকা হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' ছাড়া তিনি শিব, দুর্গা, গংগা প্রভৃতি দেব-দেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দিক দিয়া হয়ত রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিদ্যাপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যে, অলংকারে, দার্শনিক ও রসতত্ত্ব আলোচনায়, সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজবুলির মধ্যবর্তিতায় এক রাধাকৃষ্ণ-লীলারই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোন এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রত্যেক গ্রন্থে নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। পদাবলী রচনা তাঁহার বহুবিস্তৃত সাহিত্যিক প্রচেষ্টার অন্যতম অংশ মাত্র।

ইহা ছাড়াও, বিদ্যাপতি আজীবন মিথিলা-রাজসভা ও রাজবংশের একাধিক প্রতিনিধির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। রাজসভায় থাকিয়া তিনি যে শুধু সাধারণ রাজকবির ন্যায় রাজার উদ্দেশ্যে মামুলি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহা নহে; বিচিত্র ও উত্তেজনাপূর্ণ, ভারতীয় কবির পক্ষে অভূতপূর্ব, অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে মুসলমান বিজয়ের তরংগোচ্ছ্বাস তাঁহার জন্মভূমি তিরহুতের উপর আসিয়া পড়িয়া এক

যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। বিদ্যাপতি এই বিপ্লবের সমস্ত উন্মাদনা, ইহার সমস্ত অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন ও তীব্র, অকুণ্ঠিত বাস্তব-রসপ্রীতির সহিত তাঁহার 'কীর্তিলতা'য় বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কৃতকাব্য ও তাম্রশাসনে রাজার বিজয়াভিযানের যে বিশেষত্ববর্জিত, সমাস ও অলংকারের প্রাচুর্যে গুরুভারাক্রান্ত, বাস্তববোধহীন বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। বিদ্যাপতির যুদ্ধবর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শীর ছাপ মারা। কবি যেন সৈন্যসমাবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার যুদ্ধযাত্রার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি এই অভিযানপর বিরাট বাহিনীর সমস্ত কোলাহল ও বিশৃংখলা, ইহার উচ্ছৃংখল কৌতুকপ্রিয়তা ও অকারণ নিষ্ঠুরতা, প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার উপর ইহার ক্রূর ও অশুভ প্রভাব নিখুঁত রসগ্রাহিতা ও সত্যদৃষ্টির সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। রণাংগনের সংঘর্ষ ও মত্ত আস্ফালন, ইহার ধূলিজাল ও শোণিত-স্রোত, ইহার ঘূর্ণিবায়ুর মত অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ ও ধ্বংসলীলা সম্বন্ধেও লেখক ঠিক একই প্রকারের বাস্তবপ্রধান মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণতঃ কাব্য-পুরাণে আমরা যে সভ্যভব্য, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত, সুপরিচিত রণনীতির অনুসারী দ্বৈরথযুদ্ধের বর্ণনা পাই, ইহা মোটেই সে-জাতীয় নহে। তার পর হিন্দু-মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম সংঘর্ষের পর উভয় জাতির পরস্পরের প্রতি মনোভাব, প্রথম বিরোধের তীব্রতা উপশমের পর পরস্পরকে মানিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশিসুলভ সহনশীলতার উদ্ভব, বিজেতা মুসলমানের ঈষৎ আত্মপ্রাধান্য-গর্ব, সুলতানের প্রসাদ লাভের জন্য হিন্দু রাজন্যবর্গের দরবারে ধৈর্যশীল প্রতীক্ষা—ইত্যাদি ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এই গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়। 'কীর্তিলতার' বিস্তৃত আলোচনার সময় উপরি-উক্ত মন্তব্যের পরিপোষক উক্তি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইবে। এখন আমাদের এইটুকু উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যে বিদ্যাপতি এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়াছেন ও রাজনৈতিক আলোচনা ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা কোন প্রকারেই সাধারণ বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। বৃন্দাবনের নির্জন নিকুঞ্জে ধ্যানবিভোর, নিছক অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টন ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় হইতে নিবর্তিতদৃষ্টি, সংসারবিমুখ বৈষ্ণব কবির সহিত তিনি সমগোত্রীয় ছিলেন না। পদাবলী

সাহিত্যের সুবৃহৎ অংগনে নাম-কীর্তনে তিনি ইহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সুরসাম্যের পিছনে সম্পূর্ণ প্রেরণাগত ঐক্য ছিল কি না সন্দেহ।

রাজসভার সহিত আজীবন সংস্রবের ফলে বিদ্যাপতি একটী বিশেষ গুণ অর্জন করিয়াছিলেন—যাহাকে বাগ্‌বৈদগ্ধ বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ সরল, ভাবপ্রধান গ্রাম্য শ্রোতৃবৃন্দের যে উপায়ে চিত্তরঞ্জন করা যায়, চতুর, সুশিক্ষিত নাগরিকবর্গের মন আকর্ষণ করিতে তদপেক্ষা ভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন হয়। রাজা ও তাঁহার সভাসদেরা কবির নিকট প্রত্যাশা করেন সরল মর্মস্পর্শী আবেগের পরিবর্তে চমকপ্রদ, তীক্ষ্ণাগ্র উক্তি-পরম্পরা, সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ বেশে সাজাইবার কৌশল, শব্দবিন্যাস ও উপমানির্বাচনের বিশেষ পারিপাট্য। বিদ্যাপতির কবিতায় পূর্ণমাত্রায় রাজপ্রতিবেশ-প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার পদাবলী স্মরণীয় প্রবাদবাক্য, সুভাষিত-সংগ্রহ ও প্রণয়কলা-চাতুরীর অভিজ্ঞতার নিদর্শনে পূর্ণ। সময় সময় মনে হয় যে, গভীর ভাবোদ্রেক অপেক্ষা এই সমস্ত শাণিত উক্তিবিন্যাসেই লেখক সমধিক আগ্রহশীল। তাঁহার অনেকগুলি পদ আগাগোড়া প্রবাদসমষ্টি; এগুলিতে বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুশীলনে ভাবমাধুর্য, এমন কি ভাবসংহতিও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আর এই প্রবাদগুলির অধিকাংশই যে বাংলা দেশের জল-মাটিতে জন্মে নাই, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে দানা বাঁধে নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়। এগুলির উপর বিহার অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সেখান হইতে আহরিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষিত হয়। লেখক তাঁহার ভাব প্রকাশের জন্য এমন অনেক উপমা নির্বাচন করিয়াছেন যাহা বাংগালী কবির মনে কখনই উদয় হইত না এবং যাহা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার সাধারণ কোষাগার সংস্কৃত কাব্য-অলংকার হইতেও সংগৃহীত নহে। সুতরাং তাঁহার ভাষা ছাড়াও এই উপমা-বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও তাঁহার অবাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হয়। সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে বিদ্যাপতির রচনারীতি ও মানসভংগী রাজসভার রুচি ও তাগিদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি যেন ভারতচন্দ্রের আদিপুরুষ। অবশ্য ভারতচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার কল্পনাশক্তি ও ভাবগভীরতা অনেক বেশী ছিল; তথাপি উভয়ে যেন এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির পদে হীরা মালিনীর পূর্বপুরুষস্থানীয়া কুট্টনীর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কবি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবর্ণনা উপলক্ষে যে রাজপরিবারের দাম্পত্য প্রেমের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন

ও রাজদম্পতির উপর রাধাকৃষ্ণের গৌরবের কিয়দংশ আরোপে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের নামের পুনঃপুনঃ সসম্ভ্রম উল্লেখে পরিস্ফুট।

(৩)

অবশ্য প্রণয়লীলা সম্বন্ধে এই পরিপক্ক অভিজ্ঞতার নিদর্শন যে কেবল বিদ্যাপতিরই বৈশিষ্ট্য তাহা নহে—সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাতেই ইহা একটি সাধারণ সুর। বৈষ্ণব কবি যখন প্রেমবর্ণনায় ভক্তিবিহ্বল তখনও তিনি কামশাস্ত্র ও রস-বিদগ্ধ সমাজ-জীবনের শিক্ষা বিস্মৃত হন নাই। এই পাকা ওস্তাদি সুর বহু শতাব্দী ধরিয়া অনুশীলিত সংস্কৃত প্রেম-কবিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব কবিতা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছে। পদাবলীতে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রসিকের বিশেষজ্ঞতারও সমন্বয় হইয়াছে। রাধিকা কখনই সরলা, অনভিজ্ঞা নায়িকা-রূপে প্রদর্শিত হন নাই। বয়ঃসন্ধির পদগুলিতে কিশোরীর মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত, প্রথম প্রণয়োন্মেষের চমৎকার চিত্র অংকিত হইয়াছে সত্য; প্রথম অভিসার সময়ে নায়কের ব্যগ্র, আলিংগনোদ্যত বাহুপাশের নিকট নায়িকার সংকুচিত প্রণয়ভীরুতাও কয়েকটি পদে উপভোগ্য ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহাও ঠিক। আবার নায়িকার দুঃসহ বিরহ-বেদনা ও ভাব-তন্ময়তার বর্ণনাতেও পদাবলী-সাহিত্য প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে ইহাও সর্বথা স্বীকার্য।

তথাপি মোটের উপর নায়ক-নায়িকার অভিসার-মিলন-সম্ভোগ প্রভৃতি প্রেমের বিভিন্ন স্তরের রসাস্বাদনে অনুশীলিত রুচি-বৈদগ্ধেরই পরিচয় মিলে। আর এই প্রণয়লীলা সখীর মধ্যবর্তিতায় সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া যেমন একদিকে ইহাতে নাটকীয় গুণ ও স্নিগ্ধ রসমাধুর্যের স্ফুরণ, তেমনই অন্যদিকে পরিণত কলাকৌশল ও শিষ্টরীতি-প্রয়োগেরও অনুবর্তন হইয়াছে। কেন না সখীরা প্রণয়-ব্যাপার-নিপুণা; প্রেমের বিসর্পিল গতির প্রত্যেকটি বংকিম রেখার সহিত পরিচিতা। তাহাদের বিশেষজ্ঞতা নায়িকার অনভিজ্ঞ সারল্যের ত্রুটী সংশোধন করিয়া তাহার প্রেমকে নাগরালির বহু-পদাংকিত রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে। তারপর এই অপরূপ প্রেমলীলার সর্বশেষ অধ্যায়ে এক বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে। মাথুর প্রবাসের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক প্রবল, সর্বগ্রাসী তরংগ আসিয়া সখীদের এই যত্নরচিত ব্যবস্থাকে,

এই পার্থিব প্রেমের ছদ্ম অভিনয়কে কোন্ অতলে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন একদিকে রাধিকার অতলস্পর্শ, অপ্রমেয় বেদনা, অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণের নিয়তির মত নিষ্ঠুর নিশ্চলতা ; উভয়ের মধ্যে মধ্যবর্তিতার আর কোন অবকাশ নাই। সখীদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অবশ্য তাহারা মাঝে মাঝে মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে যাতায়াত করিয়া বিস্মৃতিশীল নায়ককে শ্লেষপূর্ণ ভর্ৎসনা ও নায়িকার দুঃসহ ব্যথার কথা শোনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দৌত্য হংস, পবন প্রভৃতি মনুষ্যেতর বাহনের দৌত্যের ন্যায় নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই সান্ত্বনাহীন বিরহ-বেদনা, এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি, এই চিরন্তন ব্যাকুলতা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের জন্য আধ্যাত্মিকতার অক্ষয় স্বর্গ রচনা করিয়াছে।

প্রণয়ের আস্বাদনে বিদগ্ধ-রুচির পরিচয় বৈষ্ণব কবিতার সাধারণ সুর হইলেও এ বিষয়ে বিদ্যাপতির কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' রাধা ও কৃষ্ণের বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে অনুরূপ শ্লেষোক্তি-বিন্যাস ও প্রবাদবাক্য-সংকলনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এই কথা-কাটাকাটির মধ্যে লেখকের নৈসর্গিক প্রতিভা বাদ দিলে স্থূল, অমার্জিত রুচিরই, গ্রাম্য আতিশয্যেরই পরিচয় মিলে। ইহাতে সরল, খোলাখুলি, শ্লীলতার অনুশাসনলংঘী কথাবার্তার দ্বারাই কলহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ; এখানে রাজসভা-সুলভ পরোক্ষ ইংগিত ও বংকিম কটাক্ষের সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যের বালাই নাই। আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি না যে বড়ু চণ্ডীদাসের শাণিত উক্তিগুলি কোন অভিজাত সমাজের ছদ্মবেশী শিষ্টাচার-রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে রাধিকা ও সখীসম্প্রদায়ের মুখে কৃষ্ণের প্রতি যে ভর্ৎসনাবাক্য শুনা যায় তাহা ভিন্নজাতীয়। অবশ্য এই কপট কলহে নায়কের কোন পাল্টা জবাব দিবার চেষ্টা নাই, আছে কেবল বিনীত আত্মদোষক্ষালন বা কাতর প্রসাদ-ভিক্ষা। 'শঠ', 'লম্পট', 'শতঘরিয়া' প্রভৃতি গালিগুলি মার্জিত-অমার্জিত রুচির ধার ধারে না—এগুলির ভিতর দিয়া যেন সোহাগের মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজ কবির ভাষায় ইহা সেই ধরণের মিষ্ট ভর্ৎসনা যাহা শুনিবার জন্য দোষের পুনরভিনয়ের প্রলোভন জাগে। বিদ্যাপতির পদে অনুরূপ উক্তিগুলির মধ্যে বড়ুর গ্রাম্য সরলতা বা পরবর্তী বৈষ্ণব কবির স্নেহবিগলিত সুরটি ঠিক শোনা যায় না। মনে হয় যেন রাজসভার সংসর্গ-প্রভাবেই বিদ্যাপতির প্রেমবর্ণনায় ও নায়কের প্রতি শ্লেষবাক্য-প্রয়োগে স্থানে স্থানে সাংসারিক বহুদর্শিতার ছাপটি এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইতে পারা যায়। (১) আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার মধ্যে জয়দেব যে শৃংগার-রস-প্রধান মাধুর্যের বন্যা বহাইয়া দিলেন বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে তাহারই ধারা সরসতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে (২) চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির জীবনে ও কাব্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

(ক) ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদার মতবাদ কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—তাঁহার ভক্তিপরায়ণতা কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের উপাসনার পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই।

(খ) তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাব্যরচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় অনেক বেশী ছিল—তাঁহার 'কীর্তিলতায়' আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের চমৎকার কবিত্বপূর্ণ, অথচ বাস্তব-রসসমৃদ্ধ বিবরণ পাই।

(গ) মিথিলা রাজসভার সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে তিনি যে মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, সুনিপুণ বাক্‌ভংগী ও শিল্পচাতুর্য এবং প্রেম সম্বন্ধে বহুদর্শী অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা দোষে গুণে তাঁহার পদাবলী-রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রেমের আলোচনায় বড়ু চণ্ডীদাস ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সুরের বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

(৪)

এবার বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে উহাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল হইতে পারে তাহার কিছু নির্দেশ দিবার চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রধান সমস্যা—পরবর্তী প্রক্ষেপ হইতে তাঁহার খাঁটি পদগুলির পৃথকীকরণ—তাহার পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত যে সমস্ত পদ খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত, অথবা যাহাতে ব্রজবুলি ভাষার অন্তরালে বাংলার বাক্যরীতিবৈশিষ্ট্য (idiom) আবিষ্কার করা যায় সেগুলি সহজ কারণেই বিদ্যাপতির হইতে পারে না। মৈথিলী কবির অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় এতখানি অধিকারের সম্ভাব্যতা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত স্বীকার করা যায় না। আবার যে সমস্ত পদে

চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও তাঁহার শিষ্যবর্গপ্রচারিত বৈষ্ণবদর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয় সেগুলিও বিদ্যাপতির রচনা না হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন; কেন না বিদ্যাপতির ন্যায় প্রতিভাশালী কবি গভীর ভক্তিপূর্ণ আবেগের মুহূর্তে যে বর্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের ভক্তি-বিহ্বলতা অনুভব করিবেন তাহাতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। একটি উদাহরণ দ্বারা এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দুরূহতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাপতির পদসংগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সুবিখ্যাত পদ 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' (বিদ্যাপতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংস্করণ, পদ নং ৮৩৩, পৃষ্ঠা ২৭৭) এই বিচার-বিমূঢ়তার জলন্ত নিদর্শন। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের প্রমাণে এই চমৎকার পদটি বিদ্যাপতির নহে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে ও কবিবল্লভ উপাধিধারী পরবর্তী যুগের কোন অখ্যাত বৈষ্ণব কবিকে এই উপাদেয় পদ-রচয়িতার গৌরব অর্পিত হইয়াছে। পদের প্রথম দুইটি পংক্তি উদ্ধার করিয়া সমগ্র পদটী যে কবিবল্লভের—এইরূপ উক্তিও করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির প্রতি সন্দেহের কারণ এই যে পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে অনুরাগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা পরবর্তী যুগের রূপগোস্বামীকৃত বৈষ্ণব রসশাস্ত্র"উজ্জ্বলনীলমণি"র প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত অভিন্ন। আর 'পিরিত' কথাটি চৈতন্যোত্তর যুগের প্রয়োগ। উক্তি দুইটি পাশাপাশি উদ্ধৃত করিলেই উহাদের আশ্চর্যরূপ মিল চোখে পড়িবে।

পদ—সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়।

উজ্জ্বলনীলমণি—সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

একের উপর যে অন্যের প্রভাব আছে এবং উভয়ের ভাবগত মিল যে কেবলমাত্র আকস্মিক নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। এখন কে কাহার নিকট ঋণী ইহাই বিচার্য বিষয়। রূপগোস্বামী যে তাঁহার রসশাস্ত্রের সংজ্ঞা গঠনের জন্য তাঁহার পুর্ববর্তীদের রচনা হইতে দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই আছে। অলংকার-শাস্ত্র শূন্যে নিরলম্বভাবে থাকিতে পারে না। পূর্বতন সুপরিচিত কাব্য-রচনার ভিত্তির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। রূপগোস্বামী তাঁহার অলংকার-গ্রন্থে সংস্কৃত কবিদেরই

উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন; কোন প্রাদেশিক ভাষার কবির রচনা হইতে উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। উহা হয়ত নবজাত প্রাদেশিক ভাষার আভিজাত্য-হীনতার জন্য। তাছাড়া সংস্কৃতে রচিত অলংকারশাস্ত্র যে সংস্কৃত কবির মুখাপেক্ষী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি ইহাও অসম্ভব নয় যে অনুরাগের উক্তরূপ সংজ্ঞা-নির্ণয়ের সময় বিদ্যাপতির এই পদটি তাঁহার স্মৃতির সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, অনুরাগের অন্তর্নিহিত রূপ ও ব্যঞ্জনাটি এই পদে যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা একান্ত বিরল। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে অলংকারের সংজ্ঞা ও উদাহৃত শ্লোকের মধ্যে সম্বন্ধ কেবল তথ্যগত। বিরহবেদনায় রাধিকার মূর্ছা বা কৃশতা হইয়াছে ইহা কোন পদে কেবল তথ্যহিসাবে উল্লিখিত থাকিলেই আলংকারিকের উদ্দেশ্য—বিরহে দশ দশার অস্তিত্বের প্রমাণ—সিদ্ধ হইল। কিন্তু মূর্ছার পিছনে যে গভীর হৃদয়-বিক্ষোভ বা কৃশতার পিছনে যে ভাবাবিষ্ট আত্মবিস্মৃতির পরিচয় থাকা অবশ্য প্রযোজনীয়, কবিতায় তাহা না ফুটিলে কবি যে কেবল জড়ভাবে আলংকারিকের নির্দেশ অনুসরণ করিতেছেন সে সম্বন্ধে অনেক বৈষ্ণব কবি সচেতনতা দেখান নাই। এমন কি প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলির অধিকাংশে ধ্যান-তন্ময়তা ও বহির্বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাবগত রূপায়ন অপেক্ষা তথ্যগত উল্লেখই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য পদটি এই দিক দিয়া একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্তি, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান, সৌন্দর্যের খণ্ডিত, আংশিক প্রকাশ হইতে উহার মূল প্রস্রবণের দিকে দুরূহ অভিযান, রূপে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, অনায়ত্তের দিকে ব্যাকুল হস্ত-প্রসারণ—ইত্যাদিপ্রকার প্রেমের দুরবগাহ মহিমা ও আকর্ষণের সুরটি এই কবিতায় যেরূপ আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতি-সমূহের মধ্যে স্থানলাভের উপযুক্ত। কীট্সের সৌন্দর্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও শেলীর আদর্শসন্ধানে ঊর্ধ্বাভিযান-পিয়াসী হৃদয়াবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড় একাত্মতায় যুক্ত হইয়াছে।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ* বখানিঅ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

---

* গ্রিয়ারসন-সংগৃহীত ৬৫৯ নং পদেও অনুরাগ শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে।

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শূনল
শ্রুতিপথ পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভস গমাওল
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস আমোদই
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক॥

এই মহাগীতি যে কোন মহাকবির প্রতিভা হইতে উৎসারিত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতি ছাড়া কোন কবিকে ইহার রচয়িতা বলিয়া কল্পনা করা যায় না। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদে অনুরূপ সুরের গভীরতা মিলে, কিন্তু উহার প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রেমের রহস্যময় বিপরীত-ধর্মিত্ব, ইহার আনন্দ-বেদনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত প্রকৃতি, ইহার সর্বনাশা আকর্ষণ, সবভোলান মোহ এই সমস্ত পদে সার্বভৌম ব্যঞ্জনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আলোচ্য পদের কল্পনার বিশাল, বিশ্বব্যাপী, অসীম কালে প্রসারিত, সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদকারী পরিধি (cosmic imagination) চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসে নাই। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসে গভীরতা আছে, বর্তমান পদে গভীরতা ছাড়া বিরাট ব্যাপ্তি আছে। বিদ্যাপতির অসন্দিগ্ধ দুই একটি পদেও (যাহা অন্য কাহারও জন্য দাবী করা হয় নাই) এই সৃষ্টিবেষ্টনকারী কল্পনা-পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ দুইটি পদ (৮৩৬, ৮৩৭ সংখ্যক পদ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সংস্করণ) উদ্ধৃত

(৮৩৬)

মাধব, বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনি ছাড়বি মোয়॥

গণইতে দোস গুণলেস না পাওবি
জব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁহু জগনাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নই ছার॥
কি এ মানুস পশু পখী ভএ জনমিএ
অথবা কীট-পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনুপুনু
মতি রহ তুঅ পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইত ইহ ভব-সিন্ধু।
তুআ পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

৮৩৭

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণি সমাজ।
তোহে বিসরি মন তাহে সমরপল
অব মঝু হব কোন কাজ॥
মাধব, হম পরিণাম নিরাসা।
তুহু জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিসবাসা॥
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা সিশু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমণি- রভস-রঙ্গ মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুঅ আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥

ভনই বিদ্যাপতি সেস সমন ভয়
তুঅ বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহাওসি অব
তারণ ভার তোহারা॥

এই পদগুলির মধ্যে কি কল্পনার একইরূপ বৈশিষ্ট্য, সুরের অভিন্নত্ব অনুভব করা যায় না? এগুলিকে কি একই কবির রচনা মনে হয় না? অবশ্য এরূপ অনুমান-সিদ্ধ প্রমাণ যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহা স্বীকার্য। তথাপি সাধারণতঃ গায়ক বা নকল-কারকের দ্বারা ইচ্ছামত পরিবর্তিত ভণিতায় রচয়িতৃ-নির্ধারণের পক্ষে যেরূপ প্রমাণ মিলে, পদের আভ্যন্তরীণ বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ যে তাহার অপেক্ষা সন্তোষজনক তাহা নিশ্চিত।

অবশ্য 'পিরিতি' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে একটু সন্দেহের বীজ রহিয়াই গেল। চৈতন্য-পুর্ব সাহিত্যে এ কথাটির প্রয়োগ খুব বিরল। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে 'নেহা' বা 'লেহা'-ই এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'পিরিতি' শব্দটি, পদটি যে পরবর্তী যুগের রচনা, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা স্বাভাবিক। বিদ্যাপতির অনেক পদের মৌলিক রূপ ভবিষ্যৎ কালে পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন অনেক বাংগালী কবির রচনা বিদ্যাপতির নামে চলিয়াছে তেমনি বিদ্যাপতির অনেক পদের ভাষা বাংলা প্রতিশব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিছুদিন পুর্ব পর্যন্ত বিদ্যাপতি যে বাংগালী কবি এইরূপ ধারণাই প্রচলিত ছিল। বহুশতাব্দী ধরিয়া তাঁহার পদগুলি বাংগালী গায়ক ও লেখকের মধ্যবর্তিতায় বাংলা ভাষা ও বাক্যযোজনারীতির নিকট সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়া আসিতেছিল। এই সৌসাদৃশ্যের বলেই তাঁহাকে বাংগালী বলিয়া দাবী করা সম্ভব হইয়াছিল। এইরূপ কোন পরিবর্তনের সূত্র ধরিয়াই 'পিরিতি' শব্দটি পদটির মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে—ইহা পরবর্তী-কালের রচনার নিদর্শন নহে, হস্তক্ষেপের নিদর্শন। মোট কথা, যেখানে পাঠ-বিকৃতি অতি সাধারণ ব্যাপার, সেখানে একটি শব্দের প্রমাণে সমস্ত পদটির রচনা-কাল নির্ধারণ খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কে বলিতে পারে যে চৈতন্যোত্তর যুগের বিশুদ্ধী-করণ প্রচেষ্টার তরংগোচ্ছ্বাস ঐ একটিমাত্র শুভ্র ফেনপুষ্প রাখিয়াই এই বিখ্যাত পদটির তটভূমি হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় নাই?*

*প্রবন্ধের এই অংশ লেখা হইবার পর দেখিলাম যে বিদ্যাপতির ২৭১নং পদে (অমূল্য বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্রের সংস্করণ) পিরীতি' কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মিথিলা গীত

(৫)

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা যে কত জটিল তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অনুমান করা যায়। শুধু ভাষার মানদণ্ডে বিদ্যাপতির কৃত্রিম ও অকৃত্রিম রচনার মধ্যে পার্থক্য অনুভব করা অতি দুঃসাধ্য। বিদ্যাপতির সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে মোটামুটি তিন রকম ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) বাংলা ও ব্রজবুলির সহিত প্রায় নিঃসম্পর্ক, দুর্বোধ্য শব্দ ও প্রয়োগ-রীতিতে পূর্ণ এক প্রকারের ভাষা, যাহা খাঁটি মৈথিলের সহিত অভিন্ন বলিয়া

সংগ্রহের' প্রথম খণ্ডে এই পদটি চন্দ্রনাথ নামক কবির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি গ্রিয়ারসন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই বাংগালী-প্রভাবমুক্ত। অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে যে কোনও পরবর্তী যুগে 'পিরীতি' শব্দটি মিথিলার নিরক্ষর পল্লী সমাজেও সুপরিচিত হইয়া গায়কের কণ্ঠে ও সংগ্রাহকের লেখনীতে ইহার মৈথিল প্রতিশব্দটিকে স্থানচ্যুত করিয়া থাকিবে। তথাপি মিথিলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই শব্দটির আবির্ভাব বিদ্যাপতির দ্বারা ইহার প্রয়োগের অসম্ভাব্যতার যুক্তিকে অনেকটা দুর্বল করিয়া দেয়, তাহা অস্বীকার যায় না।

নব রসরীতি পিরীতি ভেল সজনি গে
দুহু মন পরম হুলাসে।
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে
ই থিক নব রস রীত।
বয়স যুগল সমুচিত থিক সজনি গে
দুহু মন পরম পিরীতি॥

গ্রিয়ারসন-সংগৃহীত ৫০১নং, ৫২১নং, ৫২২নং, ৬৯০নং ও ৮৭৪নং পদেও 'পিরীতি' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এতদিন ছলি নব রীতি রে।
জল মীন জেহন পিরীতি রে॥ (৫০১)
মাধব ই তুঅ ভলি নহি রীতী।
হঠে ন করিঅ দুর পুরুব পিরীতি॥ (৫২১)

এবং

অকরা জা সঞো রীতী।
দুর হুক দুর গেলে দো গুণ পিরীতী॥ (ঐ)
হমর করম ভেল বিহি বিপরীতি।
তেজলনি মাধব পুরবিল পিরীতি॥ (৬৯০)
হরিকে কহব সখি হমরি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরীতি॥ (৮৭৪)

বিবেচিত হইতে পারে। মৈথিল ভাষার যে কি বৈশিষ্ট্য তাহা নিঃসন্দেহভাবে নির্ণীত হয় নাই। আধুনিক মৈথিল পণ্ডিতদের নিকট সে প্রশ্ন করিলে কোন সদুত্তর মিলে না। বর্তমানযুগে মৈথিল ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্রম-প্রসারশীল হিন্দীর মধ্যে বিলীন হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে কোন পদগুলি মৈথিল ভাষায় রচিত, তাহা স্বভাবাত্মক (positive) অপেক্ষা অভাবাত্মক (negative) লক্ষণের দ্বারা বেশী নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যে পদগুলি বাংলা বা ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নহে, অথচ হিন্দীর সহিতও অভিন্ন নয়, সেইগুলিকে মৈথিলী বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সংকলনের কালীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রথম পদটি উল্লিখিত হইতে পারে। এরূপ পদের সংখ্যা পদাবলীতে খুব বেশী নাই। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মোটামুটি ব্রজ-বুলিতেই রচিত ; কোথাও কোথাও দুই একটি অপরিচিত শব্দ বাংগালী বৈষ্ণব রচিত ব্রজবুলি হইতে ইহাদের আকারের বিভেদ সূচিত করে। অধিকাংশ পদই এই জাতীয়। এই ব্রজবুলির সাধারণ প্রয়োগ বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যোগসূত্র ও তাহাদের সম-গোত্রীয়ত্বের প্রমাণ। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর পদ প্রায়-আধুনিক বাংলাতেই রচিত ; এগুলি বিদ্যাপতির রচিত ত নয়ই, বিদ্যাপতির কোন সমসাময়িক বাঙ্গালী কবির রচনা বলিয়াও মনে করা যায় না। বিদ্যাপতির যুগের কোন বাঙ্গালী কবির রচনা অবিকৃতরূপে আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সে যুগের বাংলা ভাষার খাঁটি প্রতিনিধি কিনা তাহাও অনিশ্চিত—অনেকে ইহার ভাষাকে রাঢ়ের প্রত্যন্ত-প্রচলিত এক অখ্যাত প্রাদেশিক ভাষার পর্যায়ে ফেলেন ও ইহাকে কেন্দ্রীয় সাধু ভাষার মর্যাদা দিতে নারাজ। বস্তুতঃ মধ্যযুগে প্রচলিত বাংলার খাঁটি নমুনা, এক 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' ও দ্বিতীয়, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছাড়া আর কোথাও রক্ষিত না হওয়ায়, ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পক্ষে গুরুতর অন্তরায় ঘটিয়াছে। এগুলিও খাঁটি কি না বলা যায় না, তবে এগুলিতে পরবর্তী যুগের হস্তক্ষেপের চিহ্ন অপ্রকট। এই দুইটি ছাড়া মধ্যযুগের সমস্ত গ্রন্থের—মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', ময়ূর ভট্টের 'ধর্মমঙ্গল', বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের ভাষায় শতাব্দীব্যাপী মার্জনা ও পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে—যেন একটা সংস্কারের ষ্টীম-রোলার ভাষার সমস্ত রুক্ষতা,

পরুষতা ও অপরিচিত শব্দের উপর চাপ দিয়া ইহাদিগকে আধুনিক মসৃণতায় সুষমান্বিত করিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও ক্রমপরিণতির ধারাটি ধরিবার এখন আর কোন উপায় নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ শতকের পুর্ববর্তী কোন যুগে এই ভাষাগত রূপান্তর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী-তালিকা হইতে এই আধুনিকতার বহির্বেশধারী বাংলা পদগুলি বাদ দেওয়াই নিরাপদ।

তথাপি বিদ্যাপতির ভাষাতত্ত্বের দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটি রন্ধ্রপথ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ বিদ্যাপতির পূর্ব-রচনা 'কীর্তিলতার' ভাষা আলোচনা দ্বারা তৎকাল-প্রচলিত মৈথিল 'অবহট্ট' ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভব। অবশ্য 'কীর্তিলতাতে'ও বিদ্যাপতি যে এক অভি-নব, সাহিত্যে অপ্রচলিত ভাষারীতি প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার ইংগিত দিয়াছেন। এই ভাষার নূতনত্ব সংস্কৃতের সহিত তুলনায়, না সাহিত্যিক মৈথিলের সহিত তুলনায় তাহা ঠিক পরিষ্কার হয় না—বোধ হয় সংস্কৃতের সহিত তুলনাতেই ইহার নূতনত্ব দাবি করা লেখকের উদ্দেশ্য। 'কীর্তিলতা' পদাবলী-সাহিত্যের ন্যায় মধ্যযুগের সাহিত্যাভিযানের বহু পথিকের দ্বারা অনুসৃত রাজপথ ধরিয়া প্রসারিত হয় নাই, ইহা একটি জনবিরল শাখা-পথের অনুসরণ করিয়াছিল। কাজেই ইহা পরবর্তী শতাব্দীসমূহের নূতন ভাবধারা ও ভাষা-সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। কোন পরবর্তী কবি 'কীর্তিলতার' রচনার উপর নিজের কারিকুরি ফলাইতে প্রলুব্ধ হন নাই— ইহা মৌলিক, অপরিবর্তিত রূপেই বর্তমান শতাব্দীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদের সহিত ইহার ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে পদগুলির মৌলিক আকৃতির উপরে নূতন আলোকপাত সম্ভব। 'কীর্তিলতার' সহিত তুলনামূলক আলোচনা বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা-রহস্যোদ্ভেদের একটি সম্ভাব্য উপায় বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাপতির সহিত বাংগালী কবির রচনার সংমিশ্রণ তাঁহার প্রকৃত পদ উদ্ধারের পক্ষে দুর্লংঘ্য বাধা—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রজবুলির সাধারণ প্রয়োগ ও দুর্বোধ্য মৈথিলী শব্দের পরিচিত বাংলা প্রতিশব্দে ক্রমিক রূপান্তর-সাধন বিদ্যাপতির অকৃত্রিম ও কৃত্রিম পদের মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্টতর করিয়াছে। যে সমস্ত পদ বাংলা দেশে সুপ্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যেই যে এই বাংলা-মিশ্রণ প্রক্রিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা মনে করাই

স্বাভাবিক। সুতরাং যে সমস্ত পদ বাংলায় প্রচলিত ছিল না সেইগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির ভাষার বিশুদ্ধতর রূপ রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত নহে। এইজন্য গ্রিয়ারসন সাহেব মিথিলার পল্লী-অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে গীত যে কিঞ্চিদধিক আশীটি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্য এই পদ সংগ্রহের মধ্যেও চন্দ্রনাথ, নন্দীপতি, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতি কয়েকটি মৈথিল কবির রচনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথাপি গ্রিয়ারসন-সংগৃহীত পদগুলি সম্বন্ধে একটা কথা জোর করিয়া বলা যায় যে তাহারা অন্ততঃ বাংলার প্রভাব মুক্ত।

এগুলি বাংগালী কবি, গায়ক ও সংগ্রাহকের পক্ষে অপ্রাপ্য ছিল বলিয়াই ইহাদের ভাষা-পরিবর্তন বা ইহাদের উপর বৈষ্ণবভাব-আরোপের কোন চেষ্টা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ঐ পদগুলির আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির ভাষা, ভাবধারা ও কাব্য-বৈশিষ্ট্যের একটা মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এখানেই আমরা খাঁটি, অপরিবর্তিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি। পরবর্তী যুগে মিথিলায় বৈষ্ণব প্রভাব খুব বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না—বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্লাবন মিথিলার উপর বহিয়া গিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই মিথিলার অশিক্ষিত জনসাধারণ ইহাদের উপর চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-ধর্মের কোন ছাপ মারিতে চেষ্টা করে নাই—তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বড় জোর ইহাদের মুখে গীত হইতে হইতে পদগুলির প্রাচীন মৈথিল আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে বা নবাগত হিন্দী শব্দ ও প্রয়োগরীতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মৈথিলকে অভিভূত করিতে পারে! কিন্তু বাংলা ভাষা ও বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ত্বের আকর্ষণে ইহারা যে কক্ষচ্যুত হয় নাই ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। গ্রিয়ারসনের পদ-সংগ্রহ হইতে বিদ্যাপতির কবি-প্রকৃতির যে সন্ধান মিলিবে, তাঁহার কাব্য-বিচারের যে মানদণ্ড স্থিরীকৃত হইবে তাহা তাঁহার অপরাপর পদের উপর প্রয়োগ করিলে আসল-নকলের ভেদ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে, এরূপ আশা পোষণ করা যাইতে পারে। সুতরাং গ্রিয়ারসনের পদগুলিকে বিদ্যাপতির কাব্য-বিচারের বন্ধুর দুরারোহ পথ অনুসরণের সহায়ক সোপান-শ্রেণী হিসাবে ব্যবহার করিলে তাঁহার সমস্যার জটিলতা কতকটা সরল হইতে পারে। এখন উপরিউক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতির কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে পৌছান যায় দেখা যাউক।

(৬)

'কীর্তিলতা' গ্রন্থে উচ্চাংগের কবিত্বশক্তির সহিত বাস্তব বর্ণনার চমৎকার সমন্বয়ের কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। জোনপুর নগরের সৌন্দর্য ও যুদ্ধবর্ণনায় চিরপ্রথাগত রীতির অনুসরণের সংগে সংগে প্রত্যক্ষদর্শিতার অনন্যসাধারণতা মিশিয়াছে। কবি বর্ণনা পদ্ধতিতে প্রাচীন-সাহিত্যানুমোদিত পন্থা একেবারে বর্জন করেন নাই; কিন্তু প্রধানতঃ তিনি পূর্ব দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করিয়া বাস্তব চিত্রকেই নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পুরাতন সাহিত্যিক আদর্শের দ্বারা নিজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে কোন অন্তবাল রচনা করেন নাই। গ্রন্থখানি কি ভাষায় রচিত হইয়াছে তাহা অনির্ণীত; প্রাকৃত, মৈথিল অবহট্ট, আরবী-পারসী প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার মিশ্রণ-চিহ্ন ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। মোটের উপর বিদ্যাপতির পদাবলীতে ব্রজবুলি-প্রধান যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা তাহা হইতে বিভিন্ন। 'কীর্তিলতা'র অনেক শব্দই দুর্বোধ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংস্করণে যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই কষ্টকল্পনা ও এই সমস্ত দুরূহ শব্দকে এড়াইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ ক্রিয়াপদ-প্রয়োগ ও বাক্য-গঠনরীতির অনিশ্চয়তা ভাষার বৈয়াকরণিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণার অন্তরায় হইয়াছে। বিষয়ের বিভিন্নতার জন্যও পদাবলীর উপর 'কীর্তিলতার' প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তথাপি রচনারীতি (style), তীক্ষাগ্র সংক্ষেপো পংক্তির প্রাচুর্য, উপমার যুক্তিযুক্ততা ও ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র, একই রচয়িতার বিশিষ্ট ছাপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 'কীর্তিলতা'র মুখবন্ধে কবি তাঁহার অভিনব ভাষা-প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া সুদৃঢ়, সগর্ব আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এই উক্তির মধ্যে যে শাণিত, মিতভাষী অর্থভূয়িষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যেও তাহা সুপ্রকট।

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাষা।[১]
দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেশরহরশির সোহই।[২]
ঈ নিচ্চই নাগরমন[৩] মোহই॥ (পৃঃ ২, শাস্ত্রী সংস্করণ)

[১] বিদ্যাপতির ভাষা [২] শোভা করে [৩] রসিকের মন

এই ধরণের উদাহরণ 'কীর্তিলতাতে' প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মানবিহুনা ভোঅনা, সত্তুক দেলে রাজ।
শরণ পইঠ্ঠে জীঅনা, তীহু কাঅর কাজ॥ (পৃঃ ৮, শাস্ত্রীসংস্করণ)

মানবিহীন ভোজন, শত্রুদত্ত রাজ্য ও শরণাগত হইয়া জীবন রক্ষা—এই তিনই কাতরের কার্য্য।

সৈন্যাভিযানের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতার যে বর্ণাঢ্য চিত্র কবি সুনির্বাচিত অল্প কয়েকটি রেখায় আঁকিয়াছেন তাহা বর্তমান মহাযুদ্ধে খাদ্যদ্রব্যের কল্পনাতীত মূল্যবৃদ্ধির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই বর্ণনা একাধারে লেখকের উক্তিসংক্ষেপ-নৈপুণ্য ও বাস্তবরস-সমৃদ্ধির পরিচয়।

সেঁর কীনি পানি আনিঅ। পীবএ খনে কাপড়ে চ্ছানীয়॥
পানকসএ সোনাক টঙ্কা। চান্দনক মূলে ইন্ধন বিকা॥
বহুল কৌড়ি কনিক থোড়। ঘীবক বেঁচা দীঅ ঘোঁড়॥
কুরুআক তেল আঙ্গ লাইঅ। বাঁদী বড়দাসঞো ঘপাইঅ॥

এক সের জল কিনিয়া আনিয়া একমুহূর্তে কাপড়ে ছাঁকিয়া (সৈন্যেরা) পান করিতেছে। পানীয় জলের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিতেছে। চন্দনের মূল্যে জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় হইতেছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য পাইতেছে। ঘৃতের জন্য ঘোড়া বিক্রয় করিতেছে। অঙ্গে কুরুবাক তৈল লইবার জন্য বাঁদী ও প্রধান চাকরকে বিলাইয়া দিতেছে।

জোনপুর নগরের বিলাসিনী বারনারীদের রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি কতকটা বৈষ্ণব কবিদের সহিত সাধারণ ভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সৌন্দর্য বর্ণনায় কুলনারী ও বেশ্যার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না—রাধিকার মত ঐশীভাবসম্পন্না, ভগবৎ-প্রেয়সী রমণী, মহিমান্বিতা রাজকুলবধূ ও সর্ব্ব-সাধারণভোগ্যা নাগরিকা—সকলেই অন্ততঃ দেহ-সৌন্দর্য বিষয়ে একই বর্ণাধার হইতে একই তুলিতে আঁকা; একই প্রকারের উপমা ও উচ্ছ্বসিত রূপমোহ তাহাদিগের চতুর্দিকে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতিও এই বারবনিতাদের সম্পর্কে যে সমস্ত উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি রূপমুগ্ধের যে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা সমভাবে রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে পদাবলী-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যাপতি বাস্তবভাব-প্রধান কবি; তিনি বেশ্যার রূপের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সত্যিকার জীবনের বক্রকটাক্ষগূঢ়

ইংগিত দিতেও ভুলেন নাই। উভয়রূপ মনোভাবেরই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে।

বাজপথক সন্নিধান সঞ্চরন্তে অনেক দেখিঅ বেশ্যাহ্নিকবো[১] নিবাস।
জহ্নিকে[২] নির্মাণ বিশ্বকর্ম্মহু ভেল বড প্রআস॥
অবরু বৈচিত্রী কহঞো কা।[৩]
জহ্নি কেশধূপধূম-করী রেখা ধ্রুবহু উপ্পবক্কা॥[৪]
কাহু কাহু আইসনেঞো শঙ্ক।[৫]
তকবে কাজবে চান্দ কলঙ্ক॥[৬]
তহ্নি কেশ কুসুমবস।[৭]
জনি মান্যজনক লজ্জাবলম্বিত মুখচন্দ্রচন্দ্রিকাকবী অধওগতি দেখি অন্ধকাব হস॥[৮]
নঅনাঞ্চল সঞ্চাবে ভ্রূলতা ভঙ্গ।
জনি কজ্জল কল্লোলিনী কবী বীচিবিবর্ত বডী বডী সফবী তবঙ্গ॥[৯]

সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব বিকৃত জীবনাদর্শ ও ছলনাময আচবণেব প্রতি কবি বংকিম কটাক্ষ কবিয়াছেন।

লজ্জা কিত্তিম কপট তারুন্ন।
ধন নিমিত্তে ধব পেম লোভে বিনঅ, সৌভাগে কামন॥

১ বেশ্যাদেব

২ যাহাদের

৩ আর, বিচিত্র কথা কি বলিব?

৪ যাহাদের কেশের সুগন্ধি ধূপের ধূমরেখা ধ্রুবনক্ষত্রের উপরেও আরোহন করে।

৫ কাহারও কাহারও এরূপ আশংকা।

৬ তাহাদেব কজ্জলবেখা তাহাদেব মুখচন্দ্রেব কলংকস্বরূপ—অর্থাৎ কাজল বেখা দ্বারা তাহাদের মুখ যে চন্দ্রসদৃশ তাহা নিঃসংশয ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

৭ তাহাদের কেশ কুসুম খচিত।

৮ যেন মাননীয় ব্যক্তির লজ্জাবনত মুখচন্দ্রেব জ্যোৎস্নার অধোগতি দেখিয়া অন্ধকার হাসিতেছে—এখানে কেশকে অন্ধকার, ফুলকে হাসি ও বেশ্যার সৌন্দর্যকে অধোগমনকারী চন্দ্ররশ্মিব সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৯ তাহাদের নয়নকোণের আন্দোলনে ভ্রূভঙ্গ দেখা যাইতেছে যেন কাজলরূপ নদীর ঘূর্ণির তরংগে বড় বড় শফরী মৎস্য খেলা করিতেছে।

বিনা স্বামী সিন্দূর পবা পরিচয়।
দোখ হীনি, মাঝ খীনি রসিকে আনলি জুআঁ জীনি॥

পরপুরুষাসক্ত কুলকামিনীদের সম্বন্ধে কবি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন।

সর্ব্বউ—কেবা[১] বারিজ নঅন[২] তরুণী হেরি বঙ্ক।
চোবি প্রেম পিযারিও আপন দোসে সশঙ্ক॥
(পৃঃ ১৩, শাস্ত্রীসংস্করণ)

এই সমস্ত স্থানে কবির দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও বক্রোক্তিনিপুণতার পবিচয় মিলে। সময় সময় পদাবলীতে 'কীর্তিলতার' মন্তব্যেব প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যথা,

বিঅখনী পবিহাস পেসনী স্থন্দবী সার্থ জবে দেখিঅ।
তবে মনে কর তেসরা লাগি তীন্ উপেখ্খিঅ॥ (পৃঃ ১৪)

অর্থাৎ এই বিচক্ষণী পরিহাসনিপুণা স্থন্দরীবৃন্দকে (বারনারী) যখন দেখি তখন মনে হয় যে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের তৃতীয়টির (কামের) জন্য আর তিনটিকে উপেক্ষা করি। বিদ্যাপতির ৭০ সংখ্যক পদে রাধিকার রূপ বর্ণনাপ্রসংগে এই চতুর্বর্গ-ফল-প্রাপ্তির সৌভাগ্যের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

জনিকর[৩] এহনি সোহাগিনি সজনি গে
পাওল পদাবথ চারি[৪]॥

অবশ্য তুলনাতে রাধিকার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্থচিত হইতেছে। বারনাবীর রূপমোহে কামেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য, রাধিকার প্রণয়ের মধ্যে চতুর্বিধ ফলের সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিতার্থতা। তথাপি মনে হয় যে এই চিন্তাধারা লেখকের একই মনোভাব হইতে উদ্ভূত। চতুর্বর্গ বুঝাইতে 'পদারথ চারি' এইরূপ ভাষার প্রয়োগ কোন বাংগালী কবির পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয় না, স্থতরাং ইহা যে অবাংগালী কবির রচনা এইরূপ প্রতীতি জন্মে। 'কীর্তিলতা' ও পদাবলীতে দুই একটি শব্দের সাধারণ প্রয়োগও রচয়িতার অভিন্নত্বের পবিপোষক। 'ঝংখ' (শোকার্থে) কথাটি 'কীর্তিলতা'র ২২ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭৬৫ সংখ্যক পদেও 'চিতে জনু ঝাঁখহ আনে' (মনে অন্য শোক করিও না) বাক্যাংশে অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

১ সকলের ২ পদ্মের ন্যায় চক্ষু
৩ যাহার ৪ চতুর্বর্গফল

(৭)

'কীর্তিলতার' সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় গুণ ইহার অসাধারণ ছন্দোবৈচিত্র্য ও বাস্তব-বর্ণনা-প্রাচুর্য। ছন্দের দিক্ দিয়া পদাবলীর উপর ইহার প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। যে লঘু ত্রিপদী, ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে তাহা নানা সূক্ষ্ম প্রকার-ভেদের সহিত 'কীর্তিলতায়' প্রযুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক এই গ্রন্থে ছন্দোকুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ। ইহার পংক্তিগুলি সাধারণতঃ অসম দৈর্ঘ্যের, অনেক স্থলে পাঠ-বিকৃতি ও বিরল ক্ষেত্রে কোন কোন শব্দের স্খলনের জন্য ধ্বনি-প্রবাহটির বিশুদ্ধি সব সময় রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত পংক্তির অংগচ্ছেদ ও তজ্জনিত ছন্দোপতন সত্ত্বেও মোটের উপর ওজস্বিতা ও ভাবব্যঞ্জনার দিক্ দিয়া লেখকের ছন্দোবিন্যাসনৈপুণ্য অসাধারণ। ত্বরিত বর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষিপ্র, অবিশ্রান্ত গতিবেগ, সৈন্যাভিযানের যাত্রাচ্ছন্দের মাত্রাভেদ প্রভৃতি দ্যোতনার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা অতুলনীয়। লেখকের বর্ণনীয় বিষয় যেন ছন্দের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ, গতিবেগ-চঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

সুলতান ইব্রাহিমের যুদ্ধযাত্রা—

চলিও তকতান	সুরতান	ইবরাহিমও।
কুরুম ভল	ধরণি সুণ	রণি বলনাহিমো॥
গিরি টরই	মহি পডই	নাগ মন কম্পিআ।
তরণিরথ	গগনপথ	ধূলি ভরে ঝম্পিআ॥
তবল শত	বাজ কত	ভেরিভরে ফুক্কিআ।
পলঅঘন	বজ্জসমই	অরি বল লুক্কআ॥
তুলুক লখ	হরথে হস	অগ্‌গি ধস ফালহী।
মানধর	মারি কর	কট্টি করবালহী॥
মঅ গণই	পএ পলই	ভোগি চলই জংখনে।
সত্তুর ঘর	উপজু ডর	নিন্দ নহি ঝংখনে॥
খগ্‌গ লই	গব্ব কই	তুলুক জবেঁ জুজ্‌ঝই।
অপি সগর	সুরন অর	সংকপল মুজ্‌ঝই॥
সোখি জল	কিঅউ থল	পত্তি পঅ ভারহী।
ঝাম্পি ধঅ	সংক ছঅ	সঅল সংসারহী॥ (পৃঃ ২৩)

সুলতান ইব্রাহিমের যুদ্ধাভিযান চলিল।...গিরিকে টলাইয়া, পৃথিবীকে বিচলিত করিয়া, নাগ (বাসুকির) মন কাঁপাইয়া, সূর্যের রথ ও আকাশপথকে ধূলিজালে আচ্ছন্ন করিয়া, শত শত তবলা বাজাইয়া ও ভেরীতে ফুৎকার দিয়া আর প্রলয়ের বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় আর সব বল (?) লুকাইয়া ফেলিয়া (সৈন্য চলিল) লক্ষ লক্ষ তুরক আনন্দে হাসিয়া চলিল ; মানীদের (?) কটিতে তরবারি হইতে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হইতে লাগিল। যখন তাহারা রাস্তায় উঠিয়া (?) পায়ে হাঁটিয়া জোরে চলে, তখন শত্রুর ঘরে ভয় উপস্থিত হয় ও উদ্বেগে ঘুম আসে না ; তুরক যখন খড়্গ লইয়া গর্ব করিয়া যুদ্ধ করে তখন সকল সুরনগর শংকা পাইয়া মূর্ছা যায়। পদাতিকদের পদভরে জল শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইল ; জানিয়া শুনিয়া সমস্ত সংসারে শংকা উপস্থিত হইল।

দোঅগ্না ধাবহিঁ তুরয় নচাবহি
বোলহিঁ গাঢ়িম বোলা।
লোহিত পিত সামর গহিঅঁউ চামর
সবন হি কুণ্ডল ডোলা॥
আবত্ত বিবত্তে পথ পরিবত্তে
জুগ পরিবত্তন ভাণা।
ঘন তবল নিসানে সুনিঞ ন কানে
সাণে বুঝ্ঝাবই আনা॥
বেসরি অরু গদ্দহ লকথ বরদ্দহ
ইত্তি কা ভহিসা কোটী।
অসবার চলন্তে পাএ খলন্তে
পুহবী ভএজা চ্ছোটী॥
পীচ্ছে জে পড়িআ তেঁ লড়ঘড়িআ
বইঠহি ঠামহি ঠাম।
গোহণ ন পাবহি বথুতা ন বহিঁ
ভুলল ভুলহি গুলামা॥ (পৃঃ ৩৬)

জোয়ানেরা ধাবিত হইতেছে, ঘোড়া নাচাইতেছে, গর্বপূর্ণ কথা বলিতেছে, লোহিত পীত ও শ্যামল বর্ণ চামর লইয়াছে, শ্রবণে কুণ্ডল দুলিতেছে। তাহারা যখন আবর্ত, বিবর্ত বা পদ পরিবর্তন (অশ্বারোহী সৈন্যের বিভিন্ন গতিচ্ছন্দ) করিতেছে, তখন যুগ পরিবর্তনের মত মনে হইতেছে। ঘন ঘন তবলার শব্দে

কানে কোন কথা শোনা যায় না, সংকেতে (?) অপর লোককে মনোভাব জানাইতেছে। খচ্চর গর্দভ লক্ষ লক্ষ বরাদ্দ হইয়াছে; মহিষ কোটী। অশ্বারোহী চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতেছে—যেন পৃথিবী ছোট হইয়া যাইতেছে। যাহারা পিছু পড়িয়া যাইতেছে তাহারা অকর্মণ্য। স্থানে স্থানে বসিয়া আছে। তাহারা গোধন পায় না। অন্যান্য জিনিষপত্র বহন করে না (লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয়) এমন কি গোলামেরাও তাহাদিগকে ভুলিয়া যায়। (?)

হস্তীর মন্থর গতির বর্ণনা—

অনবরত হাথি	ময়মত্ত জাথি
ভাগন্তে গাছ	চাপন্তে কাচ্ছ।
তোরন্তে বোল	মারন্তে ঘোল।
সংগ্রাম থেপ	ভূমিঠ্‌ঠ মেঘ।
অন্ধার কূট	দিগবিজয় ছুট।
সসরীর গব্‌ব	দেখন্তে ভব্‌ব।
চালন্তে কান	পব্বঅ সমান।
গরুঅ গরুঅ স্থণ্ড	মারি দমসথি মানুষকরো মুণ্ড। (পৃঃ ২৮)

মদমত্ত হাতী অনবরত চলিতেছে। গাছ ভাংগিতেছে, রাস্তার দুইধার চাপিতেছে। মাহুতের আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছে, ঘোড়া মারিতেছে (?)। তাহারা সংগ্রামে স্থির। ভূমিতলন্যস্ত মেঘের ন্যায়। অন্ধকার পর্বতশিখরের ন্যায় দিগ্বিজয় করিতে ছুটিয়াছে। তাহারা দেখিতে সুন্দর, যেন মূর্তিমান গর্ব। পর্বতের মত বিশাল কান নাড়িতেছে ও বিরাট শুঁড়ের দ্বারা মানুষের মুণ্ড টানিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

হাতীর সহিত তুলনায় অশ্বারোহী সৈন্যের দ্রুততর গতিচ্ছন্দের দ্যোতনা—

অনেঅ বাজি	তেজি তেজি	সাজি সাজি আনিঞা।
পরক্কমেহী	জাস্থনাম	দীপে দীপে জানিঞা॥
বিসালকন্ধ	চারুবন্ধ	কল্পসত্তি সোহণা।[১]
তলপ। হাথি	লাঘি জাথি	সত্তুসেন খোহণা॥

[১] সত্তিরাঅ সোহণা—হিন্দী সংস্করণ।

তজানভীত বাতজীত চামরেহি মণ্ডিয়া।
বিচিত্ত চিত্ত নাচনিত্ত রাগবাগ পণ্ডিআ॥ (পৃঃ ২৯)

অনেক তেজীয়ান ও সবল অশ্বকে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছে, যাহাদেব নাম পরাক্রমের জন্য বিভিন্ন দ্বীপে বিখ্যাত। তাহাদের স্কন্ধ বিশাল, শরীরের সুন্দব বাঁধন, যেন মূর্তিমান শক্তির ন্যায় শোভন। হাতীকে লংঘন ও অধঃকৃত করিয়া শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিয়া চলে। ইহারা চাবুককে ভয় করে, বায়ু অপেক্ষা বেগবান ও চামরে মণ্ডিত, নানারূপ নৃত্য প্রভৃতিতে নিপুণ ও রক্তবর্ণ লাগামের দ্বারা আবদ্ধ।

দুই সৈন্যের সংঘর্ষ—প্রারম্ভের বর্ণনা

বেবি সেন সংঘট্ট ভেটে বাজন ভট ভেবা।
পাও পহারে পুহবী কপ্য গিরিসেহর টুট্টই।
পলএ বিঠ্‌ঠি সঞো পলই কাঁড পটবালহ ফুট্টই॥
বীর বেকারে আগু হোঅথি রোমঞ্চিঅ অঙ্গে।
চৌদস চক-মক চমক হোই খগ্‌গ তরঙ্গে॥
... ...
সীগিনিগণ টংকারভাব নহ-মণ্ডল পূরই।
পাখর উঠ্‌ঠই ফৌদে ফৌদে পরচক্কহ চূরই॥
খগ্‌গে খগ্‌গে সংঘাল-অ ফুলুগ উস্কলই অগ্নিকো।
অসবাব অসিধার তুরঅ রাঁউত সঞো কুট্টই।
বেলক বজ্জনিপাত কাঅ কবচ্ছ সঞো ফুট্টই॥
অরি কুঞ্জব পঞ্জর সল্লিরহ রুহির ধারে। (পৃঃ ৩৬ ও ৩৭।

নানা বাদ্যযন্ত্রের নিনাদের মধ্যে দুই সৈন্যে সংগ্রাম বাধিল। পদ-প্রহারে পৃথিবী কাঁপিতেছে ও গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হইতেছে। প্রলয়ের বৃষ্টির সঙ্গে যেমন শিলাবৃষ্টি (?) হয়, সেইরূপ তরবারি অংগে ফুটিতে লাগিল। বীরেরা (?) রোমাঞ্চিত দেহে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খড়্গের আভায় চতুর্দিক চমকিত হইল। ধনুকের টংকারে আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইল। সৈন্যেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুব্যূহ চূর্ণ করিতে লাগিল। খড়্গে খড়্গে সংঘর্ষ হইয়া অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হইল। অশ্বারোহীর তরবারি সেনার সংগে ঘোড়াকেও কাটিয়া ফেলিল। বর্ষাফলকের বজ্রবৎ আঘাত কবচ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। শত্রুর হস্তীর পঞ্জর রুধির ধারে ভাসিয়া গেল (?)।

পরবর্তী অবস্থার (যখন যুদ্ধের গতিবেগ দ্রুততর হইয়াছে) বর্ণনা—

পলে রুণ্ড মুণ্ডো খলে বাহু দণ্ডো।
সিআরু কলঙ্কোই কঙ্কাল খণ্ডো॥
ধরা ধুরি লোট্টন্ত টুট্টন্ত কায়া।
ললন্তা চলন্তা পঝালন্তি পাআ॥
অরুজ্ঝাল অন্তাবলী জাল বদ্ধা।
বেসাবেগ চূড্ডন্ত উড্ডন্ত গিদ্ধা॥
গঅন্নী করন্তো পিবন্তো ভরন্তো।
মহামাস্থখণ্ড পরেতো ভরন্তো॥
সিআসার ফেক্কার রোলং করেন্তো।
বুভুখ্খা বহু ডাকিনী ডক্করেন্তো॥
জহা রত্তকল্লোল নানা তরঙ্গো।
তহা সারি সজ্জো নিমজ্জো মতঙ্গো॥ (পৃঃ ৩৭)

কবন্ধের মুণ্ড পড়িতেছে, বাহুদণ্ড স্খলিত হইতেছে। শিয়াল হাড় চিবাইয়া খাইতেছে। পতনশীল দেহ পৃথিবীর ধূলায় লোটাইতেছে—পা কিছুক্ষণ টলমল করিয়া চলিয়া নিশ্চল হইতেছে। রক্তমাখা নাড়ীভুঁড়িতে আবদ্ধ হইয়া গৃধ্রেরা মাংস খাইতেছে ও উড়িতেছে। প্রেতেরা গান করিতে করিতে রক্ত পান করিতেছে ও বৃহৎ মাংসখণ্ড উদর পূরিয়া খাইতেছে। শিয়াল ফেক্কার শব্দ করিতেছে, ক্ষুধিত বহু ডাকিনী চীৎকার করিতেছে। যেখানে রক্ত-কল্লোলের নানাবিধ তরংগ বহিতেছে সেখানে সারি সারি সজ্জিত হাতী ডুবিয়া যাইতেছে।

তোটক ছন্দে যুদ্ধের শেষ অবস্থার বর্ণনা—

হসি দাহিন হথ্থ সমথ্থ ভই।
রণরত্ত পলট্টিঅ খগ্গ লই॥
তঁহি একহি এক পহার পলে।
জহি খগ্গহি খগ্গহি ধার ধরে॥
হঅ লগ্গিয় চঙ্গিম চারুকলা।
তরবারি চমক্কই বিজ্জুজ্বলা॥
টরি টোপ্পরি টুট্টি শরীর রহে।
তনু শোণিত ধারহিঁ ধার বহে॥ (পৃঃ ৩৯)

হাসিয়া রণরত (অসলান) যে দক্ষিণ হস্ত এখনও সমর্থ আছে তাহাতে পালটিয়া (পুনরায়) খড়্গ গ্রহণ করিল। যেখানে খড়্গে খড়্গে সংঘর্ষ হইল সেখানে একটির পর একটি আঘাত হইতে লাগিল। অশ্ব মনোহর শিক্ষা দেখাইল—তরবারি বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চমকিতে লাগিল। শরীরে নানাস্থানে ক্ষত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় রক্ত বহিতে লাগিল।

(৮)

কিন্তু কবির সর্বাপেক্ষা সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় অরাজকতা ও যুদ্ধজনিত বিশৃংখলা সম্বন্ধে এবং হাট-বাজারের ভিড় ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাজ-চিত্রে। বিশ্বাসঘাতক অসলানের দ্বারা রাজগণেশ্বরের হত্যার পর দেশে যে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের আবির্ভাব হইল কবি তাহার কি জীবন্ত চিত্র আমাদের নিকট মেলিয়া ধরিয়াছেন !

মারন্ত রাএ রণরোল পড়ু, মেঙনি হাহাসদ্দ হুঅ।
সুররাএ-নএর-নাএর-রমণি বামনয়ন পফুরিঅ ধুঅ॥
ঠাকুর ঠক ভএ গেল, চোরে চপ্পুরি ঘর লিজ্‌ঝিঅ।
দাসে গোসাঞ নিগহিঅ, ধম্ম গএ ধন্ধ নিমজ্জিঅ॥
খলে সজ্জন পরিভবিঅ কোই নহি হোই বিচারক।
জাতি অজাতি বিবাহ, অধম উত্তম কাঁ পারক॥
অখ্খর-রস-বুঝ্‌ঝ-নিহার নহি, কই কুল ভমি ভিখ্খারি ভউ।
তিরহুত্তি তিরোহিত সব্বগুণে রা(এ) গণেস জবে সগ্‌গ গউ?

রাজা মারা গেলে, যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল, মেদিনী হাহাকারে পূর্ণ হইল। সুরপুরীর অপ্সরাদের বামনয়ন স্ফুরিত হইল। ঠাকুর ঠক হইয়া গেল, চোরে ঘর ছপ্পর অধিকার করিল। দাস প্রভুকে নিগৃহীত করিল, ধর্ম ধাঁধায় পড়িয়া ডুবিয়া গেল। খল সজ্জনকে পরাভূত করিল, বিচারক কেহ থাকিল না। জাতি অজাতির মধ্যে বিবাহ হইল, অধম উত্তমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। বিদ্যারস আস্বাদনের লোক বিরল হইল, কুলীন ব্যক্তি ভিখারীতে পরিণত হইল। গণেশ রাজা স্বর্গগত হইলে তিরহুতের সর্বগুণ তিরোহিত হইল।

অভিযানের পর সৈন্যদের দ্বারা প্রজাসাধারণের উৎপীড়নের কাহিনী একইরূপ সরস তথ্যবহুলতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।—

ধাগড় কটকহি লটক বড় তেঁ জে দিসে ধাউ জাথি।
তং দিসকেরী রাএঘরতরুণী হট্ট বিকাথি॥
সাবর এক হোঁ কতঙ্কিক হাথ।
চেথইএে কোথইএে বঢ়ল মাথ॥
দূর ডুগ্‌গম আগি জারথি।
নারি বিভারি বালক মারথি॥
ন দীনাক দযা, ন সকতাক ডর।
ন বাসি সম্বর, ন বিআহী ঘর॥
ন পাপক গবহা, ন পুণ্য কাজ।
ন শত্তুক শঙ্কা, ন মিত্রক লাজ॥
ন থীর বচন, ন থোর গ্রাস।
ন জস লোভ, ন অপযশ ত্রাস॥

এই যাত্রাশীল সৈন্যদের বড় উৎপাত (?), তাহারা যে দিকে ধায়, সেই দিকের রাজবংশ-তরুণীরা হাটে পণ্যদ্রব্যের মত বিকায়। এক শাবল (?) কত লোকের হাতে ঘুরিতেছে (অর্থাৎ লুণ্ঠনকারী লোকের সংখ্যা বেশী ও ঘর ভাংগিবার অস্ত্র কম হওয়ায় একই অস্ত্র অনেকেই পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতেছে)।...দূর দুর্গমস্থানে আগুন দিয়া জ্বালাইতেছে। নারীকে বিবাহ করিয়া বালককে মারিতেছে। দরিদ্রের প্রতি দয়া বা শক্তের প্রতি ভয় নাই। পাপে লজ্জা নাই, পুণ্যে কাজ নাই, শত্রুকে ভয় বা মিত্রকে লজ্জা নাই, বচনও ধীর নহে, ক্ষুধাও কম নহে। যশে লোভ বা নিন্দাতে ভয় নাই।

হাটবাজারের ভিড়ে লোকের যে দুরবস্থা হয়, বিশেষতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্যক্তির যে সত্ত্বগুণবিরোধী অভিজ্ঞতা হয় কবি তাহার বেশ কৌতুকপূর্ণ চিত্র দিয়াছেন।

মানুসক সীসি পীসি বর আগেঁ আঁগ,
উগর আনক তিলক আনকাঁ লাগ।
যাত্রাহুতহু পরস্ত্রীক বলয়া ভাগ॥
ব্রাহ্মণক যজ্ঞোপবীত চাণ্ডাল হৃদয় লুল।
বেশ্যাহ্নিকরো পয়োধরে জতীক হৃদয় চুর॥

ধনে সঙ্কর ঘোল হাথি।
বহুত বাপুর চুরি জাথি ॥
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত রোল হো।
নঅর নহি নর-সমুও ॥

মানুষের মাথা ঠুকিয়া যাইতেছে, অংগে অংগে পেশাপেশি হইতেছে। একজনের তিলক উঠিয়া গিয়া অপরের কপালে লাগিতেছে। চলাব ভিড়ে পরস্ত্রীর বলয় ভাংগিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের উপবীত স্খলিত হইয়া চণ্ডালের বুকে লগ্ন হইতেছে। সন্ন্যাসীব বুক বেশ্যার স্তনে মর্দিত হইতেছে। ঘোড়া ও হাতী ঘন ঘন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেক বেচারা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। গোলমাল যেন সমুদ্রাবর্তের ন্যায়, এ যেন নগর নহে, নর-সমুদ্র।

আবার—

ততো বে কুমারো পইঠ্ঠে বজারে।
জঁহি লখ্খ ঘোরা মঅঙ্গ হজারো ॥
কঁহি কোটী গন্দা কঁহি বাদিবন্দা।
কঁহি দূরি বিক্কাবিএ হিন্দ্ গন্দা ॥
কহী তথ্থ কূজা তবেল্লা পসারা।
কহী তীর কম্মান দোক্কানদারা ॥
সরাকো সরাকেঁ ভবে বেবী বাজ্।
তৌল্লতি ফেরা লস্থলা পেআজ্ ॥
খরীদে খরীদে বহুঁতো গুলামো।
তুরকে তুরকে অনেকো সলামো।

... .

আবেবে ভণন্তা সরাবা পিবন্তা।
কলীমা কহন্তা কলামে জীঅন্তা ॥

... ...

তুরুক তোখারহিঁ চলল হাট ভমি ফেরা মঙ্গই।
আভী ডিঠি নিহারী দবলি দাড়ী থুক বাহই ॥

.. ..

গীতি গরুবি জাখরী মত্ত ভএ মতরুফ্ গাবই।
চরখ নাচ তুরুকিনী আন কিছু কাহু ন ভাবই ॥

সএদ সেরণী বিলহ সব্বকো জুট সব্বে খা।
দ্বাআ দে দরবেশ পাব নাহি গারি পারি যা॥
মখদুম ন রাবই দো মজঞো।
হাথ দ দস ঢারও॥

তারপর দুই কুমার বাজারে ঢুকিলেন—যেখানে লক্ষ ঘোড়া ও হাজার হাতী। কোথাও গন্দা (?) কোথাও বা দাস দাসী, কোথাও বা দূরে হিন্দু গন্দা (?) বিক্রীত হইতেছে। কোথাও কূঁজা, কোথাও তবেল্লার (হিন্দু ও মুসলমানের পান-পাত্র) দোকান, কোথাও বা তীর ধনুকের দোকানদারেরা আছে। রাস্তার দুইধারে ব্যবসায়ীরা দোকান পাতিয়াছে—কোথাও বা রসুন-পেঁয়াজ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া বিক্রয় হইতেছে। অনেক চাকর জিনিসপত্র কিনিতেছে—তুর্কীতে তুর্কীতে অনেক সেলাম বিনিময় হইতেছে। তুর্কীরা "আব্বেব" বলিতেছে, সরাব পান করিতেছে। তুর্কীরা হাট ভ্রমণ করিয়া ও ফেরা মাংগিয়া চলিল—তেরচা চোখে চাহিয়া, দাড়ি বিন্যাস করিয়া ও থুতু ফেলিয়া। গীতিকুশল গায়িকারা মত্ত হইয়া মতরুফ গাহিতেছে—তুরকিনী কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চরকি নাচ নাচিতেছে। সৈয়দ সিন্নী বিলাইতেছে, সকলের উচ্ছিষ্ট সকলে খাইতেছে। দরবেশ দোয়া দিয়া কিছু না পাইলে গালি দিয়া যাইতেছে। মখদুম মুখ ফুটিয়া যাজ্ঞা করিতেছে না, কিন্তু হাত পাতিলে লোকে দশগুণ ঢালিয়া দিতেছে।

বাজারের ব্যস্ত, চটুল জনসংঘ ও ইহার নানারূপ দোকানপসার ও ক্রয় বিক্রয়ের কি বাস্তবানুগামী, কৌতুকোজ্জ্বল, প্রাণবেগচঞ্চল বর্ণনা!

সর্বশেষে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সম্পর্কদ্যোতক আর একটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া 'কীর্তিলতা'র আলোচনার উপসংহার করিব।

হীন্দু তুরকে মিলল বাস।
একক ধম্মে অওকা উপহাস॥
কতহুঁ বাঁগ কতহুঁ বেদ।
কতহুঁ মিসি মিল কতহুঁ চ্ছেদ॥
কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা।
কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা॥
কতহুঁ তম্বারু কতহুঁ কূজা।
কতহুঁ নীমাজ কতহুঁ পুজা॥

কতহুঁ তুরক বরকর।
বাঁট জাহতে বেগর ধর॥
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।
মথা চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া॥
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপর চড়াবএ চাহ ঘোর॥
ধোআ উরিধানে মদিরা সাঁধ।
দেউর ভাগি মসীদ বাঁধ॥

হিন্দু ও তুর্কে পরস্পর প্রতিবেশী হইল। একের ধর্মে অপরের উপহাস। কোথাও আজান (?), কোথাও বেদপাঠ। কোথাও মেলা-মেশা, কোথাও বিবাদ। কোথাও ওঝা (উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ), কোথাও খোজা, কোথাও নকত, কোথাও রোজা। কোথাও তম্বারু, কোথাও কুজা (বিভিন্ন প্রকারের পানীয়াধার)। কোথাও নমাজ, কোথাও পূজা হইতেছে। কোথাও তুর্কী কর্মচারী রাস্তায় যাইতে বেগার ধরিতেছে। কোথাও ব্রাহ্মণের ছেলে ধরিয়া আনিয়া তাহার মাথায় গাইএর চুড়ুয়া চাপাইতেছে। তিলক চাটিয়া ফেলিয়া ও পৈতা ছিঁড়িয়া ঘোড়ার উপর চাপাইতেছে (অর্থাৎ বলপূর্বক ধর্ম নাশ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করাইতেছে)। ধোয়াউরি ধানের মদ্য পান করিতেছে ও দেউল ভাংগিয়া মস্‌জীদ্ নির্মাণ করিতেছে।

লক্ষ্মণ সংবৎসরের আড়াই শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের একত্র বাসের ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল, দুই বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার সংস্পর্শে মিলন ও প্রতিকূলতা, সহনশীলতা ও সংঘর্ষের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া যে নূতন সংস্কৃতি-সংশ্লেষের (synthesis) সূচনা হইতেছিল, কবি সামান্য কয়েকটি পংক্তিতে তাহাব কি উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই বর্ণনার মধ্যে কি আশ্চর্যরূপ ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদর্শিতার, সমাজ-বিবর্তনের প্রতি কি তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় মিলে!

(৯)

'কীর্তিলতা'য় পদ্যের মাঝে মাঝে কয়েকটি গদ্য বাক্যাবলীও আছে। ইহাদের রচনারীতি (style) কোথাও কোথাও দীর্ঘ সন্ধি-সমাস-বিড়ম্বিত

সংস্কৃত-বাক্য-গঠনের অনুকারী, কোথাও বা খুব সরল সংক্ষিপ্ত পদযোজনায় সম্পূর্ণ। উভয় প্রকারের দৃষ্টান্ত সময় সময় একই বাক্যে মিলিত হইয়াছে। যথা, প্রবল শত্রুবল-সংঘট্ট-সম্মিলন-সর্ম্মর্দ্দ-সংজাত-পদাঘাত-তরলতর-তরঙ্গ-খুরক্ষুণ্ণ বসুন্ধরাধূলিসংভার-ঘনান্ধকার-শ্যাম-সমর-নিশাভিসারিকা প্রায় জয়লক্ষ্মী-কর-গ্রহণ-করেও, বুড়ন্ত রাজ্য উদ্ধরি ধরেও (ডুবন্ত রাজ্যকে উদ্ধার করিয়া), প্রভুশক্তি, দানশক্তি, জ্ঞানশক্তি, তিহুহু শক্তিক পরীক্ষা জানলি। রুসলি বিভূতি পল্‌টাএ আনলি (রোষ-পরায়ণ সম্পদকে ফিরাইয়া আনিলেন)।

তাহ্নি বৈশ্যাহিকরো সুখসার মণ্ডন্তে, অলক তিলক পত্রাবলী খণ্ডন্তে, দিব্যাম্বর পিন্ধন্তে, উভারি উভারি (খুলিয়া খুলিয়া) কেশ পাশ বন্ধন্তে, সখিজন প্রেরন্তে, হসি হেরন্তে। এই সমস্ত সরল, সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহ হইতে তখনকার গদ্যরীতি যে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদসমূহের অনিশ্চয়তা ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ক্রিয়াপদের রূপ প্রায়ই সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী। যনাবঞো, লাবঞো, জম্পঞো, কহো, সমপ্পঞো—জানাইব, লইব, কহিব বা কহিতেছি, সমর্পণ করিব—প্রথম পুরুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ। 'আবথি' (আসে), আনথি (আনে), পাবথি (পায়), মানথি (মানে); বুজ্ঝই, ভাবই, পাবই, (বুঝে, ভাবে, পায়)—কতকটা বিধিলিঙ এর লক্ষণাক্রান্ত), আনহি, ধাবহি, বোলহি (অভ্যস্ত কর্মের সূচক); হস, ধর (হাসিতেছে, ধরিতেছে)—তৃতীয় পুরুষের বর্তমান কালের রূপ। তৃতীয় পুরুষের বহু বচনের—মণ্ডন্তে, বন্ধন্তে, কহন্তে, ভরন্তে ; ভণন্তা, পিবন্তা, কহন্তা ; লোট্টন্ত, টুট্টন্ত, পিবন্তো, ভরন্তো, করন্তো ; তৌল্লন্তি, বেসাহন্তি—ইত্যাদি নানাবিধ রূপ দেখা যায়। 'যই, উচ্ছাতে ফুর কহসি' (যদি উৎসাহপূর্বক স্পষ্ট করিয়া বল), জীবসি (জীবিত থাকিবে)—দ্বিতীয় পুরুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ। 'মোর বঅন আকন্ন করহুঁ' (আমার বচন শুন), জাঁহি (যাও), 'ন রাখহি গোএ' (গোপন করিয়া রাখিও না), কহহি (কহ), ভুঞ্জহ (ভোগ কর)—দ্বিতীয় পুরুষের লোট্ বা সম্বোধনের রূপ।

অতীত কালের কোন নির্দিষ্ট রূপ আবিষ্কার করা কঠিন। কর্মবাচ্যের বহুল প্রয়োগ সংস্কৃত প্রভাবের আর একটি নিদর্শন 'জেন্নে বলে রাবণ মারিঅ' (যাঁহা দ্বারা রাবণ নিহত হইয়াছিল), 'জেন্নে নিঞ কুল উদ্ধরিউ'

(যাঁহার দ্বারা নিজকুল উদ্ধার হইয়াছিল); পুরই, চুরই (পূর্ণ, চূর্ণ হইল); 'জেহ্নে অখিজন বিমন ন কিজ্জিঅ' (যাঁহাদিগের দ্বারা অর্থিজন প্রত্যাখ্যাত হয় নাই); 'খলে সজ্জন পরিভবিঅ' (খলের দ্বারা সজ্জন পরাভূত হইল)। কর্তৃবাচ্যের রূপ :—'জেঁ সবে করিঅউ অপ্পবস' (যিনি সকলকে নিজ বশ করিয়াছিলেন); পূরেও, চূরেও (পূর্ণ, চূর্ণ করিয়াছিলেন); জানলি, আনলি, (জানিলেন, আনিলেন—বোধ হয় অদূর অতীতের রূপ); হারল, মারল, দেল, বহল, ভেল (হারিল, মারিল, দিল, বহিল, হইল—বোধ হয় অসম্ভ্রমব্যঞ্জক রূপ); পড্ডু (পড়িল); পফুরিঅ (স্ফুরিত হইল); সগ্‌গ গঁউ (স্বর্গ গেলেন); জাগু, লাগু (জাগিল, লাগিল)। অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্যও সংস্কৃতের সহিত আর একটি যোগসূত্র, বিমুক্কিঅ (ত্যাগ করিয়া); পন্নবিঅ (প্রণাম করিয়া); চ্ছোড্ডিঅ (ছাড়িয়া); পজ্জটই, খেল্লই, হসই, হেরই (বেড়াইয়া, খেলিয়া, হাসিয়া, দেখিয়া)।

বিশেষ্যের রূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধকারকের বিভক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'কেরক' বিভক্তি (যাহা হইতে বাংলার "এর" বা "র"এর উৎপত্তি) একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কুলকেরা বড্ডিপণ (কুলের গরিমা); দুষ্টাকরেও (দুষ্ট লোকের); তহ্নিকরেও (তাহার); তস্সকেরা (তাহাদের); তাহ্নিকরী (তাহাদের—বেশ্যাদের, স্ত্রী); নগরহ্নিকরোপরি (নগরের উপর); মধ্যাহ্নেকরী বেলা (মধ্যাহ্নের বেলা—স্ত্রীলিংগ) ; কল্লোলিনীকরী (কল্লোলিনীর —স্ত্রীলিংগ); পৃথ্বীচক্ককরেও (পৃথ্বীচক্রের); পঞ্চশরকরো (পঞ্চশরের), বেশ্যাহ্নিকরো (বেশ্যার)। আবার বীরপুরিসকো (বীরপুরুষের); সত্তুক (শত্রুর); অমরাবতীক (অমরাবতীর); জটীক (জটাধারীর), কতহ্নিক (কতলোকের); বিশ্বকর্ম্মহু (বিশ্বকর্মার)—এরূপ রূপও ব্যবহৃত হইয়াছে। মোর, মঝু, মহু (আমার); তুজঝু, তুজ্জ (তোমার), তুহ্ম, তোহঁ (তুমি); তসু, তাসু, জসু, জাসু (তাহার, যাহার প্রতি, যাহার) ইত্যাদি পদ সর্বনাম-শব্দের রূপবৈচিত্র্য সূচিত করে। ইহা ছাড়াও প্রকাশ-ভংগীর সংক্ষিপ্ততা অনেক সময় বৈয়াকরণিক সম্পূর্ণতার দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছে—যেখানে অর্থবোধে অস্পষ্টতা নাই, যেখানে ব্যাকরণের দিক দিয়া আবশ্যক অনেক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সংক্ষেপীকরণ কতটা কবির নিরংকুশত্বের, কতটাই বা কথ্য গ্রাম্য ভাষার শৃংখলাহীন স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা কঠিন।

(১০)

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে মনে হয় যে নিছক ভাষার দিক্ দিয়া 'পদাবলীর' উপর 'কীর্তিলতা'র প্রভাব খুব বেশী নহে। 'কীর্তিলতা'র ভাষা যে একটা নূতন পরীক্ষামূলক প্রবর্তন, ইহার যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য নাই, তাহা বিদ্যাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষাকে তিনি 'অবহট্ট' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'অবহট্টে'র অর্থ হাটে প্রচলিত, সাধারণ লোকের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত। এই ভাষার মিশ্রতা বা সাংকর্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রাকৃত উপাদান ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী; শব্দ ও ক্রিয়া-রূপের মধ্যেও প্রকাশভংগীতে (idiom) মৈথিল ও হিন্দীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; দুই শতাব্দীব্যাপী মুসলমান সাহচর্যেব ফলে অনেক আরবী, পারসী শব্দও ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহা একটি শক্তিশালী, ক্রম-প্রসারশীল, বাহিরের নানা উপাদানে আত্মপুষ্টিসাধনে তৎপর ভাষা বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার ভবিষ্যৎ সক্রিয়তা ও পরিণতির আর কোন নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যাপতি নিজে তাঁহার পরবর্তী রচনায় এই ভাষা ব্যবহার করেন নাই। বোধ হয় সাহিত্যিক আদর্শের দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যিক মৈথিল, হিন্দী ও বাংলার স্পষ্টতর ক্রম-বিকাশ ব্যাকরণের নিয়মকানুনের দিক দিয়া শিথিলবন্ধ, বাস্তব জীবনের অনিয়মিত প্রাচুর্যের ছাপমারা এই পাঁচ-মিশালী ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবভাবের প্রসার ও ললিত-মাধুর্যগুণ-সমৃদ্ধ কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার আবির্ভাব ভাষাগত রুচি ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মুখ্যধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিল। ব্রজবুলির উৎপত্তি-কাহিনী ভাষাতাত্ত্বিকের নিকট এখনও রহস্যাবৃত। কবে এবং কি প্রক্রিয়ার অনুসরণে এই ভাষা-তিলোত্তমা প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহের নিকট তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া স্বকীয়তা অর্জন করিল, তাহার উপর কোনও আলোকপাত হয় নাই। ব্রজভাষা, মৈথিলী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার সহিত ইহার সম্পর্কও নির্ণীত হয় নাই। তবে বিদ্যাপতি যখন এই ব্রজবুলি ব্যবহার করিয়াছেন তখনই ইহার ধ্বনিমাধুর্য, সুকুমার পরিমণ্ডল রচনার নৈপুণ্য ও পদসংস্থানের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতি যে পদাবলী-রচনায় মৈথিল ও অবহট্ট পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেই রসিক সমাজে মধুররসবর্ণনায় ইহার

উপযোগিতার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা প্রমাণ হয়। অবহট্ট ও ব্রজবুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ সহজ নহে; একের বর্জন ও অপরের প্রবর্তনের পিছনে যে কোন্ প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল তাহা অনুমানের অনিশ্চিত উপলব্ধির মধ্যেও ধরা পড়ে না। বিরল ক্ষেত্রে একই শব্দের প্রয়োগ (যথা ঝংখ) বা ক্রিয়াপদ-নিষ্পন্ন বিশেষণের আকৃতি-সাম্য উভয় ভাষার সমগোত্রীয়ত্বের ইংগিত বহন করে। পদাবলীর ৩৩৩নং পদে 'চিটিগুড় চুপড়লি' (চিটগুড় মাখান) 'রাড়ক পোরি' (ইতর ব্যক্তির গৃহ) ও কীর্তিলতার 'রূসলি বিভূতি পলটি আনলি'—এই উভয় বাক্যে 'চুপড়লি' ও 'রূসলি' একই নিয়মে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়।

উভয় রচনার মধ্যে প্রকৃত ঐক্য বহির্গঠনে নয়; এমন কি অন্তঃপ্রকৃতিতেও নয়—ইহা সাধারণ সৌন্দর্যবোধে, বক্তব্য বিষয়ের একই প্রকারের কাব্যানুরঞ্জনে। ছন্দ ও উপমার মধ্য দিয়া এই সৌন্দর্যবোধ সুপরিস্ফুট ছন্দ-বিন্যাসের দিক্ দিয়া 'কীর্তিলতা' 'পদাবলীর' পূর্বগামিত্বের দাবী করিতে পারে। যুদ্ধের বিসদৃশ বীভৎসতার মধ্যে যতখানি সৌন্দর্য সঞ্চার করা সম্ভব বিদ্যাপতি নানা বিচিত্র ছন্দের ধ্বনি-প্রবাহের দ্বারা তাহা করিয়াছেন। বারনারীদের সৌন্দর্য বর্ণনায় যে দৃষ্টিভংগীর পরিচয় মিলে ভক্তির প্রলেপ মাখাইয়া তাহাই রাধিকার রূপ-বর্ণনাতেও ক্রিয়াশীল। ১৫৬নং পদে প্রথম-মিলন-কুণ্ঠিতা রাধিকার পরাঙ্মুখতা বর্ণনা-প্রসংগে কবি লিখিয়াছেন—

বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ ॥[১]

কাম-কেলিকে কৃত্রিম যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত করিয়া যুদ্ধোচিত পরিমণ্ডলে উহার সংস্থাপন—সংস্কৃত সাহিত্যের অতি প্রাচীন কাব্যরীতি এবং বিদ্যাপতি এখানে নিশ্চয়ই এই অতিরঞ্জন-তুষ্ট প্রথারই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি 'কীর্তিলতা'র যুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে কতক পরিমাণে তাঁহাকে উপমা-নির্বাচনে প্রভাবিত করিয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় অসংগত হইবে না।

কিন্তু 'কীর্তিলতা'র প্রত্যক্ষ ও অসন্দিগ্ধ প্রভাব পড়িয়াছে পদাবলীর ১০০৭ ও ১০০৮ নং পদের উপর। এই দুইটি পদ যুদ্ধ বিষয়ক—শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ ও যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে। এই পদদ্বয়ের ভাষা ও ভাবের

---

১ ছত্রভংগ সৈন্যদলকে কে ফিরাইয়া আনিবে?

মধ্যে 'কীর্তিলতা'র রণোন্মাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কীর্তিলতা'র ঘটনাকাল ২৫২ লক্ষ্মণাব্দ, শিবসিংহের রাজ্যাভিষেক ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে—সুতরাং চল্লিশ বৎসর ব্যবধানের পর বিদ্যাপতি আবার তাঁহার তরুণ জীবনের যুদ্ধ বর্ণনার উদ্দীপনা নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে পুরাতন বিষয়ের সংগে সংগে পুরাতন অবহট্ট ভাষাও এই দুইটি পদে পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে—ভণিতাতে কবি 'বিজ্জাবই' নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 'কীর্তিলতা'য় শব্দ-প্রয়োগ ও ক্রিয়া-পদের রূপের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছে এই পদদ্বয়েও সেগুলি সুপরিস্ফুট—পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে ইহারা যেন অবলুপ্ত অতীতের নিদর্শনস্বরূপ অনেকটা খাপছাড়াভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের বর্ণনায়, ছন্দ-বিন্যাস ও উপমা-সন্নিবেশে একইরূপ শিল্পকলা ও কল্পনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে। পদের। ১০০৮) পংক্তিদ্বয়

তরল তর তরবারি রঙ্গে
বিজ্জুদমে ছটা তরঙ্গে

'কীর্তিলতা'র 'চৌদিস চক মক চমক্ক হোই খগ্গ তরঙ্গে' ও 'তরবারি চমক্কই বিজ্জুদ্ঝলা'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পদের—

মেরু কনক সুমেরু কম্পিয়।
ধবণি পূরিয গগণ ঝম্পিয॥

ও 'কীর্তিলতা'র—

গিরি টরই মহি পডই নাগ মন কম্পিআ।
তর্বণি রথ গগণ পথ ধূলিভরে ঝম্পিআ॥

পদের—

অন্ধ কুঅ কবন্ধ লাইঅ
ফেরবি ফফ্রিস গাইঅ
রুহির মত্ত পরেত ভুত
বেতাল বিছলিও॥

ও 'কীর্তিলতা'র—

মহামাসুখণ্ড পরেতো ভরন্তো।
সিআসার ফেক্কার রোলং করন্তো॥
... ...
উলট্টি পলট্টা পলন্তো কবন্ধো।

নর কবন্ধ ধর ফলই মম্ম বেআবহ পেল্লই।
রুহির তরঙ্গিণী তীর ভুতগণ জরফরি খেল্লই ॥

—ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য, একই হাতের রচনার চিহ্ন স্বপ্রকাশ। এমন কি উভয়ত্রই রাম ও দধীচির সহিত আদর্শ নৃপতির তুলনা রচয়িতার অভিন্নত্বের নিদর্শন।

পদে—

বামরূপে স্বধম্ম রখিথঅ
দানদপ্পে দধীচি খখিঅ।

ও কীর্তিলতায়—

বাম দেবক বীতি দান-প্রীতি
অকৃত্য বাধা বলি কর্ম্ম দধীচি করো স্পর্দ্ধা সাধ।

১০০৮ পদে বিদ্যাপতি ভণিতায় আপনাকে নব জয়দেব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উপর জয়দেবের প্রভাব, তাঁহার জয়দেবের সমকক্ষতা লাভের আকাংক্ষা সূচিত হইতেছে। যুদ্ধ বিষয়ক পদে জয়দেবের নামোল্লেখ একটু বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। কিন্তু 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' জয়দেবের যে সমস্ত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমরা তাঁহার এক নূতন পরিচয়ের ইংগিত পাই। তিনি কেবল মাত্র মাধুর্য-রসের কবি ছিলেন না, পরন্তু লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা ও তাঁহার দিগ্বিজয়-প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। হয়ত বিদ্যাপতি তাহার পূর্ববর্তীর কাব্যের এই রণোদ্দীপনার দিক্ স্মরণ করিয়াই বর্তমান পদে তাঁহার খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হইয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'কীর্তিলতা'কে কাঁচা হাতের রচনা ও গ্রাম্য ভাষায় লিখিত বলিয়া অনেকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার কাব্যগুণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকতার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে ছন্দের অসম দৈর্ঘ্যে, ভাষার পরিমিতি-হীন আতিশয্যে ও কলাকৌশলের শিথিলতায় কিছু অপরিণতির চিহ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় মিলে তাহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। বিদ্যাপতি তরুণ বয়সে সাহিত্যে অপ্রচলিত ভাষায় যুদ্ধ ও রাজনীতির ন্যায় নীরস বিষয়ে লিখিয়াও যে কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি প্রতিভার অসাধারণত্বই সূচিত হয়।

গ্রীয়ারসন সংগৃহীত বিদ্যাপতির পদের আলোচনা

(১)

এইবার গ্রীয়ারসনের পদগুলির আলোচনার দ্বারা উপরি উক্ত মন্তব্যসমূহের যাথার্থ্য যাচাই করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে নায়িকার রূপবর্ণনা, নায়ক-নায়িকার প্রথম প্রেমসঞ্চার, প্রথম মিলনে নায়িকার অনিচ্ছা ও বিমুখতা এই বিমুখতার অন্তরালে ছদ্মবেশী আগ্রহের ক্রমবিকাশ, অভিসার, মিলনের আনন্দ, সন্দেহ-পরায়ণা ননদীর নিকট দোষক্ষালন-চেষ্টা, মান, নায়কের প্রতি শ্লেষবাক্য-প্রয়োগ ও খেদোক্তি, সখির অনুযোগ ও আত্মনির্বেদ, প্রেম-বৈচিত্ত্য, বিরহ, ভাবসম্মিলন—প্রভৃতি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সমস্ত শ্রেণীবিভাগগুলিই উদাহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইটী হরগৌরী-বিষয়ক, দুইটী প্রাকৃত, শিষ্টরুচিবিরোধী ভালবাসার পদ ও কয়েকটী প্রহেলিকামূলক রচনা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। হরগৌরীবিষয়ক পদ দুইটীর (৯৪৬, ৯৪৭ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সংস্করণ) ও এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কয়টি পদেরই ভাষা বৈষ্ণব পদের সহিত তুলনায়, বাংগালীর পক্ষে দুর্বোধ্য, অপরিচিত শব্দ ও রচনারীতিতে আকীর্ণ। মনে হয় যেন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লইয়া বাংগালীর সহিত যে ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক মিলন ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ইহাদের ভাষা অনেকটা মার্জিত ও পরিবর্তিত হইয়া বাংগালীরচিত পদের ভাষার সাদৃশ্য অর্জন করিয়াছে। শৈব পদগুলি মিথিলার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাংগালীর মানস রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই বলিয়া তাহাদের আদিম মৈথিল রূপটি প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছন্নছাড়া বিবাহ-প্রয়াসী শিবের অবস্থাবর্ণনার উদ্ভট পরিকল্পনার সহিত অদ্ভুত, অখ্যাত শব্দগুলির বেশ সুন্দর মিল হইয়াছে। প্রবহমাণ স্রোতে বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ঘর্ষণে মসৃণ হয়; কিন্তু তাহারা বদ্ধ জলাশয়ে কর্দমপ্রোথিত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের অসম কর্কশতার কোন পরিবর্তন হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়ম ক্রিয়াশীল। 'পজিয়ার' (ঘটক), 'পলানল' (পৃষ্ঠে জিন করিল), 'তঙ্গ' (ফিতা), 'ভকোসথি' (খায়), 'মনাইনি' (মেনকা) ইত্যাদি খাপছাড়া মধ্যবর্তিতায় শিবের বীভৎস মহান রূপটি চমৎকার ফুটিয়াছে।

১০২২ ও ১০২৩ পদে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উদাত্ত আধ্যাত্মিকতা যে স্থূল, গ্রাম্যসমাজ-সুলভ লালসার প্রচ্ছন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কৌতুকাবহ রূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদে এক পথিক আতিথ্যভিক্ষার ব্যপদেশে এক গ্রাম্যবধুকে প্রণয়-নিবেদন ও তরুণীর নিকট হইতে সোৎসাহ সম্মতি লাভ করিতেছে। দ্বিতীয় পদে বয়ঃকনিষ্ঠ বরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ যুবতী নিজ অবস্থার লজ্জাকর অসংগতি অনুভব করিয়া পথিকের মারফৎ পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠাইতেছে—পিতা যেন এই দুগ্ধপোষ্য জামাতার প্রতি-পালনের জন্য গাভীদুগ্ধের ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি পদে প্রাচীন যুগে বিহারের গ্রামাঞ্চলেব সামাজিক জীবনের এক স্তরের এক উজ্জ্বল, বাস্তব ছবি ইংগিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মজার কথা এই যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক ভণিতা সংযোগের দ্বারা এই অতি সাধারণ স্তরের কামনার পদ দুইটিকে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া ঐশী প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত করিবার একটা হাস্যকর চেষ্টা হইয়াছে। কেমন করিয়া সাধারণ নরনারীর আদিম অসংস্কৃত মিলনেপ্সা আধ্যাত্মিক প্রতিবেশের মধ্যে গৃহীত হইয়া নিজে উন্নত হইয়াছে ও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে বাস্তব আবেগ ও সার্বভৌম আবেদনের সঞ্চার করিয়াছে, কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রিয় দেবতায় ও দেবতা প্রিয়ে পরিণত হইয়াছে, আপামর সাধারণের জৈব আকাংক্ষার ভিতর বৈষ্ণব-প্রেমের মহামন্ত্র কি করিয়া গুঞ্জরিত হইয়াছে, এই পদ দুইটিতে তাহার রহস্যময় ইংগিত নিহিত আছে। ভণিতাগুলি হয় ত পরবর্তী যুগে কোন নকল-কারকের দ্বারা আরোপিত হইয়া থাকিবে। প্রথম পদের ভণিতা—

"ভণহি বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥"

৬৯৪নং পদ হইতে অবিকল গৃহীত। দ্বিতীয় পদের ভণিতা বৈষ্ণব-পদাবলীর খুব সাধারণ উপসংহার।

বিদ্যাপতির প্রহেলিকা-ধর্মী পদগুলি চর্যাপদ ও চণ্ডীদাসের অনুরূপ পদ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন। চর্যাপদ ও চণ্ডীদাসে হেঁয়ালির ভিতর দিয়া এক গভীর অধ্যাত্মসাধনার ইংগিত মিলে। কবিরা সাধনার এই গুহ্যতত্ত্ব অর্ধাবৃত রাখিবার জন্যই যেন এক দুর্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরেজীতে যাহাকে বলে Symbolism, এক পর্যায়ের ঘটনাবিবৃতির দ্বারা উচ্চতর পর্যায়ের অনুভূতির আভাসে পরিচয় দান, এই রচনাগুলি তাহারই সুষ্ঠু উদাহরণ। কবির ভাষা-

প্রয়োগে যে নিঃসংকোচ সাহস, ভাষার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা, যে রহস্যময় উপলব্ধির অনুরণন, উপমা ও চিত্রনির্বাচনে যে অবিচলিত উদ্দেশ্যের সক্রিয়তা—তাহারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, পদগুলি অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি নহে, পরন্তু পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা উপলব্ধ এক পরম অভিজ্ঞতার তির্যক্ অভিব্যক্তি। ইহাদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির প্রহেলিকাগুলি নিম্নস্তরের, নিছক বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের মারপ্যাঁচ মাত্র। লেখক অর্থকে সহজ কথায় প্রকাশ না করিয়া উহাকে পৌরাণিক allusion (পরোক্ষ উল্লেখ)-এর জটিল চক্রব্যূহে বন্দী করিয়াছেন—পাকে পাকে এই জাল ছাড়াইয়া বন্দী অর্থের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। রাধিকার গতির তুলনা স্বরূপ ঐরাবতকে 'গরুড়াসন-সখ-তাতক বাহন' (১৫০নং পদ) আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে ; তাহার ষোড়শ সজ্জা বুঝাইতে

"সাগর গরহ (৭+৯) সাজি বর কামিনী
চললি ভবন পতি তাহী।" (১৫২)

এইরূপ বর্ণনা-প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। 'ধরম' বুঝাইতে

"লিখব উনৈশ সতাইক সঙ্গ
সে পুনি লিখব পচীসক সঙ্গ।" (৮৭১)

বর্ণমালায় 'ধ', 'র' ও 'ম' এই তিনটী বর্ণের অবস্থিতির সংখ্যাঘটিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; ও 'কট' বা প্রতিশ্রুতি বুঝাইতে 'প্রথম (ক) একাদস (ট) দই পহু গেল' এইরূপ উক্তির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ রচনাভংগীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যাভিমান ও পাঠকের বুদ্ধিপরীক্ষার দ্বারা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মনোভাব প্রকটিত হইতে পারে, কিন্তু কবিত্বের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

(২)

নায়িকার রূপবর্ণনা হইতে পদাবলী-সাহিত্যের আসল বিষয়ের আরম্ভ। ৬২, ৭০, ১৫০, ১৫১, ১৫২, সংখ্যক প্রহেলিকাত্মক পদগুলি এই বিষয়ে রচিত। হয়ত এই রূপবর্ণনার মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই—সংস্কৃত সাহিত্যের চিরপ্রথাবদ্ধ প্রণালীই এখানে অনুসৃত হইয়াছে। উপমা নির্বাচনেও আধুনিক রুচি অনুসারে বৈচিত্র্যের অভাব ও কষ্টকল্পনা লক্ষিত হয়। কিন্তু তথাপি যথাযথ ছন্দোবিন্যাস ও শব্দসমূহের ভিতর দিয়া প্রবহমান ধ্বনিমাধুর্যের

মধ্যে কবির সৌন্দর্যপিপাসু, রূপ-বিকল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতের, জীবন হইতে বহুদূরে অপসারিত প্রকাশভংগী হইতে জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত হৃদয়াবেগে স্পন্দমান প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তর সাধনেই কবিকল্পনা আত্মানুশীলনের যথেষ্ট অবসর খুঁজিয়া পাইয়াছে। নূতন ভাষাই এই রূপবর্ণনা-মূলক পদগুলিকে গতানুগতিকতার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছে।

নীল বসন তন ঘেরল সজনি গে
সির লেল চিকুর সঁভারি।
তা পর ভমরা পিবত রস সজনি গে
বইসল পাঁখি পসারি॥ (৭০)

এই পংক্তিগুলিতে মৌলিক কবিপ্রতিভা হয়ত নাই, কিন্তু ইহাদের ভিতর দিয়া সৌন্দর্যের পুলকিত উপলব্ধি যে হিল্লোলিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

তারপর নায়ক-নায়িকার পরিচয় ও মিলনের পালা। ১২৬ ও ১২৭ সংখ্যক পদে নায়কের অনুসরণে নায়িকার কপট প্রতিবাদ ও কাতর অনুনয়ের অভিনয় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতা হিসাবে এই দুইটি পদ বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না—বিশেষতঃ দ্বিতীয় পদে ইতর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্যসুরের রেশ শোনা যায়। কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, কবি এখানে কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব ঘোষণা করিয়া রাধিকার মূঢ়তাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এইখানে ইহারা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদের সহিত এক সুরে বাঁধা। দ্বিতীয় পদে ভাগবত-বহির্ভূত নৌকাখণ্ডের পালা গীতি-কবিতার বিষয়রূপে বিদ্যাপতিকে প্রভাবিত করিয়াছে—তাহার প্রমাণ মিলে। যদি সনাতন গোস্বামী দ্বারা মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসংগে উল্লিখিত চণ্ডীদাসকে নৌকাখণ্ডের আদি কবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এখানে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রবর্তিত আখ্যায়িকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন স্বীকার করিতে হয় এবং উভয়ের কালগত পারম্পর্য বিষয়ে কিছু আলোকপাত হয়।

ভণহি বিদ্যাপতি গাওল রে
সুমু গুণমতি নারী।
হরিক সঙ্গ কিছু ভর নহি হে
তোঁহ পরম গমারী॥ (১২৬)

ও

বিদ্যাপতি এহো ভানে।

পূজরি ভজু ভগবানে, কন্হৈয়া ॥

এই দুইটি ভণিতা পরবর্তী যুগের ভক্তিরসের কিছু পূর্বাভাস দেয়।

অতঃপর অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের প্রথম মিলনে, কিশোরী নায়িকার ভয়বিহ্বল অনিচ্ছুকতা বিষয়ে কয়েকটি পদ আছে। পূর্বতন সাহিত্যে নায়িকার এই দৈহিক মিলন-পরাঙ্‌মুখতার কিছু উল্লেখ থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, বয়ঃসন্ধি-বিষয়ক ও এই জাতীয় পদের প্রাচুর্য বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নায়িকার প্রতি বাস্তব গুণের ক্রমপ্রসারশীল আরোপের ফল। রাধিকা যখন সংস্কৃত সাহিত্যের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে ভাষা-সাহিত্যের উদার বিস্তৃতির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধর্মের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে রস-অনুভূতি-পূর্ণ জীবনের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন জীবন তাহার অফুরন্ত বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার লইয়া তাঁহার দেহ ও মনের প্রসাধনে লাগিয়া গেল।

এতদিন কোকিল, গজ, সিংহ, চন্দ্র, বিম্ব, দাড়িম্ব প্রভৃতি কয়েকটী পুরাতন আমলের পরিচারকের উপর যে প্রসাধনের ভার ন্যস্ত ছিল, নূতন ব্যবস্থায় তাহারা কর্মচ্যুত না হইলেও গৌণ পর্যায়ভুক্ত হইয়া রহিল। সত্যিকার সমাজ-জীবনে কিশোরীর স্ফুটনোন্মুখ সৌন্দর্য তাহার দেহ ও মনে নিগূঢ় পরিবর্তনের আভাস, প্রথম প্রিয়-সমাগমে তরুণীর সলজ্জ মধুর চলচ্চিত্ততা—এই সমস্ত সুকুমার বিকাশ বাস্তব হইতে কল্পনায়, মানুষ হইতে দেবতায় সংক্রামিত হইয়া রাধিকাকে 'বিকসিত বিশ্ববাসনার' পরিপূর্ণ শতদলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৯৬, ২০২ ও ২১৩ এই সাতটি পদে নায়িকার মিলনে অনিচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান পদটি মিথিলা-গীতসংগ্রহে নন্দীপতি নামক কবির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা অন্য কবির রচনা বলিয়া মনে হয়। ১৫৪ ও ২০২ নং পদে কবির তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, রচনার কৌশল, রাজসভাসুলভ বক্রোক্তি-নৈপুণ্য উদাহৃত হইয়াছে।

ভণ বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ।[১]

আগি জারিয়ে পুনু আগিক কাজ ॥

১। তেজ ভয় লাজ

অর্থাৎ আগুনে পুড়িলে পুনরায় আগুনেই তাহার প্রতিকার হয়—প্রথম মিলনের ক্লেশ উপশমের প্রকৃষ্ট উপায় সেই অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি। পদগুলি সমগ্রতঃ খুব উচ্চ অংগের নহে, তবে মাঝে মধ্যে এক একটী যুগ্মপংক্তিতে কাব্যসৌন্দর্য ও মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর॥ (১৫৪)

বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ।[১]
লগ নাহি সরএ, করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥[২]
মোহর মুদল অছি মদন ভঁড়ার।[৩] (১৫৬)

... ...

কর না মিঝায় দূর জরু দীপ।
লাজে না মরএ নারি কঠজীব![৪] (১৬৭)

... .

অধর দসন[৫] দেখি জিউ মোরা কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে॥
সমুদ্র ঐসন নিশি ন পারি এ উর।
কখন উগত মোর হিত ভএ দূর॥[৬] (২০২)

১। মেঘরূপ নীল বস্ত্রের অন্তরালে মুখচন্দ্র ব্যক্ত হয় না।

২। জোর করিয়া কোলে করিলেও কাছে আসে না। হাত দ্বারা হাত ঠেকাইয়া হাত জোড় করিয়া অনুনয় করে।

৩। মদনের ভাণ্ডার শীল-মোহর করা আছে—সৌন্দর্য উপভুক্ত হয় নাই—পদাবলী-সাহিত্যে বহু-প্রযুক্ত উপমা।

৪। শয়নগৃহের প্রদীপ শয্যা হইতে দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া তাহা নিবান যায় না। লজ্জাতে মৃতপ্রায় হইয়াও কঠিনপ্রাণ নারীর জীবন বাহির হয় না।

৫। দংশন।

৬। সমুদ্রের ন্যায় রাত্রি, তাহার সীমা পাই না। কখন আমার হিতকারী সূর্য উঠিবে?

খন পরিতেজ মন আবএ পাশ।
ন মিলএ মন ভরি ন হোয় উদাস॥
নয়নক গোচর থির নাহি হোয়।
কর ধরইত ধনি মুখ ধরু গোয়॥ (২১৩)

অর্থাৎ তখনই ছাড়িয়া যাইতেছে, তখনই নিকটে আসিতেছে; পূর্ণভাবে মিলিতও হয় না, আবার একেবারে উদাসীনও নহে। চক্ষুর সামনে স্থির হইয়া থাকে না, হাত ধরিয়া মুখকে গোপন করিয়া রাখে।—ইহা তরুণীর দ্বিধা কম্পিত মনের সুন্দর ছবি।

পদগুলিতে 'ঝিক-ঝোর' (টানাটানি করা), 'কিবার' (কবাট), 'বালঃ বেসনি' (তরুণ বল্লভ), 'কঠজীব' (কঠিনপ্রাণ), 'অরুঝা এল' (জড়াইয় গেল) প্রভৃতি বাংলা ভাষার অজ্ঞাত শব্দ ও প্রয়োগরীতির প্রাচুর্য পরবর্তী যুগের বাংগালী কবির হস্তমাজনার অভাবই সূচিত করে।

(৩)

বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অভিসার রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার এক অভিনব পরিকল্পনা। প্রাচীন সমাজে কামকেলি-বিলাসের মধ্যে অভিসারের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং প্রাচীন সাহিত্যেও সমাজ ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সাধারণতঃ উচ্চকুলোদ্ভবা রাজমহিষী বা সাধারণ বারনারী প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে অভিসার-যাত্রা করিত। রাজমহিষীর অভিসার হয়ত সুবিস্তৃত রাজান্তঃপুরের অবরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—প্রকাশ্য রাজপথ বাহিয়া বারনারীরাই অভিসারে যাইত। "নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা"—এই অভিসার প্রবণতার মধ্যে হয়ত পুরাকালের নারীর স্বাধীনতা ও সাহসিকতার কিছু নিদর্শন আছে; কিন্তু মোটের উপর ইহা একটি কৃত্রিম বিলাস-ব্যসনের রীতিরই অনুসরণ, ইহার মধ্যে দুর্বার হৃদয়াবেগের স্পন্দন অনুভূত হইত না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে গোড়া হইতেই এক দুর্জয়, সর্বত্যাগী আকর্ষণের ইংগিত নিহিত আছে। রাধার অভিসার কেবল-মাত্র গতানুগতিক প্রণয়রীতির প্রতি আনুগত্য নহে; ইহা সাংসারিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, লৌকিক পাপপুণ্যের আদর্শকে অস্বীকার করিয়া এক প্রচণ্ড দুরতিক্রম্য আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণ। রাধার অভিসারের মধ্যে প্রথম

হইতেই আধ্যাত্মিক অভীপ্সার দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা ভগবানের প্রতি ভক্ত মানবাত্মার বাধাবন্ধহীন উর্ধ্বাভিযানের ব্যাকুল আগ্রহ। এই অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ছাড়া প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের নিগূঢ়, বৈদ্যুতীপূর্ণ আকর্ষণ এই যাত্রাকে কাম্যতম, শ্লাঘ্যতম রমণীয়তায় মণ্ডিত করিয়াছে। যমুনাতীরের তমাল-শ্যাম বনভূমি, কখনও বা পূর্ণিমা-কৌমুদীপ্লাবিত—কখনও বা মেঘান্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য—যাত্রাপথের রহস্যময় পরিবর্তনশীলতা ও বাধাবিঘ্নভূয়িষ্ঠতা, নিরুদ্দেশ যাত্রার ভয়-শিহরণ, সম্মুখের আকর্ষণ ও পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনের বিপরীত টানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত মিলিয়া অধ্যাত্ম-জগতের এক অরূপ কামনাকে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে অভিষিক্ত ও নাটকীয় আবেগ ও ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণরস-সমৃদ্ধ করিয়াছে।

অধ্যাত্মব্যঞ্জনা ও প্রতিবেশ-প্রভাব ভাগবতকার ও জয়দেব উভয়েই বর্তমান। ভাগবতে রাসলীলা-বর্ণনা ও জয়দেবের প্রতি সর্গে প্রকৃতির যাদুমন্ত্র প্রেমের আবেশকে নিবিড়তর করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দুরূহ অধ্যাত্ম সাধনার সুরটি সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। ভাগবতকারের মনে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ঐশী মহিমা অত্যন্ত সরল ও প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত—সেইজন্য সাংকেতিকতার তির্যক্ পথ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। জয়দেবের কবিতায় বৃক্ষ-লতা-পল্লবের ঘন সন্নিবেশে লুপ্তপ্রায় সংকীর্ণ আরণ্য পথটির ন্যায় অতিপল্লবিত সৌন্দর্যবর্ণনায় অন্তরায়িত আধ্যাত্মিক সুরটি সহজে অনুভূতিগ্রাহ্য হয় না। বিদ্যাপতির পদাবলীতেই সর্বপ্রথম অভিসারের সাংকেতিক অর্থটি, ইহার মধ্যে নিগূঢ় কৃচ্ছ্রসাধনের ইংগিতটি সুপ্রকট হইয়াছে। কর্দম-পিচ্ছিল, কণ্টকাকীর্ণ পথ, ভুজংগ-সমাকুল বনস্থলী, বর্ষাস্ফীত, দুস্তর নদী, মেঘাবৃত রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার, সর্বোপরি অনায়ত্ত কামনার ব্যাকুল মর্মবেদনা প্রভৃতি দুর্গম যাত্রাপথের অন্তর-বাহিরের বাধাবিঘ্নসমূহ রূপক-প্রতিভাসের অর্থগৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই সাংকেতিকতার রহস্য-দ্যোতনায় তিনি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-কবি-গোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক, এবং বোধ হয় গোবিন্দদাস ও রায় শেখর ছাড়া এই জাতীয় পদে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

কোন কোন পদে বিদ্যাপতির ভাব পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিতা হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রকাশভংগীর মৌলিকতায় ইহাদের অনুকারকত্ব একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের শব্দাড়ম্বর পেষণে কুণ্ঠিতাগ্র ভাবপ্রকাশের সহিত বিদ্যাপতির

মর্মস্পর্শী আবেদনের পার্থক্য নিম্নলিখিত দুইটি পদের তুলনামূলক আলোচনায় পরিস্কার হইবে।

চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ভীতিভাজো রজন্যাং
কিং বা ক্রমঃ ত্বদভিসরণে সাহসং মাধবাস্যাঃ
ধ্বান্তে যান্ত্যা যদভিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারত্নরোধো ব্যাধায়ি ॥
(কস্যচিৎ-রূপগোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলী, ১৯৬ নং পদ্য)

বিদ্যাপতি ৫৩৫ নং পদ

মাধব, করিঅ সুমুখি সমধানে[১]
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে ॥
বরিস পয়োধর ধরণি বারি ভর
রয়নি মহাভয় ভীমা।
এইঅও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা ॥
দেখি ভবনভিতি নিখিল ভুজগপতি[২]
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনী করে অপইত ফণি-মণি
বিহসী আইলি তুঅ পাসে ॥
নিজ পহু পরিহরি স'তরি বিখম নরি[৩]
আঁগিরি মহাকুল গারী।[৪]
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী ॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক[৫]
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু কখনে কী ন করাবে ॥[৬]

১। মনস্কামনা পূর্ণ করিও ২। ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত ভুজঙ্গম দেখিয়া
বঞ্চনা বিষম নদী ৪। শ্রেষ্ঠকুলের গঞ্জনা স্বীকার করিয়া
স্রোতা ৬। কাম ও প্রেম এক হইয়া থাকিলে কি না করাইতে পারে?

সংস্কৃত শ্লোকটী যেন নিশ্চল, জমাট তুষার স্তূপ- বিদ্যাপতির পদ উষ্ণ আবেগ বিগলিতা কলপ্রবাহিণী স্রোতস্বতী। পদটায় ... 'অনুরাগ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষিতব্য। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এক বিশেষ ... প্রেমকে অনুরাগ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া ... যে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ছিল এই ধারণা বিপরীত প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

অভিসার-বিষয়ক পদগুলির সংখ্যা দশটি—২৫৭, ২৭০, ২৭১, ২৯৩, ২৯৬ (৮৬৪), ৩০০, ৩০৪, ৩০৮, ৩২০, ৫৩৫। ইহাদের মধ্যে ২৭১ পদ মিথিলাগীত-সংগ্রহে চন্দ্রনাথ নামক কবির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। শ্লোকটি (২৭০, ২৯৬) ঠিক অভিসার নহে, অভিসারের আলোচনায় সজ্জা পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা বিষয়ে রচিত। ২৯৩ পদে অভিসারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর নায়কের অদর্শনে নায়িকার খেদ বর্ণিত হইয়াছে। ৩০০ নং পদে দিবা অভিসার বর্ণনীয় বস্তু। ৩০৪ ও ৩২০ অভিসারের পরে সম্ভোগ বর্ণনা ও ৫৩৫নং পদে প্রভাতে বিলাসের অযৌক্তিকতা লইয়া নায়ককে অনুযোগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত পদে প্রকৃতপক্ষে অভিসারের পূর্ব বা পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—অভিসারের দুঃসাহসিকতা ও নিবিড় প্রেমাবেশ ইহাদের মধ্যে সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। 'ততমত' (ইতস্ততঃ), 'ফেরা' (ডাক হাঁক) ও 'ডগবকই' (পথে)—ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ পদগুলির মৈথিল পরিবেশের সাক্ষ্য দেয়। অভিসার সম্বন্ধীয় পদে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতির উপর বেশী উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই, কাজেই এগুলির মধ্যে ... ভাণ্ডার সুপ্রকট।

(৪)

অভিসারের পর মান, মান সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন-সংগ্রহে ৩৩৩, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৭৪ ৪০৮, ৪২২, ৪৪৩, ৪৫৩, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০১, ৫২১, ৫২২ ও ৫৪২ এই ১৫টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৩৬৩ উমাপতি কবির 'পারিজাত হরণ' নাটকের দুইটি শ্লোকের ভাবার্থ সংকলন ও একটি পাঠান্তরের ভণিতাতে ইহা তাঁহাকেই আরোপিত হইয়াছে। ৩৬৬ সংখ্যক পদও রুদ্রপতি কবির ভণিতাতে পাওয়া যায়। মান-বিষয়ক কবিতাগুলিতে মান-প্রকরণের সমস্ত প্রকার ভেদই—নায়িকার কখনও মৃদু, কখনও গভীর মর্মবেদনা, সখির শ্লেষোক্তি ও সস্নেহ অনুযোগ, নায়িকার অন্যায় জেদ ও নায়কের অবিশ্বাসিতার প্রতি ভর্ৎসনা, মানভংগ করিয়া মিলনের উপদেশ, অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভাণ্ডার

হইতে শোভন আচরণের রীতি নির্দেশ ইত্যাদি—উদাহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় প্রেমের বোধ ও আশাভংগের অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর শোনা যায়। অধিকাংশই মামুলী আলংকারিক উক্তি ও সাংসারিক জ্ঞানের আদর্শে প্রেমের বিচার করিবার চেষ্টাতেই পূর্ণ।

এই সাংসারিক ভূয়োদর্শনের মানদণ্ডে প্রেমের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতার সমর্থন বিদ্যাপতির উপর রাজসভাপ্রচলিত নৈতিক আদর্শের প্রভাব সূচিত করে। প্রেমকে বাজারের বেচা কেনার সহিত তুলনা করিয়া, ইহাকে লৌকিক সুবিধাবাদের স্তরে নামাইয়া, সাধারণ অসুন্দর প্রতিবেশের সহিত ইহার সংযোগ ঘটাইয়া কবি ইহার আদর্শ সুষমার হানি করিয়াছেন ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইহার সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ, মার্জিত উক্তি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

চিটি-গুড় চুপড়লি বাড়ক পোবি।
লওলে লাথ বেকত ভেল চোবি॥ (৩৩৩)

অর্থাৎ চিটেগুড় মাখা ইতর ব্যক্তির গৃহ—আনীত, অপহৃত, দ্রব্যের আবিষ্কার—চুরি ধরাইয়া দিল।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রেমের যে চৌর-ষড়্‌যন্ত্রের দিকটারই একাধিপত্য, এখানে তাহারই বক্র ইংগিত বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় খেলিয়া গিয়াছে।

৩৭৪ পদে কৃষ্ণের পরনারী-ব্যসনকে কৃপণের হাস্যকর আত্মপীড়নের সহিত তুলনা করিয়া কবি অপরাধের গুরুত্ব অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখিয়াছেন।

কৃপণ পুরুষকে কেও নহি নিক[১] কহ
জগ ভরি কর উপহাস।

মাগি লবয় বিত সে জদি হো নিত।
অপন[২] করব কোন কাজ॥

৪৪৩ পদে প্রেমিকের ইচ্ছাপূরণকে পরহিতব্রতের সহিত তুলনা করিয়া কবি প্রণয়-কলার উপর দানশীলতা ও আত্মোৎসর্গের ছদ্ম গৌরব আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

১। ভাল ২। ধন

মধু নহি দেলহ রহলি কী থাগি।[১]
সে সম্পতি যে পরহিত লাগি!
ভনই বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।[২]
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নহি হোএ॥
অধিক চতুর পনে ভেলহুঁ অয়ানী।[৩]
লাভকে লোভে মূলহু ভেল হানী॥ (৪৫৩)

এখানে অভিমান করিয়া ব্যর্থকামা নায়িকার আত্মগ্লানির মধ্যে হিসাবী ব্যবসায়বুদ্ধির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। হৃদয়াবেগের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকার জন্য এই উক্তিতে গভীরতর ভাবব্যঞ্জনার কোন আভাস মিলে না—ইহা নিছক লাভ-লোকসানের কথায় পর্যবসিত হইয়াছে।

৫০১ ও ৫২২ এই দুইটি পদে সরল, সহজ কথায় অভিমান ব্যক্ত ও সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে পরিচিত দ্রব্যের গুণ বিচারের দ্বারা উচ্চ ও নীচমনা নায়কের পার্থক্য বিশদ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কবিকল্পনার বিস্তার ও আবেগের উচ্চ গ্রাম—উভয়েরই অভাব। মনে হয় যেন বাস্তবজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে দাম্পত্যবিরোধে যে মনোবেদনা উদ্ভূত হয় তাহাই সোজাসুজি, কাব্যোচিত উন্নয়নের (heightening) সাহায্য না লইয়া, এই পদ দুটিতে গুঞ্জরিত হইয়াছে।

এত দিন ছলি[৪] নব রীতি রে।
জল মীন জেহন পিরীতি রে॥
এক হি বচন বীচ ভেল রে।[৫]
হসি পঁহু উতরো ন দেল রে॥
এক হি পলঙ্গ পর কান রে।
মোর লেখ[৬] দূর দেস ভান রে॥
জাহি বন কেও নাহি ডোল রে।[৭]
তাহি বন পিয়া হঁসি বোল রে॥[৮]

১। কি অভাব ছিল? ২। গোপনে ৩। নির্বোধ
৪। ছিল ৫। একটি কথায় আমাদের মধ্যে মতভেদ হইল
৬। আমাদের মনে হইল ৭। চলে না ৮। কথা বলিতেছে

ধরব জোগি-নিয়া কে ভেস রে।
করব মেঁ পঁহুক উদেস রে॥
ভনই বিদ্যাপতি মান রে।
সুপুরুষ ন কব নিদান[1] রে॥ (৫০১)

এক কথায় অভিমান, মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ও ঘোর বনে প্রেমিকের অন্তর্ধান—গানের মধ্যে যেন এক অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বালিকার রূপকথার রাজ্যে বিচরণশীল কল্পনার ছাপ পড়িয়াছে। শিশিরবিন্দুতে সমুদ্রের প্রতিভাতের ন্যায়, ঐশী প্রেমের অপ্রমেয় প্রসার মূঢ় বালিকার এক বিন্দু অশ্রুজলে, এক ঝলক অভিমানোচ্ছ্বাসে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বড় জন জঞো কর পিরীতি রে।
কোপহু ন তেজয় রীতি রে॥
কাক কোইল এক জাতি রে।
ভেম[2] ভমর এক জাতি রে॥
হেম হরদি কত বীচ রে।[3]
গুনহি বুঝিঅ উচ নীচ রে॥
মণি কাদব লপটায় রে।[4]
তঁই কি তনিক গুন জায় রে॥ (৫২২)

এখানেও গার্হস্থ্য জীবনে আহরিত ছোট খাট অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে প্রেমরহস্যকে পরিমাপ করার চেষ্টায় এক করুণ কল্পনাদৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

বাকী কয়েকটি পদে মান কবিকল্পনার দ্বারা উৎসারিত আবেগোচ্ছ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৪০৮ পদে চন্দ্রালোকিত মধুযামিনীতে মানের অনৌচিত্য সম্বন্ধে সখি নায়িকাকে অনুযোগ করিতেছে।

রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
কর এ মধুর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওল[5]
ভুখল তুঅ জজমান॥

১। চরম ক্লেশ

২। ভীমরুল ৩। হেম ও হরিদ্রার মধ্যে, তাহাদের বর্ণের ঐক্য সত্ত্বেও, কত প্রভেদ

৪। মণি কর্দমাক্ত হইলেও ৫। ভোজন করাইল

দীপক-দীপ সম[1] থির ন রহ এ মন
দৃঢ় কর আপন গেয়ান।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুণ
বিদ্যাপতি কবি ভান॥

৪২২ পদটি নায়কের মূঢ় অবহেলায় নায়িকার উচ্ছ্বসিত অন্তর বেদনার চমৎকার অভিব্যক্তি।

চানন ভরম[2] সেবল হাম সজনী
পূরত সব মন কাম।
কণ্টক দরস পরস ভেল সজনী
সীদর[3] ভেল পরিণাম॥
একহি নগর বসু মাধব সজনী
পর ভামিনি বস ভেল।
হম ধনি এহনি কলাবতি সজনী
গুণ গৌরব দূর গেল॥
অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দোনা নীমক ভার॥[4]
সেহো ফুল ওতহি সুখায়ল ছথি[5] সজনী
রসমর ফুলল নেবার॥[6]
বিধিবস আজ আ এল সজনী
এতদিন ওতহি গমায়।[7]
কোন পরি[8] করব সমাগম সজনী
মোর মন নহি পতিয়ায॥

৫৪২ পদে মান ভংগে নায়িকা নিজ ব্যর্থ পরিচর্যা ও উপেক্ষিত আকর্ষণের উল্লেখ করিয়া নায়ককে সস্নেহ গঞ্জনা দিতেছেন।

চীর কপূর পান হমে সাজল
পা অস আও পকমানে।[9]

১। দীপের শিখার ন্যায়   ২। চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে   ৩। শিমূল
৪। নিমপত্রের ঠোংগায় নিক্ষেপ করিয়াছে   ৫। শুকাইয়া আছে
৬। তৃণকুসুম—রূপগুণহীনা পররমণী—প্রস্ফুটিত হইল   ৭। কাটাইয়া
৮। কেমন করিয়া   ৯। পায়স রন্ধন করিলাম

সগর রয়নি হমে জাগি গমাওল
খণ্ডিত ভেল মোর মানে ॥
তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত[১]
মহিমা ভাব গভীরে ।[২]
কুটিল কটাক্ষ মন্দ হসি হেরহ
ভিতরহু শ্যাম শরীরে ॥[৩]

মান বিষয়ক কবিতাতে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিয়াছেন মনে হয়। তীক্ষ্ণ মাৰ্জিত শ্লেষ ও সোহাগের ব্যঞ্জনায় তাঁহারা আরও সিদ্ধহস্ত। তবে বিদ্যাপতি মান কবিতার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্তীরা, কিঞ্চিৎ চতুরতর বাক্‌ভংগী ও সময় সময় উদ্ভট ঘটনা-সন্নিবেশের সহিত, তাহারই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে 'জেমাওল' (ভোজন করাইল, ৪০৮), 'বধাব' (উৎসব, ৪২২), 'অয়ানী' (নির্বোধ, ৪৫৩), 'সতালে' (গভীব, ৪৮৭) 'থপলাথিত' (বিশ্বাসযোগ্য, ৫৪২) প্রভৃতি কয়েকটী মৈথিল শব্দ অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

(৫)

প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিরহ। বিরহই ইহার চরম পরিণতি, ইহার মাধুর্য ও হৃদয়াবেগেব ঘনীভূত সার-নির্যাস। বিরহে মন সাধারণতঃ আত্মবিসর্জন ও আদর্শবাদের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণশীল হয়। বিরহের অশ্রুপ্লাবনে প্রেমের ভোগলিপ্সা ও স্থূল বস্তুতন্ত্রতা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া পূর্বালোচনা ও স্মৃতিরোমন্থনের অর্ধ-ভাস্বর বায়ুমণ্ডলে ইহার বিশুদ্ধ ভাবরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কাজেই সর্বদেশে ও সর্বকালে বিরহবর্ণনাতেই প্রেম-কবিতার চরম উৎকর্ষ—এ বিষয়ে জড়বাদী পাশ্চাত্য ও অধ্যাত্মবাদী প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় কবিও—যিনি পূর্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি প্রণয়োন্মেষের সূক্ষ্মতর, মনোজ্ঞতর কারণগুলিকে অস্বীকার করিয়া কেবল অনুসরণের অধ্যবসায় হইতেই ইহার উদ্ভব নির্দেশ করিয়াছেন—বিরহ পর্যালোচনা-প্রসংগে এক অভিনব আদর্শবাদের সন্ধান পাইয়াছেন ; নায়িকার বিরহ ব্যাকুলতা তাঁহাকে এক অপ্রত্যাশিত অধ্যাত্মভাব-রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে।

১। বিশ্বাসযোগ্য ২। অতি দুর্বোধ্য ৩। বাহিরের মত ভিতরেও শ্যামল

বিদ্যাপতি প্রধানতঃ রূপসম্ভোগের কবি হইলেও বিরহ কবিতায় তিনি পরবর্তী বৈষ্ণব পদকারদের ন্যায় আধ্যাত্মিক ভাব-বিশুদ্ধির স্তরে পৌছিয়াছেন। বিরহে দুইটি স্তরের পার্থক্য করা যায়। প্রথম, অল্পক্ষণের অদর্শনে যে ব্যাকুলতা তাহা মূলতঃ সম্ভোগলিপ্সারই তীব্রতর সংস্করণ। হয়ত ইহার মধ্যে উচ্চতর আত্ম-বিস্মৃতির বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মোটামুটি এই স্বল্প-বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণুতা মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা অলংকার-শাস্ত্রেরই অধিক অনুগামী। ইহার মধ্যে যতটুকু সত্যকার আবেগ থাকে তাহা আলংকারিকের অতিরঞ্জনে স্ফীতকলেবর হয়। যে সামান্য অস্বস্তি হৃদয়কন্দরে প্রধূমিত হয় তাহা সৌন্দর্যসৃষ্টির কৃত্রিম প্রয়াসের ফুৎকারে উজ্জ্বল বহ্নিশিখায় পরিণতি লাভ করে। অলংকারশাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিরহের দশ দশা এই কৃত্রিম ব্যবস্থারই সাক্ষ্য দেয়। এই দশ দশার বর্ণনাকালে লেখক কোন বিশেষ দশাকে কেবল তথ্য হিসাবে উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বা পাঠকের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় স্তর হইতেছে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী মাথুর বিরহ, যাহাতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নায়িকার আশা নিঃশেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রেম অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাহার উজ্জ্বলতম কান্তি ধারণ করে। গভীর নৈরাশ্যবোধ ও আত্মনির্বেদের অন্ধতম স্তর হইতে প্রেমের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, প্রেমিকের দোষক্ষালন ও তাহার মহনীয়তার নূতন অনুভূতি, পার্থিব অন্তরায়কে তুচ্ছ করিয়া ভাবসম্মিলনের উর্ধ্বমুখী অভীপ্সা প্রভৃতি অন্তরের উচ্চতম বৃত্তিসমূহ, নিশীথিনীর গর্ভ হইতে কনকখচিত উষার ন্যায়, স্ফুরিত হইয়া উঠে। বিরহ-ব্যবধানের বাষ্পরাশির অন্তরাল হইতে প্রেমিক দেবতার রূপে উদ্ভাসিত হয়—প্রেমিক-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঈশ্বরারাধনার পর্যায়ে উপনীত হয়।

বিদ্যাপতির পদে প্রথম স্তর অপেক্ষা দ্বিতীয় স্তরের প্রাধান্য। উজ্জ্বলনীল-মণিতে বিরহের দশ দশা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বেই বিদ্যাপতি বিরহ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার রচনায় কৃত্রিম স্তরনির্দেশের সেরূপ চিহ্ন নাই। বিরহ-বিষয়ক ষোলটি পদের মধ্যে (৬২৬, ৬৫৯, ৬৬৬, ৬৮১, ৬৮৮, ৬৯০, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৭০২, ৭০৫, ৭২৩, ৭৩৩, ৭৪৩, ৭৫৪ ও ৭৬৫) ৬৮১ পদটি ধৈর্যাপতি কবির ভণিতায় পাওয়া যায়; আর দুইটি মাত্র (৭০৫ ও ৭৫৪) ক্ষণিক অদর্শনজাত বিরহের বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। ৭৪৪ পদ বিরহবেদনার সরল, কারুকার্যহীন অভিব্যক্তি। ৭৫৫ পদে নায়িকার

মূর্ছাপনোদন জন্য সখীদের পরিচর্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বিরহক্লেশের আলংকারিক অতি-প্রসারের পূর্বাভাস মিলে।

কেও সখী তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে॥
কেও বোল আএল হরি।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী॥

বাকী সমস্ত পদেই সুচিরব্যাপী মিলনের আশাবর্জিত বিরহবেদনার বর্ণনা। এই বিরহবর্ণনা প্রসংগে অনেক স্বার্থলেশহীন, উদার, প্রেমনিবেদনের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—এই বিষয়ে বিদ্যাপতির সহিত চৈতন্যোত্তর কবিদের বিশেষ পার্থক্য নাই।

হীরা মণি মাণিক একো নহি মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা।
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখহু জন ভেল পহু ওরা॥ (৬২৬)

অর্থাৎ আমার দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ ছিল বলিয়া প্রভু যে নয়নপথের বাহিরে গেলেন তাহা আমি নিজে অনুভব করিলাম না, অন্য দর্শকের পরোক্ষ সাক্ষ্যে বুঝিলাম।

কহও পিশুন[১] সত অবগুণ[২] সজনি
তনি সম মোহি নহি আন।[৩]
কতেক জতন সোঁ মেটিএ সজনী
মেটএ ন রেখ পসান॥
জতও তরণি[৪] জল সোখএ সজনী
কমল ন তেজয়ে পাক।
জে জন রতল থাহি সো সজনী
কি করত বিহি ভএ বাঁক॥ (৬৮৮)

প্রতিকূল দৈবের প্রতি স্পর্ধিত উপেক্ষা ও প্রেমিকের প্রতি অটুট বিশ্বাস এই ছত্রগুলিতে মর্মস্পর্শী তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

১। মিথ্যারটনাকারী শঠ ২। নায়কের
৩। তাঁহার সমান আমার কেহ নাই ৪। সূর্য

জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস।
হমর অভাগ, হুনক[১] নহি দোস॥ (৬৯০)
ওতহু রহথু গএ ফেরি[২]।
হে সখি, দরশন দেউ এক বেরি॥ (৬৯৩)
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
হরিক চরণ করু সেবা।
পরল অনাইত[৩] তেঁ ছথি অন্তর[৪]
বালমু[৫] দোস ন দেবা॥ (৭২৩)

এই সমস্ত উক্তিতে নিরভিমান, অনুযোগহীন সহিষ্ণুতা, নিজের কর্মফলের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া নায়কের দোষক্ষালন-চেষ্টার ভিতর দিয়া আত্মবিলোপী প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরাও, তাঁহাদের ধর্মসাধনা ও মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও, ইহা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেম, কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মুদ্রাংকিত হউক বা না হউক, একই ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে।

৬৯৩ ও ৭৩৩ পদে বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবাস, কুব্জার সহিত প্রেম ও উদ্ধব মারফৎ নায়িকার সংকটাপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে নায়ককে সন্দেশ-প্রেরণ প্রভৃতি প্রসংগ ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছেন। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা এই বিষয়-গুলিকে ভাবপ্রবণতা ও অতি-পল্লবিত বিস্তারের চরম সীমা পর্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। কুব্জার সহিত রাধিকার তুলনা ও উভয়ের অসম প্রণয় প্রতিযোগিতা লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পদাবলীরচয়িতারা মাতামাতি করিয়াছেন—বিষয়টির শেষ রসবিন্দু পর্যন্ত নিঙ্ড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। উদ্ধব-দৌত্য ও তাহার অনুকরণে হংস, কোকিল, ভ্রমর-দৌত্য পর্যন্ত কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া একই বিষয়ের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে। মনে হয় যে, পদাবলী সাহিত্যের শেষের দিকে অনুভূতির গাঢ়তা যত কমিয়াছে, কল্পনা-চাতুর্যের উদ্ভট-খেয়াল ও অসংযত বাহুল্য ততই প্রসার লাভ করিয়াছে। এই অপরিমিত কল্পনাবিলাসের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির রচনায় কি সরল,

১। উঁহার ২। ফিরিয়া ঐখানেই গিয়া থাকুক ৩। পরাধীন
৪। সেইজন্য দূরে আছে ৫। বল্লভের, প্রিয়ের

মর্মস্পর্শী মিতভাষিতা! বিদ্যাপতির পদে ব্রজধাম ও মথুরা লইয়া কোন উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নাই—প্রেমের নিজস্ব গভীরতার সহিত স্থানমাহাত্ম্যের ভাবসংগ (association) সংযুক্ত হয় নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, বিদ্যাপতির সময় বৃন্দাবন ও মথুরা চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরগণের স্মৃতি-সুরভিত হইয়া মহাতীর্থমহিমা অর্জন করে নাই—ইঁহাদের কালের বিস্মৃতিস্পর্শে মলিন, পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আবার নূতন করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই।

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জাএব তনি পাস॥
রখলন্হি কুবজা সোঁ নেহ।
হে সখি, তেজলি হমরো সিনেহ॥ (৬৯১)

এখানে কবি মধুপুর ও কুব্জার সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

৭৩৩ পদে অপেক্ষাকৃত লঘু সুরে উদ্ধবের নিকট নায়িকার বিরহজনিত দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে ও ৭৪৩ পদে কবি ভণিতায় বিরহ-খিন্ন নায়িকাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার জন্য কৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাবর্তন কল্পনা করিয়া ভাব-সম্মিলনের বীজ বপন করিয়াছেন। শেষোক্ত পদে মোদবতীপতির নাম রাঘব সিংহ উল্লিখিত হইয়াছে; ৬৮৮ পদে কিন্তু রাজা শিবসিংহ মোদবতী-কান্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৬৮৮ পদের ভণিতা সংশোধন করিয়া এই অসামঞ্জস্য দূর করা প্রয়োজন—কেননা, অন্য কোথাও শিবসিংহকে মোদবতী-পতি আখ্যা দেওয়া হয় নাই। ৬৬৬ ও ৭০৫ এই দুই পদে ভণিতায় জয়রাম নামে কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির উল্লেখ কৌতূহলের উদ্রেক করে। বিরহবিষয়ক পদগুলিতে মোটের উপর দুর্বোধ্য শব্দের বাহুল্য নাই—'হরাস'[১] (৬৯৫), 'জীঅমার'[২] (৭০৫) ও 'কুম্ভিলায়ল'[৩] (৭৪৩ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

৭৬৫ পদে কৃত্রিম কল্পনা-বিলাসের প্রাধান্য থাকিলেও ইহার পরিকল্পনা অতি সুকুমার সৌন্দর্যজ্ঞানের নিদর্শন। রাধা বিরহের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় যাহার যাহার নিকট নিজ অতুলনীয় সৌন্দর্যের উপাদানগুলি লাভ করিয়াছিলেন সেইগুলি প্রত্যেককে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। এই পদটি 'কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে' শীর্ষক সুবিখ্যাত পদের (১২১) ঠিক বিপরীত অবস্থা বর্ণনা করিতেছে।

১। শীর্ণ ২। প্রাণবধের হেতু
৩। শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান ও প্রিয়ারমণের মতে প্রস্ফুটিত

মাধব, জানল ন জিবতি রাহী।
জতবা জকর লেলে ছলি (past perfect from) সুন্দরী
সে সবে সোপলক তাহী॥
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিণকে লোচন লীলা।
কেস পাস লএ চমরিকে সোপল
পাএ মনোভব পীলা॥[১]

তিনটি পদ—৭৯৫, ৭৯৮ ও ৮১২, ভাবোল্লাসের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের স্থান মাথুর-বিরহের পরে, কি ক্ষণিক বিরহের অবসরে, অথবা এই মিলন, স্বপ্ন কি জাগ্রত অবস্থায় তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে। ইহাদিগকে মাথুর বিরহের পরে সন্নিবিষ্ট করিলে ইহাদের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি আরও মর্মভেদী হইয়া উঠে। ৭৯৮ পদে যে স্বপ্নানুভূতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা রসোদ্গারের পর্যায়ে পড়িতে পারে। 'পেমক আঁকুরে পল্লব দেল' পংক্তিটি প্রেমের অপরিণত, প্রথম মিলনের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থাই সূচিত করে। ৮১২ পদে স্বপ্নের কোন উল্লেখ নাই—'বসি নহি রহল গেয়ান' (জ্ঞান আমার বশে রহিল না) পংক্তিটি জাগ্রত অবস্থার বাস্তব মিলনে, নিবিড় প্রেমাবশে নায়িকার ক্ষণিক বাহ্যজ্ঞানহীনতার নির্দেশক। এই মিলন স্বপ্নকালীন হইলে উদ্ধৃত পংক্তির বিশেষ কোন সার্থকতা থাকিত না। ৭৯৫ পদটি রূপবর্ণনার সংযমে ও সমগ্র-পদব্যাপী একটি শান্ত বিষণ্ণ সুরে মনকে গভীর বেদনায় উদাস করিয়া তোলে। যে নায়ক প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে উপমার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া নিজ রূপমুগ্ধ অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিত, স্তুতি-প্রশংসার প্লাবনে সমস্ত পরিমিতিবোধকে ভাসাইয়া দিত, সেই নায়ক মোহভংগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, সুচিরব্যাপী নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের পর স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া দুই একটি মাত্র উপমায় নায়িকার বিরহম্লান সৌন্দর্যের প্রতি রিক্ত-সম্ভার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাহার মনকে কি এক শংকা-ব্যাকুল, নিবিড় তৃপ্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। রাজভোগে অভ্যস্ত রুচি কি করুণ লোলুপতার সহিত এই দুর্ভিক্ষ কণিকাটিকে আস্বাদন করিয়াছে।

১। পীড়া

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দহিন পবন বহু ধীরে।
সপনহু রূপ[1] বচন এক ভাখিএ
মুখ সোঁ দূরি করু চীরে॥
তোহর বদন সম চান[2] হোঅথি নহি
জই ও যতন বিহি দেলা।[3]
কএ বেরি কাটি বনাওল সব কয়[4]
তইও তুলিত নহি ভেলা॥[5]
লোচন তুল কমল নহি ভএ সক
সে জগ কে নহি জানে।
সে ফেরি জাএ লুকাএল জল ভএ
পঙ্কজ নিজ অপমানে॥ ২

মুখের সহিত চন্দ্র ও চক্ষুর সহিত পদ্মের উপমা নায়িকার রূপবর্ণনায় অতি সাধারণ মামুলি ব্যাপার। কিন্তু অন্য অন্য সময় এই উপমাগুলির ভিতর দিয়া যে সরস, বেগবান্ উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয় এখন তাহার পরিবর্তে এক ম্লান, স্তিমিত মন্থরতা, এক শীর্ণগতি, সংকোচ-শ্লথ, মিতভাষিতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(৬)

গ্রীয়ারসনের পদগুলি হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করা প্রয়োজন।

(১) প্রথমতঃ ভাষার দিক্ হইতে দুর্বোধ্য, অপরিচিত শব্দের আপেক্ষিক বাহুল্য প্রমাণ করে যে, এগুলি পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয় নাই। মৈথিলীর কতকগুলি বৈয়াকরণিক রূপ বৈশিষ্ট্যও এইগুলির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। তথাপি ইহাদের ভাষার প্রকৃতি বিদ্যাপতির অন্যান্য পদেরভাষা হইতে মূলতঃ অভিন্ন। ইহাদের ভাষাকেই যদি খাঁটি মৈথিলের নিদর্শন বলিয়া ধরা যায়, তবে মৈথিলের সংগে ব্রজবুলির পার্থক্য, ক্রিয়াপদের

১। মূর্তি ২। চাঁদ ৩। বিবিধ যথাসাধ্য যত্ন সত্ত্বেও
৪। প্রতি তিথিতে চন্দ্রকে কাটিয়া ৫। তথাপি তোমার তুল্য হইল না

কয়েকটি বিশিষ্ট বিভক্তি ও ব্যবহার ছাড়া, বিশেষ কিছু থাকে না ; হয়ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে নকল-কারকদের যুগোচিত ক্রমিক পরিবর্তনের ফলেই পদগুলিকে—কয়েকটি অপরিবর্তিত প্রাচীন শব্দ বাদ দিলে—অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষারূপেই পাওয়া যায়।

(২) নায়িকার রূপবর্ণনা ও নায়ক-নায়িকার প্রণয়োন্মেষ-চিত্রণে সাধারণতঃ প্রথানুগত্যেরই প্রাধান্য, খুব গভীর সুর শোনা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রণয়াবেশ ও নায়কের রূপবর্ণনায় চৈতন্যোত্তর কবিদেরই শ্রেষ্ঠত্ব। মহাপ্রভুর অপরূপ লাবণ্যের প্রত্যক্ষ দর্শন ও উজ্জ্বল স্মৃতি পরবর্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে।

(৩) প্রথম মিলনে নায়িকার অপরিণত যৌবন ও সুরতক্রিয়ায় অনিচ্ছার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। মনে হয় যেন বড়ু চণ্ডীদাসের ইতর ভীতি-প্রদর্শন ও অনাবৃত যৌন প্রেরণার উপর নির্ভরশীল প্রণয়-জ্ঞাপন এখনও তাহার বর্বর রূঢ়তার শেষ চিহ্নটুকু হারায় নাই। পরবর্তী যুগের মুরলীধ্বনি-বিবশা, শ্যামনাম জপে তন্ময়া নায়িকার পরিকল্পনা এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বড়ু চণ্ডীদাসকে নৌকাখণ্ডের অপরিকল্পনার মূল উৎস বলিয়া ধরিলে বিদ্যাপতি যে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত পরবর্তী কবি—তাহা স্বীকার করিতে হয় ও বৈষ্ণব-কবিতার কালক্রম-শৃংখলায় উভয়ের পৌর্বাপর্য স্থির করিবার কতকটা উপাদান মিলে।

(৪) অভিসারের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, ইহার সাধনামার্গের দুরূহতা ও প্রেমের সর্বজয়ী প্রেরণা বিদ্যাপতির পদে পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তাঁহার পরবর্তীরা নূতন কিছু করেন নাই মনে হয়।

(৫) মানবিষয়ক পদে হৃদয়াবেগের তীব্রতা ও মর্মভেদী শ্লেষের প্রবর্তনে পরবর্তী পদাবলীসাহিত্য বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যের কবিতা সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। প্রণয়-পরিণতির উচ্চতম স্তর হিসাবে প্রেমবৈচিত্ত্যের উপলব্ধি চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞানহীন, নিবিড় ভাবাবেশের প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। বিদ্যাপতির এই অভিজ্ঞতার অভাব ছিল ; সুতরাং তিনি সাধারণভাবে দুই একটি পদে প্রেমের মধুর আত্মবিস্মৃতির ইংগিত দিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন উচ্চতর ব্যঞ্জনা আরোপ করেন নাই। পরবর্তী যুগের অলংকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বিদ্যাপতির পদে প্রয়োগ করা সমীচীন কি না—তাহাও সন্দেহের বিষয়।

(৬) প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরহের **উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক** —কোন বিশেষ দার্শনিক সংস্কৃতির সাহায্য ছাড়াও কবি এই বিষয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে আরোহণ করিতে পারেন। বিদ্যাপতির বিরহবর্ণনায় কিছু প্রথানুগত্য আছে, কেন না, বিরহ কাব্যের সনাতন বিষয় এবং ইহার আলোচনা-রীতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহার উপর বৈষ্ণব ভাবধারা কতকাংশে নূতন প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে, কতকাংশে গভীর ভাবাকুলতা সঞ্চারিত করিয়াছে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদের প্রবর্তিত প্রথা (tradition) অনুসরণ করেন নাই, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবাকুলতা, ইহার ঘনীভূত রসমাধুর্য ও উদার চিত্তশুদ্ধি, তাঁহার পদে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। এমন কি, যে ভাবসম্মিলন রসবোধের অনিবার্য প্রয়োজনে ইতিহাসের আকস্মিকতার সংশোধন, যাহা ঘটা উচিত ছিল তাহার মানদণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে অস্বীকার,—remodelling history nearer to the heart's desire—তাহাও বিদ্যাপতির কল্পনায় ধৃত ও রূপায়িত হইয়াছে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে একটি পূর্ণাংগ নাটকের অনবদ্য গঠন-সুষমা দিয়াছেন, বাস্তব তথ্যকে লংঘন করিয়া ইহাকে অবশ্যম্ভাবী রস-পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিকের চিরবিচ্ছেদের রায় উল্টাইয়া ভক্ত ও কলাবিদের অধিকারে আদর্শ প্রেমিকযুগলের পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি অঘটন-ঘটন-পটুতা ভক্তির মানদণ্ড হয়, যদি উপাস্য দেবতার হাতের অসি খসাইয়া তৎপরিবর্তে বাঁশী দেওয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

(১)

গত আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় চণ্ডীদাসের একটি নবাবিষ্কৃত পুঁথির প্রাথমিক পরিচয় দিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এই পুঁথির একটি নকল প্রায় দুই মাসাবধি আমার নিকট আছে। ইহা মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে এই পুঁথিটি চণ্ডীদাস-সমস্যা আলোচনার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সম্পাদিত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। বস্তুতঃ মণীন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার যে ২৩৮৯ ও ২৯৪ সংখ্যক দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বনে উক্ত পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছেন, আলোচ্য পুঁথিটি তাহার একটি পূর্ণতর আদর্শ বা অনুলিপি। 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'তে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আখ্যায়িকায় যে ছেদ পড়িয়াছে তাহার অনেক অংশ এই পুঁথি হইতে পূরণ করা যায়। আখ্যায়িকা-বিন্যাস ও পদগুলির ক্রম-নিরূপণের পক্ষেও ইহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলিত হইতে পারে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ-ধৃত অনেক দুর্বোধ্য ও বিকৃত পাঠ ইহার সাহায্যে আশ্চর্যভাবে সংশোধিত ও স্পষ্টীকৃত হয়। আখ্যায়িকার ফাঁক পুরাইবার জন্য তিনি যে চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে পদ উদ্ধারপূর্বক একটা আনুমাণিক পুনর্গঠন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান পুঁথি হইতে তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় প্রকারেরই প্রমাণ মিলিবে। মোটকথা দীন চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও কাব্যপরিকল্পনার উপর এই পুঁথিটি যথেষ্ট নূতন আলোকপাত করিবে ও এই কবি পদাবলী চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন কি স্বতন্ত্র এই জটিল সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহা যে আরও প্রচুর উপাদান যোগাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেইজন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইলেও যাহাতে যোগ্যতর ও অভিজ্ঞতর পণ্ডিত-মণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় সেইজন্যই এই পুঁথিখানির বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছি। আশা করি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিশেষজ্ঞগণ আমার এ দুঃসাহস ক্ষমা করিবেন।

পুঁথিটির আবিষ্কার-সূত্র সম্বন্ধেও সাহিত্যরত্ন মহাশয় কিছু পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার হস্তলিপি আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বের বলিয়া মনে হয়—তবে ইহা যে কোন প্রাচীনতর পুস্তকের অনুলিপি তাঁহার প্রমাণ লিপিকারই গ্রন্থমধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে খণ্ডিত কোন একটি প্রাচীন পুঁথি হইতে ইহা নকল করা হইয়াছে ও যে যে স্থানে যে কয়পাতা হারাইয়াছে গ্রন্থমধ্যে তাহা স্পষ্ট-ভাবে উল্লিখিত আছে।

এইবার পুঁথিটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের কিছু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গ্রন্থারম্ভে দুইটি রসতত্ত্ব ঘটিত পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা রসের শাখা, ললিতা শাখার অন্যতম মুখ্য (মোক্ষ !) ডাল ও এই ডালের অধীন সপ্ত মঞ্জরী। এক এক মঞ্জরী এক এক রসের অধিষ্ঠাত্রী। ইঁহারা প্রেম উদ্দীপনের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই পদদ্বয় ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হয় নাই। সুতরাং আখ্যায়িকার বর্তমান স্তরে তাহাদের সন্নিবেশের কারণ দুর্বোধ্য।

ইহার পরই অকস্মাৎ ৩১০ সংখ্যক পদের শেষার্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই পদটি অক্রূর আগমনের অব্যবহিত পূর্বে রাধার অমংগল স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফলাফল জানিবার জন্য গণকের নিকট গমন বিষয়ক। ইহা মণীন্দ্রবাবুর পদাবলীর ২০৯ সংখ্যক পদের সহিত অভিন্ন। ইহার পর মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট পদাবলীর ক্রম অনুসরণ পূর্বক ২৩২ সংখ্যক পদ পযন্ত উভয় গ্রন্থই একেবারে এক। মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থের ২৩৩ সংখ্যক পদটি পুঁথিতে নাই—সুতরাং ইহা আখ্যায়িকার ক্রম-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। আবার ২৩৪ হইতে ২৪৩এর পঞ্চম পংক্তি পযন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ও আলোচ্য পুঁথি পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এখন হইতে ২৫৮নং পদের ২০ পংক্তি পর্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত। আবার ২৫৯ হইতে ২৯২ পর্যন্ত পুঁথি ও সংস্করণে হুবহু মিল পাওয়া যায়। ২৯৩ পদটি বর্ধিত আকারে পুঁথিতে মিলে ও ইহা সেখানে ৩৯৩ ও ৩৯৪ এই দুই পদে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ২৯৪ পদ পুঁথিতে ৩৯৫ ক্রমিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইয়াছে। ২৯৪ হইতে ৩০০ পর্যন্ত পদ সন্নিবেশে উভয়ই এক ; মণীন্দ্রবাবুর ব্রজবুলিতে লিখিত ৩০১নং পদ পুঁথিতে নাই। ৩০২ হইতে ৩৩৮ পর্যন্ত আবার মিল। ৩৩৯ হইতে ৩৫৪ পর্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত ; ৩৬১ সংখ্যক পদের সপ্তম পংক্তি হইতে ইহার পুনরারম্ভ, কিন্তু ৩৬১ পদ পুঁথিতে

৪৫৫ ক্রমিক নম্বরে চিহ্নিত হইয়াছে। এই সংখ্যা-বৈষম্য হইতে অনুমিত হয় যে শ্রীরাধার মাথুর বিরহান্তর্গত ৩৫১ হইতে ৩৬০ পর্যন্ত আক্ষেপানুরাগের পদের মধ্যে কয়েকটি ক্রম বহির্ভূতভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আবার ৩৬২ ও ৩৬৩ পদের মধ্যে, পুঁথিতে আর একটি নূতন পদ সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ৩৬৭ পর্যন্ত উভয় গ্রন্থের পদবিন্যাস একই রূপ—মণীন্দ্রবাবুর ৩৬৭ সংখ্যক পদ পুঁথিতে ৪৬২ সংখ্যায় চিহ্নিত। ৩৬৮ হইতে ৩৭৫ পর্যন্ত আক্ষেপানুরাগের পদগুলি পুঁথিতে নাই—মণীন্দ্রবাবু এগুলিকে যে যদৃচ্ছাক্রমে চয়ন করিয়া বিষয়-সাম্যের অনুরোধে আখ্যায়িকার অংগীভূত করিয়াছেন তাহা পদগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। ইহাদের মধ্যে দুইটি ব্যংগাত্মক পদ "ধিক ধিক ধিক তোরে রে কালিয়া" ও "ধিক ধিক ধিক নিঠুর কালিয়া" (৩৭৪ ও ৩৭৫) ধনঞ্জয়ের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে ও ইহারা সুর ও ভাব-ধারার প্রমাণে চণ্ডীদাস রচিত নহে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। মণীন্দ্রবাবুর ৩৭৬ হইতে ৩৮৬ সংখ্যক পদ পুঁথিতে ৪৬৩ হইতে ৪৭৪ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা চিহ্নিত হইয়াছে ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যাকুল ভাবব্যঞ্জক একটি নূতন পদ (৪৭১) এই প্রতিবেশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৩৮৭-৪২১ নং অনুমান সন্নিবেশিত পদগুলির পরিবর্তে পুঁথিতে ৪৭৫ হইতে ৪৭৯ পাঁচটি নূতন পদ পাওয়া যায়—এগুলি শ্রীরাধিকার খেদোক্তি, কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর নির্বাচিত পদগুলি অপেক্ষা আখ্যায়িকার সহিত নিবিড়তর সম্পর্কান্বিত ও ইহার সহিত আরও স্বাভাবিকভাবে গ্রথিত। মোট কথা মাঝে মধ্যে পদ-সংস্থাপন-বৈষম্য ও পুঁথি খণ্ডিত থাকার জন্য কয়েকটি পদের অপ্রাপ্তি বাদ দিলে মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের ২০৯-৪২১ পদ আলোচ্য পুঁথিতে ৩১০—৪৭৯ সংখ্যক পদে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এই পদাবলীর মধ্যে আখ্যায়িকা অক্রূরাগমন হইতে কৃষ্ণের মথুরা-প্রবাসের জন্য রাধার বিরহ শোকাভিব্যক্তি পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা পুঁথিতে পদবিন্যাস রীতি যে অধিকতর প্রামাণিক তাহা পরবর্তী আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পদ ৪৮০ ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত—পুঁথিতেও ঐ পদটি ৪৮০নং। এই ক্রমিক সংখ্যার আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করে যে উভয় পুঁথিই এক আদর্শের অনুলিপি ও আখ্যায়িকাধারা উভয়ত্রই এক রীতিতে বিন্যস্ত। আলোচ্য পুঁথিটি ৪৯৯ পদের প্রারম্ভে খণ্ডিত ও ৫১৭ পদ হইতে আখ্যান আবার চলিয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ ৫৪৬ পদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—কিন্তু এই পুঁথিতে আরও পাঁচটি নূতন পদ সংগৃহীত হইয়া ৫৫১ সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ৬২৭ পদের শেষাংশ হইতে ৬৭২এর প্রথমাংশ পর্যন্ত ও পুনরায় ৭২২এর শেষাংশ হইতে ৭২৬ প্রারম্ভ পর্যন্ত ধৃত হইয়াছে। ইহার পর সুদীর্ঘ ব্যবচ্ছেদের পর আবার ১০৪৫ সংখ্যক পদে আখ্যান পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ ফাঁকের অনেকাংশ বনপাশ পুঁথি হইতে পুরণ করা যায়—৭৩২-৯৬২ ও ৯৮১-১০১৭ সংখ্যক পদগুলি সৌভাগ্যক্রমে ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকায় মাথুর বিরহের পর দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে আমরা অনেকটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। ইহার পর মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৪৫-১০৫১ এই সাতটি পদ মিলে। পুঁথিতে আবাব ১০৮৬ পদ হইতে ঘটনা বিবৃতির পুনরারম্ভ ১২০২ পদে শেষ। ইহার মধ্যে মুদ্রিত 'পদাবলীর' ১০৭৭ হইতে ১০৮৪ পদ পুঁথিতে ১০৯২-১০৯৭ ও ১০৯৯-১১০০ সংখ্যা চিহ্নিত। বনপাশ পুঁথির ১২০২ পদে পরিসমাপ্তি। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আবার ১৮৬১-১৮৬৫, ১৯০৩-১৯০৭ ও ১৯৯৯-২০০২ পর্যন্ত ১৪টি পদ পূর্বরাগ ও রাধার আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে রচিত হইয়া দীন চণ্ডীদাস পরিকল্পিত আখ্যায়িকার পরিচয় সম্পূর্ণ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শেষ কয়েকটি পদে আখ্যায়িকা-স্রোত বিপরীতমুখী হইয়া উৎপত্তি স্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

(২)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই নবাবিষ্কৃত বনপাশ পুঁথিতে মোটামুটি ৭৩২-৯৬২, ৯৮১-১০১৭ ও ১০৮৬-১২০২, (— ৮) সর্বশুদ্ধ ২৩১+৩৭+১০৯= ৩৭৭টি নূতন পদের সন্ধান মিলিতেছে ও এই সমস্ত পদে আখ্যায়িকার মধ্যস্তরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে। ৫১৭ পদে উদ্ধবের দৌত্য নিয়োজনের কাহিনী আরম্ভ ও ৫৫১ পদে রাধার সন্দেশ বহন করিয়া তাহার প্রত্যাবর্তন সূচিত হইয়াছে। ৫৪৭—৫৫১ পদগুলিতে রাধা কৃষ্ণের প্রতি অগাধ প্রেম ও তাহার বিরহে অসহ্য জ্বালার কথা নিবেদন করিয়া প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প জানাইতেছেন ও মৃত্যুর পর পুরুষজন্ম লাভ করিয়া প্রেমাস্পদকে অনুরূপ বিরহবেদনা অনুভব করাইবেন এইরূপ অনুযোগ করিতেছেন। ইহার পর মুদ্রিত সংস্করণে ৬২৭—৬৩৪ পদে কৃষ্ণের হংসদূত

প্রেরণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আবার ৬৬২—৬৭২ পদে রাধার কোকিল-দূত প্রেরণ, পূর্বস্মৃতি উদ্দীপনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুল-উন্মনা ভাব ও বলরামের নিকট কৃষ্ণের আত্মগোপন চেষ্টার বর্ণনা মিলে। ৭৭২—৭৭৬ পদে সুবলের মথুরাগমন ও কৃষ্ণের সহিত মিলন, পূর্বকথা আলোচনায় উভয়ের তন্ময়তা ও বলরামের অতর্কিত আগমনে রসভংগের বিবরণ। বনপাশ পুঁথিতে ৭৩২ পদে সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্তন উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৩৩ হইতে ৭৪৪ পর্যন্ত আবার রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদের কবিত্ব প্রশংসনীয় ও চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর সহিত উপমিত হইবার অযোগ্য নহে। ৭৪৫ নং পদে এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা হইয়াছে। বিরহবেদনায় আকুল কৃষ্ণ মথুরায় বংশীবাদন আরম্ভ করিয়াছেন। সেই বংশীধ্বনি বৃন্দাবনে শ্রুত হইয়া গোপীগণের মনে প্রেমাস্পদের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন বিষয়ক ভ্রান্তি জন্মাইতেছে। ৭৫১—৭৫৪ পদে পবনদূত প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছে ও ৭৫৫—৭৭০ পদে পবনের মথুরা-গমন ও কৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ এবং ৭৭১—৭৭২ পদে কৃষ্ণের তদুত্তরে উচ্ছ্বসিত-প্রেম-নিবেদন বর্ণিত হইয়াছে। ৭৭৩—৭৭৪ পদে আবার বলরাম আবির্ভূত হইয়া এই রহস্যালাপে বাধা জন্মাইয়াছে ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নির্জনাবস্থানের কৈফিয়ৎস্বরূপ এক দ্ব্যর্থপূর্ণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যশোদামাতার প্রদত্ত তাঁহার 'হিয়ার পদক' হারাইয়াছে ও তাহারই অনুসন্ধানে তিনি নির্জন বনপথে ভ্রমণ করিতেছেন। ৭৭৫ পদে এই স্তোকবাক্যে বলরামকে ভুলাইয়া কৃষ্ণ আবার পবনের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন ও শীঘ্রই রাধার সহিত মিলিত হইবেন এই আশ্বাসবাণীর সহিত তাহাকে প্রতিপ্রেরণ করিয়াছেন।

৭৭৬ পদে পবন রাধার নিকট ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুপম ও অপরিবর্তনীয় প্রেমের বিস্তৃত বিবরণ পেশ করিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় বাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অনু-পরমাণু বৃন্দাবন-লীলার স্মৃতি-সৌরভে ভরপুর। বৃন্দাবনের অনুকরণে তিনি মথুরায় যমুনাতটে কদম্বতরু রোপণ করিয়াছেন, সেখানে তিনি বৃন্দাবনলীলার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন কি রাসকেলির পর্যন্ত (৭৮৪) পুনরভিনয় করিয়া নিজ বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপ দিয়া থাকেন। পবন কৃষ্ণের ব্যবহারে কিছু দুর্বোধ্য ভংগীর ইংগিত পাইয়া রাধাকে তাহার সমাধানের জন্য প্রশ্ন করিয়াছে। এক তমাল বৃক্ষের ফল এক অঞ্জন পক্ষীর দ্বারা কৃষ্ণের নিকট আনীত হইলে তিনি সে ফল ভাংগিয়া তাহার

অভ্যন্তরে কোন আশ্চর্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া ভূতলে লোটাইতে লাগিলেন ও তাঁহার পায়ের নুপূর সুদূরে অন্তর্হিত হইল। ইহার অর্থ কি? এই জটিলতত্ত্ব প্রেম-বিকশিত-নয়না রাধিকার নিকট সুস্পষ্ট। নুপূর তাঁহাদের চিরন্তন প্রেমলীলার সাক্ষী ও দূতী স্বরূপ প্রবাসগত প্রিয়ের প্রত্যেকটি হৃদয়-স্পন্দন রাধার গোচর করে। পবন যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্বেই এই অলৌকিক উপায়ে রাধার গোচরীভূত হইয়াছে। ফলের রহস্য এই যে ইহা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার গোপন মাধুরী ও নিগূঢ় তাৎপর্যের প্রতীক্— ব্যাসদেবও ভাগবতে এই অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করিয়া কল্পতরু-রূপকের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। পবন প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-বিনিময়ের এই অলৌকিক রীতির বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়াছে ও

"এ কথা কে জানে প্রেমা॥
দোঁহে দোঁহ জান রীতি।
আন কি জানয়ে গতি॥"

প্রভৃতি বাক্যে রাধার প্রতি ভক্তি নিবেদনের দ্বারা নিজ দৌত্যকার্য শেষ করিয়াছে। (৭৯০)

৭৯১—৮০০ পদে রাধার বিরহাবস্থা আবার বর্ণিত হইয়াছে। পদাবলীর এই অংশে বিরহখেদই মূল বা স্থায়ী সুর, দূত-প্রেরণ এই প্রজ্জলিত, অসহনীয় বিরহানলের দূরোৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিংগ। রাধা-কৃষ্ণের লীলার নীরব সাক্ষী কদম্ব-তরুতলে রাধা বিষভোজনে বা জলে ঝাঁপ দিয়া বা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প প্রকাশ করিতেছেন—এমন সময় ললিতা মথুরা গিয়া কৃষ্ণকে আনিয়া দিবেন এই প্রবোধবাক্যে রাধাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ললিতার মুখে রাধার দুরবস্থার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ আবার মুখে বাঁশী পুরিলেন ও সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া মথুরা-নাগরীদের মনে ব্রজগোপীদের অনুরূপ দুর্ণিবার আকর্ষণ অনুভূত হইল। মথুরা-নাগরীদের মুখে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় মিলে।

"মধুর মুরলী শুনিতে নাগরী
দাণ্ডাএ দুসারি হয়্যা।
শ্রবণে পশিল চিত্তচোরা বাঁশী
রূপ নিরখয়ে চায়্যা॥

জলে পড়ু বাজ যে হউ সে হউ
দেখহ রূপের ছটা।
যেমত নামল আকাশ হইতে
নব জলধর ঘটা॥" (৮০৩)

"কি হেন গড়ল বিধি হেন রূপ বৈদগধি
নিছিয়া রতন নীলমণি।
নিছিয়া রঞ্জন রাশি নীল পঙ্কজ রাশি (?)
কানড় কুসুম সম মানি॥
চাহিএ যে দিক ভাগে সেখানে নয়ন লাগে
আঁখি চাহে সদা পীতে রূপ।
নয়ন চাতক প্রায় মেঘরাশি সম চায়
সে হেন আনন্দ-রসকূপ॥" (৮০৫)

৮০৬ পদ হইতে আবার ভ্রমর-দূত প্রেরণের পরিকল্পনা কৃষ্ণের মনে জাগিয়াছে। ভ্রমরকে দেখিয়া রাধার মনোবেদনা আরও তীব্রতর হইয়াছে ও মর্মভেদী শ্লেষাত্মক বাক্যে তিনি অবিশ্বাসী প্রেমিকের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানাইতেছেন।

"কুটিল কি হয় সবল ধবল
বিষ কি তেজয়ে সাপ।
কুজন সুজন না হয় কখন
তাপী কি বিসরে তাপ॥
মেঘ কি তেজয়ে ধারার বরিখা
চান্দ কি তেজয়ে সুধা।
মধু কি তেজয়ে মধুর মাধুরী
ভ্রমর পিবই জুদা॥" (৮১৬)

এই বির াকোচ্ছ্বাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি কিছু তত্ত্বকথাও আলোচনা ক অলং ছেন। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কৃষ্ণের সখাবৃন্দের মধ্যে সুবলের প্রধ বিশ্বা র্বত্রই সুপরিস্ফুট। ৮২২ পদে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ স্ত্র মানে ণির রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুবলের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং এই বিষ নর পা দাসের স্বভাব-সিদ্ধ দুর্বোধ্য হেঁয়ালিতে কয়েকটি পয়ার

রচিত হইয়াছে। ৮২৩ পদে ভাগবতে রাধিকার অনুল্লেখের কারণ বিবৃত হইয়াছে। রাধা স্বয়ং শ্রীভগবানেরও আরাধ্যা ও অর্চনীয়া—কাজেই ভগবানের ঐশ্বর্য ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকাতেই বোধ হয় ব্যাসদেব রাধাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াছেন। ৮২৪ পদে রস ও অমিয়া সাগর মন্থন করিয়া রাধা নামের উৎপত্তি ও রাধাই যে কৌস্তুভমণিরূপে সর্বদাই ভগবানের বক্ষে বিহার করেন এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮২৫—৮২৭, ৮৬৭—৮৬৮ পদে ভ্রমর কর্তৃক রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের চিরন্তন মহিমা ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার সংগে সংগে ভ্রমর পূর্বস্মৃতিসিন্ধু মন্থন করিয়া কৃষ্ণের অনুপম, একনিষ্ঠ প্রেমের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছে। রাধার স্মৃতিতে কৃষ্ণ সর্বদাই উন্মনা, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ :

"সজল নয়নে ধারা অনুক্ষণে
বসন ভিজিল জলে।
নীলমণি পরে মুকুতার পাঁতি
যেমন বাহিয়া চলে॥" (৮২৮)

মথুরা গমনকালে রথারূঢ় কৃষ্ণ যে ইংগিত ও অংগভংগী সহকারে রাধিকার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, ভ্রমর তাহার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছে।

৮৩১ পদ হইতে আলোচনা আবার বিরহের লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, আবার মান-অভিমান, অনুযোগ-অভিযোগ, খেদ-বিলাপের পালা আরম্ভ হইয়াছে। রাধা ভ্রমর-দূতকে নিজ অসীম বিরহ-বেদনা ও কৃষ্ণের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা প্রেমাস্পদের চরণে নিবেদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে কৃষ্ণের বর্তমান প্রেয়সী কুব্জার প্রতি নিদারুণ ঈর্ষা উদ্গীরিত হইয়াছে।

"শশধর হেথা উদিত গগনে
সকল ধবল মানি।
কোটি-লাখ তারা উদিত গগনে
কিসে বা তাহারে গণি॥
মুকুতার মালা
সেগুলি হইতে চায়।
অসম্ভব অতি
বেদের বিহিত নয়॥

কাঞ্চন সমান গণিতে গণয়ে
যেনঞি তাম্বের কাঠি।
কোকিলের মাঝে কাকের পসার
যেন তার পরিপাটী॥
রাজহংস কাছে বকের মণ্ডলি
সে যেন নাহিক সাজে।
খঞ্জন কাছেতে চড়ুই পাখিয়া
সেহ রহে যেন লাজে॥
ময়ূর সম্মোহে উল্লূক শোভয়ে
চাঁদ-তারা যত দূর।
কর্পূরে কপোতে (?) যেমত আন্তর
তেমতি কুবুজা দূর॥" (৮৪৬)

ইহার পরে কয়েকটি দুর্বোধ্য পদে কুব্জা কি গুণে শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিয়াছে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ভ্রমর ইহার উত্তর দিয়াছে যে সে কৃপাসিদ্ধি সাধনায় ভগবানকে পতিরূপে লাভ করিয়াছে ও ইহার পূর্ব-ইতিহাস প্রসংগে জানাইয়াছে যে রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে পতি-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তা এক গোপরমণী কৃষ্ণধ্যান করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করে ও—

"আত্ম নিবেদিয়া বন্ধুয়া পাইল
দীন চণ্ডিদাস গায়॥" (৮৫০)
"ভ্রমর মুখেতে এ তত্ত্ব জানিয়া
দুগুণ উঠিল তাপ।
যেমত মন্ত্রের আলাপ পাইয়া
উঠে অজগর সাপ॥" (৮৫১)

৮৫২ পদে অলংকার-শাস্ত্র-ঘটিত রসতত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবিশ্বাসী প্রেমিকের পুনর্দশন লাভে মান উথলিয়া উঠে ইহাই অলংকার শাস্ত্রে মানের সাধারণ ইতিহাস—সুতরাং প্রেমিকের সাক্ষাৎ দর্শন উদ্বেলিত মানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এখানে কৃষ্ণ-দর্শন ব্যতিরেকে রাধার

মনে কেমন করিয়া প্রবল মানের উদ্ভব হইল, এই সম্ভাবিত আপত্তির খণ্ডন স্বরূপ লেখক বলিতেছেন—

"ভাবের আগেতে ভবন[1] গোচর
নাহি অগোচর কিছু
এখানে মানের বিরহ-গমন
গোচব রহল পাছু ॥
ভাবিতে লাগিলা হিয়ার ভিতরে
সেই নটবর কান।
তেঞি সে সাক্ষাতে ভাবের কাছেতে
গোচর করিয়া মান ॥
অতএব হল ভাবিতে ভবনে
সাক্ষাতে আক্ষেপ হয়।
চণ্ডিদাস কহে ভকত হইলে
তবে তরতম কয় ॥"

৮৫৩ ও ৮৮৯—৮৯২ পদে চণ্ডীদাস-সাহিত্যে সুপরিচিত 'পরকীয়া তত্ত্বের' সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

"কি রসে তেজল নিজপতি জনা
পরপতি সনে মেলা।
স্বকীয়া তেজল পরকীয়া সনে
হইল রসের খেলা ॥
স্বকীয়া কিরূপে নিজপতি সনে
না করে রসের রঙ্গ।
পর আস্বাদনে রস পোষ্টা[2] লাগি
পরকীয়া করে সঙ্গ ॥
চণ্ডিদাস বলে পর আস্বাদনে
বাড়ল অধিক প্রেমা।
নিবিড় রসেতে বন্ধুয়া আদরে
যতেক ব্রজের রামা ॥" (৮৫৩)

১। যাহা ঘটে বা ভাবনার বিষয়ীভূত বস্তু ২। পুষ্টি ?

"এই কহি শুন পরকীয়া সুখ
স্বকীয়া থাকুক দূরে।
পরকীয়া সনে রস আস্বাদন
কহিলা মরম সরে॥
পরকীয়া বিনে নাহি আস্বাদন
লবণ বিহীনে স্বাদ।
চিনির কাছেতে কটু কষায়ন
সে যেন করয়ে বাদ॥" (৮৮৯)

"এই সব কথা না কর বেকত
গুপতে রাখিবে ইহা।
বেকত করিলে সঙ্গত লাগয়ে (?)
না পাই যুগল দেহা॥
এমতে রাখিবে মরমে ঢাকিবে
রসতত্ত্ব এই গতি।
যেমত মায়ের আচার লুবুধ (?)
সঙ্গতি আনহি পতি॥" (৮৯০)

(ইহার অর্থ কি এই যে মাতার কলংক-কথা পুত্র যেমন সর্ববিধ সাবধানতার সহিত গোপনে রাখে সেইমত ইহা গোপনে রাখিবে?)

এই পরকীয়া-তত্ত্বের মর্ম-রহস্যটি কবি পরবর্তী পদে উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতার ঝংকার ও সার্বভৌম ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"নব নব রস নবীন রসিক
নৌতুন মধুর সনে।
নবীন ভ্রমর উড়িয়া ফিরিছে
না হয় সঙ্গতি মনে॥
নব নব রতি নব নব গতি
নব নব হব দেহা।
নব নব সুখে নব নব প্রীত
নব নব সুখ লেহা॥" (৮৯২)

ভ্রমর রাধার নিকট বিদায় লইয়া কৃষ্ণ-বিরহে গোকুলের সর্বব্যাপ শোকাচ্ছন্ন অবস্থার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছে। ৮৭১—৮৮৫ পদগুলি কবি শক্তি ও ভাব-গভীরতার দিক দিয়া প্রশংসনীয়। বৃন্দাবনের তরুলতা, মৃগ পক্ষী, রাখাল-বালক, নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণের প্রণয়াস্পদ ব্রজগোপীগণ—সকলে উপরই দুর্বিষহ শোক এক শীর্ণ, পাণ্ডুর আস্তরণ বিস্তার করিয়াছে। মাধবীলত গোপীদের অশ্রুতে পুষ্ট, পল্লবিত; শরৎ-শীর্ণা যমুনা এই অশ্রুপ্লাবনে দুকূল প্রবাহিনী। শোকবিবশা রাধার চিত্র এই পংক্তিগুলিতে চমৎকার ফুটিয়াছে

সেখানে[১] বসিয়া গৌরী রাধা চন্দ্রা ব্রজেশ্বরী
ধরিয়া তাহার এক ডাল।
দাঁড়ায়া মথুরা মুখে করাঘাত মারে বুকে
নয়নে গলয়ে বহু ধার ॥
যেন স্বর্ণ মন্দাকিনী গলিয়া পড়ল পাণি
বহিয়া চলয়ে হেন জানি।
ভিজিয়া বসন-ভূষা নাহিক বিদিগ-দিশা
ক্ষণে রাধা লোটায় ধরণী ॥" (৮৮৪)

এই শোক-বার্তা শ্রবণে কৃষ্ণ কিরূপ অভিভূত হইয়াছেন তাহাও নি লিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"মূর্চ্ছিত নয়নে ঢুসারি জল।
যেমত গলয়ে মুকুতা ফল ॥
নীলগিরি হত্যে যেমন গঙ্গ।
তেন মতে তার সুধাব রঙ্গ ॥" ৮৮৫)

এই মর্মভেদী করুণ চিত্রের পর আবার চণ্ডীদাসের স্বভাবসিদ্ধ দুর্বো হেঁয়ালীতে তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরিণতি হইয়াছে পূর্বোক্ত পরকীয়া-তত্ত্ব-প্রতিপাদনে (৮৮৬-৮৯২); এইখানে এই সুদীর্ঘ ভ্রমর-দৌ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

১। মাধবী-তলায়

(৩)

এইখান হইতে পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের চক্রাবর্তনে আখ্যায়িকার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে। কোনরূপ মুখবন্ধ না করিয়া, পরিবর্তনের কোন সূচনা ব্যতিরেকেই আখ্যায়িকা আবার পিছন ফিরিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় ও মিলনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের সংগৃহীত পদাবলীতে এই অত্যাবশ্যক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মণীন্দ্রবাবুর ১০২ ও ১০৩ সংখ্যক পদের মধ্যে যে বিরাট ঘটনা-গত ব্যবধান আছে তাহা পূরণ করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় না ঘটিলে গোষ্ঠলীলার মধ্যে তাঁহাদের যে প্রণয়বিলাস বর্ণিত হইয়াছে তাহার সংঘটন অসম্ভব। সুতরাং ১০২ ও ১০৩ পদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম-পরিচয়-সূচক কতকগুলি পদের অস্তিত্ব-কল্পনা আখ্যায়িকার ক্রম-পরিণতির দিক দিয়া অপরিহার্য। ভাষা ও পরিকল্পনার দিক দিয়া নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস-পদাবলী হইতে আহৃত ও মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ৬৭৬-৭১৩ সংখ্যক (উচ্ছ্বসিত রূপবর্ণনার কয়েকটি পদ বাদ দিয়া) প্রায় ৩০টি পদ দীন চণ্ডীদাসের প্রতি আরোপিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় ও ঘটনার পৌর্বাপর্যের হিসাবে ১০২এর পরে ইহাদের স্থান-নির্দেশ সংগত। এই কয়েকটি পদে বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ হঠাৎ রাধিকাকে দেখিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলে তিনি সুবলকে তাঁহার মনের কথা জানাইয়াছেন ও সুবল বাজিকর বেশে বৃকভানুপুরে গিয়া ও রাধাকে দশ অবতারের ছায়াচিত্র দেখাইয়া নায়িকার মনে নায়কের রূপ গভীরভাবে অংকিত করিয়াছে। আবার সুবল অপগতমূর্চ্ছা রাধিকাকে যমুনা-স্নানের উপদেশ দিয়া নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনের সুযোগ দিয়াছে ও পরবর্তী ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ৭১৩ পদে 'সূর্য্য পূজা ছলে আনি মিলাইব' ইত্যাদি উক্তিতে আখ্যায়িকার ভবিষ্যৎ পরিণতির ইংগিত আছে বলিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বনপাশ পুঁথির ৮৯৩ পদ হইতে যে অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণমাসী মিলনের প্রধান উদ্যোক্ত্রী ; স্নানার্থিনী রাধা যমুনা-তীরবর্তী এক উপবনের মনোহর সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া উদ্যান-স্বামীর পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন ও পূর্ণমাসী কৃষ্ণকে বনদেবতা-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া তাঁহার অলৌকিক-

রূপৈশ্বর্যের এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছে। পূর্ণমাসী মুগ্ধা রাধিকার নিকট নিম্নলিখিতভাবে সেই বনদেবতার রূপবর্ণনা করিতেছে।

"এমন বরণ যেন নবঘন
মেঘের আকার হয়।
কোটি আঁখি ভরি যদি নিরখএ
তবু (?) সে লখিল নয়॥
কাম কোটি নিছি যাহার বরণ
কত লাখ কোটি চান্দে।
অথির হইয়া যত বিধুবর
চরণ ধরিয়া কান্দে॥

... ...

আর বলি তার মউরিয়া পাখী
তাহার আনিয়া পুচ্ছ।
মালতি তুসারি বেড়ি নানা দামে
তাহাই পরয়ে উচ্চ॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
বাজন নূপুর পায়।
আর আছে হাতে একটী মুরলী
মন্দ মধুর গায়॥" (৮৯৫)

কৃষ্ণনাম প্রথম শ্রবণে রাধিকার ধ্যান-তন্ময় অবস্থা পরবর্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধের ফলে পূর্ণমাসী কৃষ্ণমূর্তি পটাংকিত করিয়া রাধাকে দেখাইয়াছে। এই মূর্তি বর্ণনা গতানুগতিক প্রথা অতিক্রম না করিলেও উচ্চাংগের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন।

"কে ইহা গড়ল অঙ্গ নিরমল
রসেতে নাহিক ওর।
হেন লয় মন লুবুধ মানস
চাহেন (?) করিতে কোর॥
মধু কি মিশায়্যা দিয়াছে ঢালিয়া
শ্রী অঙ্গে যেমত মাখি।

যেন নবঘন কিবা নীলমণি
তেমত পাইয়ে সখি ॥
যেন মরকত মুকুর আকৃতি
কানড় কুসুম কিবা।
লখিতে কি লখি পুন শুন সখি
এই কিবা নরদেবা ॥
... ...
কোনখানে নহি নিন্দুক এ দেহা
চৌরস কপাল ভালি।
কত সুধা যেন গাগরি ভরিয়া
দিয়াছে অঙ্গেতে ঢালি ॥
যেন খগ পাখি (?) জিনিয়া নাসার
অধিক উপমা দেখি।
সরোরুহ জিনি দেখিয়ে তেমনি
সজল নয়ন (?) আঁখি ॥
বাহু দেখি যেন করি-কুম্ভ সম
মধুর ভঙ্গিম অতি।
চণ্ডিদাস বলে এই সে ত্রিভঙ্গ
ইঁহো সে জগতপতি ॥" (৯০৩)

চিত্রপট দর্শনে রাধার

"হেন মনে লয় এরূপ মাধুরী
অঞ্জন করিয়া পরি ॥
নয়নের কোনে নাহি ধরে রূপ
রাখিতে নাহিক ঠাঁই।
ওরূপ হৃদয়ে কত বা রাখিব
আন স্থান মোর নাই ॥"
"ঐছন প্রেমের অঙ্কুর জন্মিল
এ কথা না জানে কেহ।
গুপতে দেখল চিত্রপট পরে
হইয়া কুলের বহু ॥" (৯০৪)

এদিকে যেমন রাধার দর্শনৌৎসুক্য বাড়িতে লাগিল সেইরূপ কৃষ্ণও একদিন 'জাবট যাইতে' অকস্মাৎ 'যেমন বিজুরি চমকে মেঘেতে' রাধার রূপ দর্শন করিয়া 'সবা হতে মরমে মরমি' সুবলকে নিজ মনোবেদনা জানাইলেন। দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকাতে সুবলের প্রতি প্রাধান্য আরোপ একটা অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য। সুবল আবার পূর্ণমাসীর শরণাপন্ন হইতে সখাকে উপদেশ দিয়াছে। রাধার রূপবর্ণনা প্রথানুযায়ী হইলেও কাব্যসৌন্দর্য-মণ্ডিত ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের নিগূঢ় ইংগিতে গতিশীল ও প্রাণবান।

"বেড়ি কালজাদ বেণীর বন্ধনে
সন্ধান লাখেক অলি।
ফুলের সুগন্ধ পাই মধুকর
উড়ি উড়ি ফিরে ভালি॥
সোণার থোপনা তাথে ঝাপাবলি
দুলিছে পিঠের মাঝে।
তা দেখি আকুল চিত্ত বেয়াকুল
নাচে মনোমথ রাজে॥
দোসারি মুকুতা সিঁথার খেচনি
মণি মাণিকের চুণি।
সরস কপালে সিন্দুর-রচনা
চান্দ মুখ শোভা ভালি॥
তার মাঝে মাঝে মলয়ের বিন্দু
কি তাহা কহিমু রঙ্গ।
বিধুরে বেড়িয়া তাহার গাঁথুনি
চান্দ লাজে দিছে ভঙ্গ॥
... ...
কটাক্ষ চাহিতে চিত নহে থির
মনোরথ মাঝে ডুবে।
না পাই সাঁতার উঠু ডুবু করি
তোমারে কহিল এবে॥
সে রস চাহনি কিবা সে লাবণি
নয়ন চঞ্চল রাগে।

হিয়ার পুতলি মরম যেখানে
সেখানে যাইয়া লাগে ॥
রাতুল চরণ যেমন যাবক
তাহাতে নুপূর সাজে।
যেন রাজহংস গমন মাধুরী
কত রাগ-ধ্বনি বাজে ॥"
... ... (৯১১)

স্নানকালে যমুনা-তটে নায়ক-নায়িকার প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিয়াছে। এখানে কিন্তু নায়িকার অবগাহন-স্নিগ্ধ, সিক্তবসনান্তরালে সমধিক-স্ফুরিত দেহ-লাবণ্যের কোন পূর্বরাগ-সুলভ, ভাবোচ্ছ্বাসময় বর্ণনা নাই; ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রেমিকের সৌন্দর্য-মত্ত ভাবাবেগের দ্বারা ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত হয় নাই। বোধ হয় পূর্বে কোন স্থলে এরূপ উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া কবি এখানে অপ্রত্যাশিত সংযম অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম দর্শনের ফলে উভয়ের, বিশেষত নায়িকার ভাব-মুগ্ধতা ও হৃদয়-ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে।

"দোঁহে দোঁহপরি দিঠি পরশল
লাগল মরমে তায় ॥
মরম ভেদল সজল নয়ান
আর কি বারণ হয়
হিয়ায় হিয়ায় যেমন মিলল
সোণার সোহাগা পায় ॥
চণ্ডিদাস কহে দোঁহার রূপেতে
দোঁহে সে হইলা ভোরা।
নয়নে নয়নে মিলল সঘনে
চেতন নাহিক কারা ॥" (৯১৬)

"সই কেন বা লইয়া আল্যে মোরে।
না দেখিয়ে ছিনু ভাল বড় পরমাদ ভেল
মনের মরম কহি তোরে ॥

দেখিতে করিত সাধ শুনিনু বংশীর নাদ
রূপখানি হেরিতে হেরিতে।
নয়নে না ধরে রূপ উঠিল রসের কূপ
নয়ন-চাতক চাহে পিতে ॥
পাইয়া বিধুর লাগ চকোরের মনে রাগ
যেন শশধরের কারণ।
তেমত আমার মন পিতে চাহে সর্বক্ষণ
শুন সখি মনের কথন ॥
... ...
মধুর মুরলী যবে মরমে পশিল তবে
যেন দংশে সে কাল সাপিনী।
বহু ভাগ্যে আনু ঘর না চিনি আপন পর
ঘরে যাত্যে পথ অফুরাণী ॥" (৯১৭)

প্রথম প্রেমের মধুর, আত্ম-বিস্মৃত ভাবের কি চমৎকার অভিব্যক্তি ! নায়কের চিত্ত-বিক্ষোভ অপেক্ষাকৃত মৃদুতর গুঞ্জরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। (৯১৮)

বংশীধ্বনি এই রূপবিহ্বল তন্ময়তাকে ঘনীভূত করিয়াছে। আর একদিনের কাহিনী।

"কনক গাগরী লইয়া সুন্দরী
চলল সিনান-রঙ্গে।
কানুর চরিত্র গুণকথা কিছু
কহেন সখির সঙ্গে ॥
কি রূপ-মাধুরী মোরে দেখাইলে
সে দিন অবধি মোরে।
যমুনার ঘাটে আসিতে সদাই
হেন মন মোর করে ॥
নবঘন বেশ হিযাতে পশিল
স্বপনে দেখিয়ে কালা।
লুবুধ চারিত্র কিবা না হইল
তোমারে কহিল জ্বালা ॥

মনোহর চূড়া তাই মনে পড়ে
মধুর বঙ্কিম হাসি।
দূতের সমান বেকত করিয়া
কাণে কথা কহে বাঁশী॥
ভাবিতে গুণিতে সে রূপ মাধুরী
আইল নয়নে ঘুম।
হেনক সময়ে সেই সে মুরলী
শুনিতে লাগিল ভ্রম॥
চণ্ডিদাস বলে নবোঢ়া রসের
এখন পুষ্টিত নয়।
পরিচয় ভেল না হএ মিলন
তবে পরিতোষ হয়॥" (৯২২)

বাঁশী অচেতন পদার্থ হইয়া কিরূপে দূতিপণা করে, রাধিকা এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সখী বংশীর পৌরাণিক উৎপত্তি-কথা শুনাইয়াছে। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনকালে যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী 'এক করে সুধাভাণ্ড, বিষ-পাত্র ধরি আর করে' সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, পৌরাণিক সংকীর্ণ আবেষ্টন হইতে মুক্ত ও উর্বশী নামে অভিহিত যে ভুবনমোহিনীর জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের বিকশিত বাসনা-শতদলের উপর সনাতন ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা-বেদী রচনা করিয়াছেন, ভক্তিরস-বিহ্বল বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস তাহাকেই মুরলী-রূপে পরিকল্পনা করিয়া তাহাকে চিরসুন্দর, শাশ্বত প্রেমিকের ওষ্ঠ-সংলগ্ন ও ফুৎকার-বায়ুমন্দ্রিত করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, সাধনা ও মানস প্রতিবেশের তারতম্যে কবি-কল্পনার কি আশ্চর্য ভিন্ন-মুখীনতা!

কৃষ্ণ পূর্ণমাসীকে রাধার প্রতি নিজ গভীর প্রেমের কথা জানাইয়া তাহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। পূর্ণমাসী রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইতে স্বীকৃত হইয়াছে ও রাধা যে ইতিপূর্বেই কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছে। তারপর সে রাধাকে কৃষ্ণের প্রস্তাব শোনাইয়া কৃষ্ণের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে। নায়ক তাহার প্রতি প্রেমে ও নিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিবে এই সর্তে রাধিকা প্রণয় প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৯৩২)

(৪)

ইহার পরবর্তী পদগুলিতে পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে, শাশুড়ী-ননদীর অতি-সতর্ক সন্দেহ-দৃষ্টি এড়াইয়া প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম মিলন ও পরবর্তী প্রেমলীলার অগ্রগতি বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলিতে কবি নবোঢ়া, বাসক-সজ্জিতা ও উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ত্রিবিধ অবস্থান্তরের উদাহরণ দিয়াছেন। যুগল-মিলনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (৯৩৬-৯৩৮)। মিলনের পর ও বিদায়ের পূর্বে পরস্পরের ঐকান্তিক আত্ম-নিবেদন তাহাদের প্রেমের পরিপূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। বিদায়ের পর উৎকণ্ঠিত রসবর্ণনা উপলক্ষে আক্ষেপানুরাগের সুপরিচিত মর্মস্পর্শী সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

"কারে নিবেদিব যেবা করে মন
কি হল্য মরমে মোর।
কি খেনে কুদিনে দেখিনু সেজনে
দরশে হইল ভোর॥
ক্ষণেক আঙ্গিনা ক্ষণেক বাহির
ক্ষণেক যমুনা তীর।
ক্ষণ করে মন ঘন উচাটন
ক্ষণেক না হই স্থির॥
আঁখি মুদইতে সদা কানু দেখি
কি হল্য কালিয়া কানু।
ভোজনে বসিলে নিরবধি দেখি
ও নব রসেব তনু॥
ক্ষণেক নয়নে যদি ঘুম আসে
চকিতে ভাঙ্গিয়া যায়।
নিশিতে উঠিয়া থাকয়ে বসিয়া
দীন চণ্ডিদাস গায়॥" (৯৪৬)

"যে জন না জানে লেহ প্রেমরতি
সে জন আছএ ভাল।
পরের পিরিতি যে জনা করয়াছে
তাহার পরাণ গেল॥

তাথে শ্যামপ্রেমে যে জন ডুবল
অথই রসের সিন্ধু।
লাখেক গুণের কেবল কিঞ্চিৎ
তাহার পাইলে বিন্দু॥

... ...

শুনহ সুন্দরী রাজার কুমারী
যা সনে তোমার মেলা।
গোলক-ঈশ্বর গোলক ত্যজিয়া
করিতে ব্রজেতে খেলা॥
বড় ভাগ্য মানি শুন বিনোদিনী
হইল তো সনে মেলা।
কেন উৎকণ্ঠিত কর বিপরীত
আর সে জানিবে জ্বালা॥
চণ্ডিদাস কহে শুন সুকুমারি
কি তার ভাবনা কর।
কালার পিরিতি কলঙ্কের মালা
হৃদয়ে যতনে পর॥" (৯৪৮)

রাধার সহিত পূর্ণমাসীর ঘনিষ্ঠতার কথা সখী-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে—তাহাতে রাধা পাছে তাঁহার গোপন প্রেমের কাহিনী প্রকাশ হয় এই ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কবি মৃদু-স্নিগ্ধ পরিহাসে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন :—

"কহে চণ্ডিদাস বেকত হইল
গুপত পিরিতিখানি।
বেকত না হল্যে এ সব চরিত্র
আমি কোথা হতে জানি॥" (৯৫০)

সখী-প্রবোধাত্মক পদগুলির মধ্যে একটি কবিত্বের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। সখী শ্রীকৃষ্ণের অপরিবর্তনীয় প্রেমনিষ্ঠার কথা বলিয়া রাধার উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতেছে।

"গুণ কি নিগুণ না হয় কখন
চান্দ কি তেজয়ে সুধা।

অমিয়া গরল না হয় কখন
শুন স্থকুমারি রাধা ॥
মধু কি কখন কটু কষায়ন
স্থজন কুজন নয়।
বিষধর কভু না হয় অমৃত
আপন স্বভাব হয় ॥
ভানু কি শীতল না হয় সরল (?)
কটু কি মধুর হয়।
স্থজন কখন না হয় বিমুখ
বেদের বিহিতে কয় ॥”

আয়ানের গৃহ হইতে প্রস্থানকালে একদিন কৃষ্ণের মূর্তি কুটিলার চোখে পড়িয়া গেল। রাধা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতেছেন যে গ্রীষ্মাধিক্যে তাঁহার শরীরে যে স্বেদ বিন্দু সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতেই কুটিলা নিজ মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে কৃষ্ণ মনে করিয়াছে। এ কৈফিয়ৎ ঠিক সন্তোষ-জনক নহে এবং কুটিলাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার অবিশ্বাস তীব্র ব্যংগাত্মক বাক্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

“জটিলা[১] তখন কহিতে লাগল
শুনহ আমাব বাণি।
আমার আকার ছায়ার বিকার
আমি সে সকলি জানি ॥
আমার কোথায় কালিয়া ধারণ
আমার কোথায় চূড়া।
আমার কোথায় মুরলী বাদন
পিঁধন কটির ধড়া ॥
আমার কোথায় পীতের বসন
বাজন নপুর পায়।
প্রতিবিম্ব বলি করিলে উত্তর
মোরে ভুলাইলে ঠায় ॥

১। কুটিলা ?

কেমত তোমার চরিত্র বিষয়
দেখিয়ে কঠিন ধারা।
আকাশের চান্দ সুরঙ্গ আনিতে
পারহ শতেক তোরা॥
বচন সচন সুমেরু শিখর
নিঃশ্বাসে উড়াতো পার।
তোমার চরিত্র দেখিল নয়ানে
কত মেন ছলা ধর॥
আক্ষের-পলকে এ দধিসায়র
লর্জ্জিয়া যাইতে কি।
তুমি সে পারহ এ সব করিতে
হইয়া রাজার ঝি॥
... ...
এমন বয়সে এতেক চাতুরী
আর সে বয়স আছে।
কোন বা চেতনি কোন গোয়ালিনী
দাণ্ডাবে তোমার কাছে॥" (৯৬১)

এই সমস্ত ঘটনা কবি উৎকন্ঠিতা-রসের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। ৯৬২ পদ শেষ হইবার পূর্বে পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে ও ৯৮১ পদের শেষার্ধ হইতে আবার নূতন বিষয়ের অবতারণা লক্ষিত হয়।

৯৬৩—৯৮০ পদের মধ্যে ছেদ কবি কি ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ৯৮১—৯৮৫ পদে মনঃশিক্ষা শীর্ষক অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ রাধাকে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় স্তুতি ও উপাসনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধ যে জন্ম-জন্মান্তরের তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

"বহু অবতারে তোমার মহিমা
জানিতে নারিয়াছি।
কাল সে বরণ ধরিয়া যতনে
জনম লভিয়াছি॥

তোমারে ভাবিতে কাল তনুখানি
এ দেখ কালিয়া দেহ।
কালিয়া বরণ তথির কারণ
এ কথা না জানে কেহ॥
চণ্ডিদাস বলে অদ্‌ভূত কথা
পুরাণ অনেক সাঁচি।
ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত নিগূঢ় আখ্যান
তুলিল অধ্যায় বাছি॥" (৯৮২)

কবি রাধাকেও কৃষ্ণ-সেবা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এ পদগুলি আধ্যাত্মিকতার উঁচু সুরে বাঁধা।

(৫)

৯৮৬ পদ হইতে 'রসোদ্গার' অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ও ১০০০ পর্যন্ত ইহারই আলোচনা চলিয়াছে। এই পদগুলি ভাব-গভীরতা ও কবিত্বশক্তির দিক দিয়া উচ্চাংগের। ইহারা চণ্ডীদাসের অনুরূপ সুপরিচিত পদাবলীর সহিত একই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত। রাধা নায়কের সদ্য-উপভুক্ত অপরিমিত আদর-সোহাগের বর্ণনায় গদ্‌গদ-কণ্ঠ, প্রেমের অসহনীয় সুখস্মৃতি রোমন্থনের প্রক্রিয়ায় যেন তীব্র জ্বালাময় বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

"নাগর চতুর রসিক রায়।
বুক চিরি মোরে থুইতে চায়॥
হিয়ার পদক যেমত পরে।
অঙ্গের ভূষণ রাখিয়ে মোরে॥
যেখানে আছয়ে আঁখের তারা।
সেখানে রাখিতে করযে ধারা॥
পরাণ-পুতলি যেখানে রয়।
সেখানে রাখিতে মনেতে হয়॥
দেখিলে আমারে পরাণে জিয়ে।
রাঁকে ধন যেন পাইলে নিয়ে॥
কত নিধি যেন আঁচলে দেই।
গায়না নাগর আনন্দ খেই॥" (৯৯৬)

আবার —

"কালি সে গিছিনু যমুনা সিনানে
মাজিতে আছিনু অঙ্গ।
হেনক সময়ে নাগর চতুর
মিলল আমার সঙ্গ॥
একেলা আছিয়ে নাহিক দোসর
কাহারে কহিব কথা।
কূলে দাণ্ডাইয়া মোর পানে চায়্যা
মুরলী পুরল হোথা॥
আকার ইঙ্গিতে নানা ছন্দোবন্ধে
কহেন রসের বোল।
আচম্বিতে আসি নাগর-শেখর
করল আপন কোর॥
ভাগ্যে কোন লোক না ছিল সেখানে
এ কি এ বিষম জ্বালা।
নগরের লোক দেখিলে কি হত্য
উঠিত কলঙ্কমালা॥" (১০০০)

১০০১ পদ হইতে বিপ্রলম্ভ রসের অবতারণা। এই পদ-বিন্যাস-রীতি হইতে বুঝা যায় যে কবি এখন আর ধারাবাহিক আখ্যায়িকা—বিবৃতির কার্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি এখন আখ্যান ছাড়িয়া রস-আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক মাথুরের পর আখ্যান-বস্তু নিঃশেষ হইয়াছে। দূত-প্রেরণ-পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকার বিস্তৃতি নয়; ইহা পূর্বস্মৃতি পর্যালোচনা ও বিরহ-ব্যাকুলতার পূর্ণতর প্রকাশের উপায় মাত্র। আখ্যায়িকা-সূত্র ৮৯৩ পদ হইতে ছিন্ন হইয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রসের কাব্যাস্বাদন আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে পদগুলি মূলত গীতি-ধর্মী! ঘটনা-বিবৃতির বোঝা কাঁধ হইতে নামাইয়া কবি এখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন ও তাঁহার পদ-বিক্ষেপ দৃঢ়তর ও স্বচ্ছন্দতর হইয়াছে। যে সংযোজক সূত্রগুলি ধারাবাহিক আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ সেগুলির নিদর্শন আর মিলে না। কাজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সংক্রমণ আর তথ্য-বিবৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যদৃচ্ছা-প্রণোদিত। গীতি-কবিতার প্লাবনে আখ্যায়িকার দৃঢ় বেষ্টনরেখা বিদীর্ণ

ও বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মণীন্দ্রবাবু তাঁহার পদাবলী-সংস্করণের ভূমিকায় আখ্যায়িকার অনুবর্তনকে চণ্ডীদাসের পদের কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতা নিরূপণের যে অভ্রান্ত মানদণ্ডরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিচার-নীতি এই পুঁথির আবিষ্কারের পর অচল হইয়া পড়িতেছে।

১০০১—১০১৬ পদে বিপ্রলম্ভ রস আলোচিত হইয়াছে। ১০১৭ পদের প্রথম তিন পংক্তির পর পুঁথি খণ্ডিত। সংকেত-মাধবীতলে মিলনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাধা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মিলনাকাংক্ষায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছেন। সখীরা রাধার ব্যাকুল অস্থিরতা দেখিয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছে ও প্রথমে ললিতা ও পরে রসমঞ্জরী প্রতিশ্রুতি-ভংগের হেতু জানিতে কৃষ্ণের নিকট গিয়াছে। কৃষ্ণ দুই সখীর নিকট দুই রকম কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—ললিতাকে বলিয়াছেন গাভী হারানোর কথা ও রসমঞ্জরীকে যশোদার জ্বর-বিকারের কাহিনী। উভয় সখীই কৃষ্ণের অনুপম প্রেম সম্বন্ধে বিগত-সংশয় হইয়া ফিরিয়াছে ও রাধাকে সান্ত্বনা দিয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ১০০৩—১০০৫ পদে, সেই শুকপক্ষীআহৃত, চারি খণ্ড হইয়া চতুঃসমুদ্রে পতিত ও সমুদ্র মন্থনের দ্বারা পুনরুদ্ধারিত রাধাকৃষ্ণরূপ চতুরক্ষরাত্মক কল্পতরুফলের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এই পদগুলিতে কবিত্ব-বৈশিষ্ট্য সেরূপ নাই—কোন কোন পদের দুই একটি পংক্তি মাত্র কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ।

সুজন ও কুজনের ব্যবহারগত পার্থক্য কবি একটি নূতন উপমার দ্বারা বিশদ করিয়াছেন।

"কুঞ্জর দশন সম বচন না হয় ভ্রম
সুজনের এমত সুবোল।
কুজন বিষের কাঁটা বিষম তাহার লেঠা
কূর্ম্মগ্রীব যেমত সুতোল॥" (১০০১)

রসমঞ্জরী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ, বিনয়-মধুর ব্যবহারের কথা বলিতেছেন।

"বহুত বিনতি আদর পিরিতি
কত না কহিব মুখে।
এক মুখে তাহা কত না কহিব
বেদনা হইল বুকে॥

শুনিতে শ্রবণে মধুর বচনে
সিঞ্চিল আমার দেহা।
হেন মনে ভেল জনমে জনমে
থাকুক তাহার লেহা॥
দাসী হয়্যা রই শুন ওগো সই
সে দুটি চরণতলে।
কত শত শত কলসী ভরিয়া
অমিয়া ঢালিব ভালে॥" (১০১৫)

(৬)

১০১৭ হইতে ১০৮৫ পর্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত থাকায় আখ্যায়িকায় আবার একটা বিরাট ছেদ পড়িয়াছে। ১০৮৬ পদে রাধা ও তাহার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন ও এই বিদায় মুহূর্তে রাধার মুখে একটি আত্ম-নিবেদন-মূলক পদ আরোপিত হইয়াছে। ১০৮৯ পদে বলা হইয়াছে যে এবার বর্ষা-অভিসার শেষ হইয়া পরবর্তী পদ হইতে জ্যোৎস্নাভিসার আরম্ভ হইবে। ১০৯২ পদে কৃষ্ণ একটি স্তুতি-মূলক পদে রাধিকার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন ও এই পদের শেষার্ধ মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১০৭৭ সংখ্যক খণ্ডিত পদের সহিত এক। ১০৯৪ (সংস্করণ. ১০৭৯) পদে এই লীলা সমাপ্ত হইয়াছে ও পরবর্তী পদে (বিঃ বিঃ সং, ১০৮০) গৌণরাস শেষ হইয়া মহারাস আরম্ভ হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পালা সংস্থাপন-রীতি বুঝিবার পক্ষে এই পদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। তৎপূর্বে মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৪৫—১০৫১ সংখ্যক পদে (৫১২—৫১৮) কৃষ্ণের স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে রাধিকার গৃহে দিবাভিসার। সেখানে উভয়ের লীলা-বিহার ও যমুনার জল আনিবার উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে সংকেত-বিনিময় ও স্ত্রীবেশধারী নায়কের সংগে কদম্বতলে রাধিকার মিলন-প্রস্তাব—গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত আরও দুইটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলি বনপাস পুঁথিতে থাকিলে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা সম্ভবতঃ ১০৬০—১০৬৬ হইত। দিবাভিসার, বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার—এ সমস্ত একই পরিকল্পনার অংগীভূত ও গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই বুঝা যায়। গৌণরাসের মধ্যে প্রকৃত রাস বা মণ্ডলীনৃত্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছিল

কি না, তাহা অনুমানের ব্যাপার; হইয়া থাকিলে ১০১৭—১০৫৯ পদের মধ্যে অনায়াসেই উহার স্থান নির্দেশ করা যায়। মণীন্দ্রবাবু অনুমান করেন যে ১০৫১ পদে মিলনের যে সংকেত দেওয়া হইয়াছে 'নাপিতানী বেশে মিলনের' মধ্যে সেই সংকেত চরিতার্থ হইয়াছে। এই অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কেননা নাপিতানীর প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে 'তৈল হলদি'র কোন উল্লেখ নাই ও সংকেত-নির্দিষ্ট মিলনের স্থান যমুনা-তট, রাধিকার গৃহ বা বৃকভানুপুর নহে। ১০১৭ পদের পূর্বে বিপ্রলম্ভরস আলোচিত হইয়াছে—সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কয়েকটি পদে 'খণ্ডিতা' ও 'কলহান্তরিতা' রস বর্ণিত হইতে পারে, এরূপ অনুমানও অসংগত নহে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে মহারাসের অন্তর্গত কতকগুলি বিষয়—যথা 'বংশী শিক্ষা', 'নিধু বনে কিশোরী রাজা', 'যুগলরূপ', 'কুঞ্জর-লীলা' প্রভৃতি (৫৯২—৬২৬) গৌণরাসের মধ্যে যুক্তি-যুক্তভাবেই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

১০৯৫ পদটি (মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৮০) চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। মণীন্দ্রবাবু এই পদটিকে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাইলে মহারাস ও গৌণরাসের মধ্যে তিনি যেভাবে পদ-বিভাগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইত। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।

"কহিল এক গৌণরাস এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥
ব্যাসের বর্ণনা অতি সে উপমা
মহারাস তার নাম।
এবে কহি কিছু স্থানের বর্ণনা
মহারাস অনুপাম॥
যদি বা কহিলে দ্বিরুক্তি বর্ণনা
পুন কেন আর রাস।
রসের উপরে অতএ বর্ণিল
শুনহ এ ইতিহাস॥

মহারাস কহি রসপোষ্টা লাগি
এই তত্ত্বকথা লীলা।
শুনহ ভকত রসিক সকল
এ তত্ত্ব গোপনে ছিলা॥
রসের চাতুর্য্য কেবল মাধুর্য্য
অতি সে রসের সার
গৌণরাস পর এই অভিসার
বর্ণিল দ্বিতীয় বার॥
চৌষট্টি রসের ভোক্তার কারণে
নায়ক ভোজার গুণ। (?)
চণ্ডিদাস বলে এ সব মধুর
শুন মনোরথপুর॥" (১০৯)

ইহা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি অনুমান করা যায়—

(১) ইতিপূর্বে মূলতঃ ব্যাসদেবকে অনুসরণ করিয়া মহারাস আখ্যাত হইয়াছে। এবার স্থানের বর্ণনার উপর বিশেষ জোর দিয়া লীলাটি পুনরায় বর্ণনা করা হইতেছে। পরবর্তী দুই পদে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য ও রাস-মঞ্চের মণি-মাণিক্য-বিচ্ছুরিত দীপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(২) দ্বিরুক্তি বর্ণনার অভিযোগ হইতে কবি আত্মপক্ষ-সমর্থন করিতেছেন। প্রথমবারের বর্ণনা ঘটনা-পারম্পর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—লীলার ক্রম অনুসারে আখ্যায়িকার মধ্যে ইহার স্থান নির্দিষ্ট। এবার কেবল রসের দিক হইতে আলোচনা—বিবৃতির প্রয়োজন-শৃংখলে ইহা আবদ্ধ নহে দ্বিরুক্তি বলিয়াই এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত।

(৩) প্রথমবারে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ও যাহাকে মণীন্দ্রবাবু ৬২৭—৬৭৫ পদে 'রাস-লীলা' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে মহারাস ও তাহার স্থান লীলা-পর্যায়ে অক্রূরাগমনের পূর্বে সুতরাং মান পর্যায়ের পদগুলি ৫৪ হইতে প্রথম মহারাসে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। প্রথম মহারাসের উপলক্ষে কবি ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের উল্লেখ করিলেও তিনি যে খুব নিখুঁত ভাবে ভাগবতোক্ত কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন ও ভাগবত-বহির্ভূত কোন পরিকল্পনাই কাব্য মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এইরূপ অনুমান কবির স্বাধীনতাকে অনুচিত ভাবে খর্ব করে। সেইজন্য মনে হয় যে রাসের

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের ছদ্ম ঔদাসীন্যে নায়িকার মান এবং রাসের পর রাধার ও আর এক গোপরমণীর স্কন্ধারোহণের অসংগত অনুরোধে নায়কের অভিমান ও অন্তর্ধান—পরস্পরের পরিপূরক পরিকল্পনারূপে একই আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই দ্বিতীয়বার মহারাস বর্ণনায় পুঁথির প্রথম তিনটি পদ (১০৯৫—১০৯৭) মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের সহিত অভিন্ন (১০৮০—১০৮২) ১০৯৮ পদটি পুঁথিতে নূতন সংযোজনা—বাঁশী শুনিয়া রাধার ব্যাকুলতা ও কৃষ্ণের প্রতি বংশী-সম্বরণের জন্য অনুরোধ। আখ্যায়িকার পরিণতির দিক দিয়া পদটি এই স্থানে ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু রসপুষ্টি কবির উদ্দেশ্য হইলে ইহার সংস্থাপনে আপত্তিজনক কিছুই নাই। ১০৯৯—১১০০ পদ সংস্করণের সহিত এক (১০৮৩—১০৮৪)। ইহার পর পুঁথির যে তিনটি পদ আছে (১১০১—১১০৩) তাহা মণীন্দ্রবাবুর অনুমান-সিদ্ধ পদ-সংস্থাপন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কবি মুখবন্ধে যে পূর্বাভাস দিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাই নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। এখানে নায়িকার মান, নায়ক কর্তৃক সেই মানভঞ্জন প্রভৃতি আখ্যান-বস্তু-বিস্তার মূল মহারাস হইতে পৃথক করা হইয়াছে। ১১০১ পদে নায়কের হর্ষোচ্ছ্বাস, নায়িকার প্রতি স্তুতি ও কুঞ্জগৃহে মাঙ্গল্যানুষ্ঠানের সহিত সখি কর্তৃক উভয়ের বরণ। ১১০২ পদে যুগলরূপ বর্ণনা ও ১১০৩ পদে নূতন ছন্দে রাস নৃত্যের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-হিল্লোলের অভিব্যক্তি। বর্ণনার শেষাংশ এইরূপ :—

"ঐছন করল পুনহি রাস্
রসের উপরে এ অতি হাস
রসপোষ্টা লাগি পুন সে কহিল (?)
শুনহ শ্রবণ পাতিয়া।
আগে সে কহিল রসের রীত
এবে কহি শুন রসের চিত
কি রূপ-মাধুরী নাগর নাগরী
চণ্ডিদাস কহে মোহিয়া॥" (১১০৩)

'রসের রীত' অর্থ বোধ হয় আলংকারিক রীত্যনুযায়ী ও ভাগবতের অনুসরণে ঘটনা-বহুল বর্ণনা; 'রসের চিত' অর্থে নাগর-নাগরীর হর্ষাপ্লুত, আবেশ-কণ্টকিত, মুগ্ধ-বিবশ মানসিক অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে।

১১০৪—১১১৯ পদে 'স্বয়ংদূতী' অধ্যায়ে মানের অবতারণা ও মানভঞ্জনের পরে নর্তক-রাস প্রবর্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মনে হয় যে পূর্বে যে মানের পালা আখ্যায়িকা সূত্রে গ্রথিত হইয়া মহারাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখানে কবি তাহাকে পৃথক ও আখ্যান-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি রাসের সংগে মানের যে নিত্যসম্বন্ধ তাহা কবি প্রকারান্তরে আত্মসমর্থন-ব্যপদেশে স্বীকার করিয়াছেন।

"কহিবে সবাই রাস আগে ভেল
পশ্চাৎ কেন সে মান।
এ চারি মান সে মান উপজল
শুন কহি বিদ্যমান॥
পরোক্ষে শ্রবণে কোন সখি দ্বারে
সাক্ষাৎ এ চারি হয়।
কখন কখন কোন কোন স্থানে
অভিমান অতিশয়॥
এই চারি মান যখন হৃদয়ে
পৈসয়ে হিয়ার মাঝে।
এই চারি যবে সমুহ হইলে
মানে হয় আন কাজ॥
তবে হয় শুন মান সে দুর্জ্জয়
কহিল মানের রীত।
চণ্ডিদাস কহে রসের চাতুরী
শুন হয়্যা এক চিত॥" (১১১৩)

অর্থাৎ রাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কয়েকটি কারণে মানের উদ্ভব হয় ও এই কারণসমূহের সমাবেশে দুর্জয় মানের উৎপত্তি। রাসের সহিত মানের সম্বন্ধের ইংগিত অন্য এক স্থলেও পাওয়া যায়।

"শরৎ পুর্ণিমা রাস রসে চিত
মুগধ রসিক রায়।
গোপিযুঁথ মিলি শ্যাম বনমালি
পুন রাস কৈল যায়॥

জাবটের এক গোপের রমণী
তার নাম হয় রাধা।
কৃষ্ণের বড়ই সেই সে প্রেয়সী
মরমে মরমে বাঁধা॥
নব নিধুবনে মান অভিমানে
ভেল সে দুর্জ্জয় মান।
অনেক প্রকারে মান ভাঙ্গাইতে
দীন চণ্ডিদাস গান॥" (১১১২)

কৃষ্ণ নীলমুকুর লইয়া স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রাধার মান ভাংগাইতে আসিয়াছেন। তিনি আপনাকে বৃকভানুরাজা-প্রেরিতা দূতীরূপে পরিচিত করিয়াছেন। এই প্রসংগে কৃষ্ণের রাস-সহচরী রাধানামে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বিনী গোপরমণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাধা নীলমুকুরে নিজের পার্শ্বে কৃষ্ণের নবঘনশ্যামরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া নায়কের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও উভয়ে মিলিত হইয়া নর্তক-রাসের অভিনয় করিয়াছেন।

১১১৯ পদে বর্তমান লীলা-বর্ণনার মধ্যে নিগূঢ় বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি পাওয়া যায়।

"কমল মাধুরী সুধারসখানি
ভ্রমর তাহাই জানে।
রাধাকৃষ্ণ পদ রসের অমিয়া
পিবই ভকতগণে॥
কোনজন পাএ কোনজন লএ
খুঁজিয়া খুঁজিতে নারে।
কোন কোন জন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
কত কত জন ফিরে॥
সাধক সাধিতে উপাসনা আদি
করয়ে ভকত-সঙ্গ।
কোন কোনজন কৃপা বল পায়্যা
ভুঞ্জয়ে রসের রঙ্গ॥

ঐছন কেহ সে পায়্যা মধুরস
খাইয়া বিলায় কত।
কেহ সুখে করি মধুর গাগরি
ভরিয়া রাখয়ে যুত॥
অষ্ট মুখ্য সখি আট রস হয়
আট আট গুণ হয়।
কোন রসে হয় নায়কের গুণ
টানয়ে এ অতিশয়॥"

পদটির উপর চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম-ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

১১২০—১১৩২ পদে হাস্যরসের অন্তর্গত বংশীহরণলীলা। ইহা ও পরবর্তী জলকেলি, ঝুলন প্রভৃতিও রাসের আনুষঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নর্তন রাসের পর নিদ্রায় অচৈতন্য কৃষ্ণের বাঁশী সখিরা লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাঁহার ব্যাকুল অনুসন্ধানে বক্র, পরিহাসাত্মক উত্তর দিতেছে। বলিতেছে "বাঁশী হারাইয়াছে, ভালই হইয়াছে; আমরা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিব।" চণ্ডীদাস তদুত্তরে বলিতেছেন :—

"চণ্ডিদাস বলে এক বাঁশি গেল
আর বাঁশি আছে হোথা।
এ দুটি আঁখের চঞ্চল কোণেতে—
চোর পালাইবে কোথা॥"(১১২২)

বাঁশীর অবর্তমানে কটাক্ষই স্বয়ং-দৌত্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কবিত্বপূর্ণ পদে বাঁশীর মহিমা বর্ণনা করিতেছেন।

"যদি বল তার শত ঠাঁই ছেদ
সেই সে তাহার গুণ।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার আছে রসসার
নিপুণ হইয়া শুন॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে কয় কিছু নাহি ভয়
সপ্ত রন্ধ্রে আছে সুধা।
ীর গুণ একে একে কহি
শুন বিনোদিনী রাধা॥

যখন মুরলী তখন সেই সে
বাজয়ে কতেক তান।
ত্রিভুবন সখি (!) তরু-লতা-পাখী
কেহ সে না ধরে প্রাণ॥
দেবগণ স্থখি শুনিতে শবদ
পুলকিত সবে রঙ্গ।
মৃত শাখাগণ মিলয়ে পল্লব
যোগীর ধেয়ান ভঙ্গ॥
মুনি ফণিগণ রহে এক মন
যবে সে পায়এ রব।
যমুনার জল উজান বহয়ে
পাষাণ হয়এ দ্রব॥
বনের হরিণ করি এক মন
কাননে ফিরিয়া বুলে।
আকাশ-মণ্ডলে রবিরথখানি
সেহ সে নাহিক চলে॥
ব্রহ্মার ধেয়ান ভাঙ্গয়ে তখন
সুরাস্থর আদি গণে।
শুনিলে এ ধ্বনি দেবের ঘরণী
পুলক করিয়া মানে॥" (১১২৮)

এই পদে যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় মিলে তাহা মোটেই তৃতীয় শ্রেণীর কবির বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত রাধা লুকান বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর শক্তি পরীক্ষার জন্য আবার তাহাতে ফুৎকার দিলেন।

"আষাঢ় শ্রাবণে মেঘ বরিষণে
তেমত ছুর্বার বয়।
আকর্ষণ কৈল অবলা পরাণে
ধৈরজ নাহিক রয়॥" (১১৩২)

শেষ পর্যন্ত অশেষ স্তবস্তুতি, করিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণকে বাঁশী বাজান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ও এইরূপে পালার উপসংহার হইল।

১১৩৩—১১৩৯ পদে জলকেলিবর্ণনা। এই ক্রীড়াতে নায়কের দুরবস্থাবর্ণনাত্মক একটি ব্রজবুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীদাসের সংকলিত পদাবলীর মধ্যে ব্রজবুলি পদ খুব কমই দেখা যায়। কাজেই পদটি সেই হিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক।

"নব নব রঙ্গিনী প্রেম তরঙ্গিণী
পৈঠল সলিল গভীর।
ফেঁকত সলিল শত শত নিকর[১]
ডারহি আহীর সুধীর॥
সখি হে কি কহব আজুক রঙ্গ।
জল মাহে পৈঠল (?) কানু সমাগম
ভাগল শ্যামরু চন্দ॥
তোড়ল বেশ বসন মলয়ানিল (?)
মৃগ মদ সৌরভ পঙ্ক।
ভাঙ্গল কি কাঁহা পড়ল তহি মালতী
গুঞ্জা-বরিহা আসঙ্ক॥
নয়ন কমল দল রাতুল সৌসর
কাঁহা গেল ফুলশর সাজ।
চরণক নূপুর কাঁহা গেএ সো দূর
মুরলী গড়্যায় তহি মাঝ॥
জলরস কেলি ভেলি সমর সুখ
আর কত বিঘিনি (?) বিথার
হরিকর হার পায়নু হাম নিজকর
কোথাহ চলল বাটপার॥
খোঁজল সলিল সব হি সখি সঙ্গিনী
রঙ্গিণি চপল পরাণ।
পুন হি চলল সব গোপ রমণিগণ।
চণ্ডিদাস পরমাণ॥" (১১৩৭)

সখিগণের ব্যংগে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া আবার জলযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে রমণীরা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিহারান্তে গৃহে ফিরিল।

---

১ শীকর (?) ২ তুঃ রায় শেখর

১১৪০—১১৫৫ পদে ঝুলন, পিচকারী সাহায্যে পরস্পরের অংগে সুগন্ধি প্রক্ষেপ ও যুগলরূপ বর্ণনা। এগুলিকেও রাসের অংগীভূত ধরা যায়। ঝুলন-মণ্ডপের বিচিত্র ও রত্নখচিত সৌন্দর্যবর্ণনা রাসমঞ্চের বর্ণনা-প্রণালীর অনুরূপ। পূর্ণিমা-নিশীথে কৌমুদী-প্লাবিত বনভূমির শোভা দেখিয়া গোপরমণীগণের কৃষ্ণ-দর্শনের আকাংক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় কৃষ্ণের সংকেত-মুরলী-ধ্বনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে। তাহারা বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছে।

"যেমত চঞ্চল বনের হরিণী
তেমত বাউল প্রায়।
পথে যেতে পদ আন ঠাঁই পড়ে
তটস্থ হইয়া যায়॥" (১১৪১)

কুঞ্জগৃহে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহারা উভয়েই আনন্দবিভোর। চারিদিকে সখিরা ব্যজন, চন্দনলেপন প্রভৃতি সেবায় নিযুক্তা। ঝুলনলীলা আরম্ভ হইয়াছে, শত শত পিচকারী নায়ক-নায়িকার অংগে সুগন্ধি বর্ষণ করিতেছে। তারপর সখিরা যুগলরূপ দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই অনুপম যুগ্মসৌন্দর্যের রসাস্বাদনে প্রয়াসী হইয়াছে।

"চণ্ডিদাস কহে নিশিদিশি দেখি
এ দুই নয়ন কোণে।
তথাপি চকোর নয়ন-চাতকী
সদা নিতে চাহে পানে॥" (১১৪৮)

১১৪৯ পদে দেহ-সৌন্দর্য ও ১১৫১ পদে সখিদের চিত্তে এই সৌন্দর্যের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। উভয় পদই কবিত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ উদ্ধারের যোগ্য।

"মরম সজনি সই।
কি আর বলিব দোঁহ রূপ খানি
সদাই নয়নে রই॥
আধ তনু দেখ কালিয়া-বরণ
আধ তনু দেখ গোরা।
যেমত জলদে বিজুরি বেড়ল
দেখিয়ে তেমতি ধারা॥

আধ সে ললাটে চন্দন[১] শোভিছে
আধ সে কপালে ইন্দু।
এক শির পর ময়ূর সুন্দর
আর শিরে ফণি নিন্দু॥
এক খঞ্জ-নিয়া পাখি সে নাচিয়া
ফিরিছে মনের সরে।
আর অদভূত দেখিল বেকত
ও মৃগ বুলিয়ে ফিরে॥
এক ফল দেখ দাড়িম্ব বীজের
আকৃতি সমান হয়।
কুন্দের কুসুম কলিকা সুষম
এক স্থানে দেখ রয়॥
এক ফল নীল রঙ্গিণী—(?) সমান
আর ফল রাতা সম।
বড় অদভূত কখন না দেখি
দেখিয়া লাগিল ভ্রম॥
এক কীর পাখী খগ তার কাছে
সুধা বরিষয়ে কেনে।
বুঝি সে বাউলি চান্দের মধুতে
তেঞি বরিখত ঘনে॥
চঞ্চল (? চাঁদের ঘটাও শোভিত
করে বৃন্দাবন ভূমি।
চণ্ডিদাস ভণে দোঁহার রূপেতে
আনন্দে ভাসিল জানি॥" (১১৪৯)

"নিরখিতে রূপ আঁখি পিছলয়ে
অঙ্গেতে নাহিক রয়।

১ সিন্দুর?

সদাই দেখিএ রূপের রাশিটি
মোর মনে হেন হয়॥
* * * *
কোন সখি বলে অপরূপ খানি
আঁচলে বাঁধিয়া থোব।
কোন সখি বলে দোঁহ রূপ খানি
নয়নে ভরিয়া নিব॥
কোন সখি বলে হিয়ার কাঁচুলি
করিতে হএন মন।
কোন সখি বলে বান্ধি কুতূহলে
নোটনের নটকন॥
কোন সখি বলে হিয়ার পদক
করিয়া রাখিএ সারা।
আপন ইচ্ছাএ সদাই দেখিএ
এমত বাসিএ ধারা॥
চণ্ডিদাস কয় হেন মনে লয়
বাহির করিতে ভয়।
ব্রজের অনেক ডাকা চুরি আছে
জানিবা কাড়িয়া লয়॥" (১১৫১)

"হেন মনে লয শুন গো সখি।
নয়ান গোচরে সদাই রাখি॥
দোঁহু রূপখানি করিয়া ফুল।
পরিএ যতনে শ্রবণ মূল॥
চাহি ঘনে ঘনে যখন সাধ।
নিকরুণ ধাতা কর্য়াছে বাদ॥
কুলের কামিনী কুলের ঝি।
বিহি নিকরুণ করিব কি॥
দারুণ গৃহেতে রহুয়ে যেই।
কাল সাপ মাঝে বসতি সেই॥" (১১৫২)

সমস্ত প্রকৃতি এই রাসলীলার আনন্দের অংশভাক্ হইয়াছে। পশু-পক্ষী

জগতে অনুরূপ আনন্দের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রভাত হওয়াতে গোপীগণ বিদায় মাগিয়াছে ও মঞ্জরীগণ ছাড়া সকলেই গৃহে ফিরিয়াছে।

(৭)

১১৫৬—১১৬৫ পদে নায়কের অচৈতন্য অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণের বিদায়ের পর বিরহব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। মঞ্জরীগণ ললিতাকে সংবাদ দিলে ললিতা আবার কুঞ্জে ফিরিয়া বিরহতাপ-প্রশমনের সাধারণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় পূর্বরাগ-উদ্দীপক, পঞ্চগুণোপেত গন্ধরাজ ফুল শ্রীকৃষ্ণের নাসারন্ধ্রে ধরিয়াছে। ফুলের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নায়কের চেতনা-সঞ্চার হইয়াছে এবং ললিতা ও কৃষ্ণ উভয়েই গৃহে ফিরিয়াছেন। এই সমস্ত রসলীলা যশোদার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নায়কের পর এইবার নায়িকার অচৈতন্যের পালা। ১১৬৬-১১৭৩ পদে এই পালার বিবৃতি। শিখিনৃত্য ও তাহার বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া গৃহে সদ্য-প্রত্যাগতা রাধার চৈতন্য লোপ হইয়াছে। কুটিলা মন্ত্রজ্ঞা কোন 'চেতনী'কে আনিবার আদেশ দিয়াছে। ললিতা বড়াই-এর নাম উল্লেখ করায় প্রিয়ম্বদা তাহাকে আনিয়াছে। বড়াই ভিতরের রহস্য সবই জানে; সে কানে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করিতেই রাধিকার মূর্ছাভংগ হইয়াছে। রাধা আবার সখীগণের সংগে যমুনা-স্নানে গিয়াছেন। ১১৭২ পদে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় বড়াই-এর মধ্যবর্তিতার উল্লেখ ও তাহার সহিত পুর্ণমাসীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পদে রসপুষ্টির জন্য মিলন-সংঘটনকারিণী ও উপদেষ্ট্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য খুব কৌতূহলোদ্দীপক।

"দান ছলে বড়াই হইতে আনাগোণা।
কানাঞি মিলায় আনি যত ব্রজাঙ্গনা॥
বড়াই রসের তরু দোঁহে বসাইয়া।
দান-কেলি-কুমুদিনী (?) কহিয়াছি ইহা॥
রসে রস পর্য্যায় (?) হয় রসপোষ্টা লাগি।
লবণ বিহীনে জিহ্বা কান্দে তার লাগি॥
রস বিনে রসিক নহিলে কিছু নয়।
তেমত পরোক্ষ-রস জানিহ নিশ্চয়॥

রসের সারয় হয় শ্রীরাধিকা প্রেয়সী।
তাহাতে লবণ হয় এই পূর্ণমাসী॥
দোঁহার মিলন-কর্ত্তা তুহুঁ রসে ভোক্তা।
দোঁহার মাধুরী-গুণ জানেন সর্ব্বথা॥
অষ্ট-রস বর্ণনা আছে রসের পর্য্যা(য়ে)তে।
রসে রসে পদাবলী লিখিয়ে সাক্ষাতে॥
অন্য-উপদেশ রস চৌষট্টি হইতে বাড়া।
উপদেশ না হইলে কহে পংক্তি-ছাড়া॥
মুখ্য চৌষট্টি হয়ে উপদেশ বহু।
অতএব রসপোষ্টা অন্যরস কঁহু॥
কহিবেন ভকতগণ এথানে বড়াই।
ইহার অনেক গুণ চণ্ডিদাস গাই॥" (১১৭২)

বড়াই-এর সহিত লবণের তুলনা, মধুররসপ্রধান প্রেম-বর্ণনায় স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য মিলনকারিণীর প্রবর্তন ও মুখ্য চৌষট্টিরসকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আনুষঙ্গিক উপদেশ প্রভৃতি পরোক্ষ-রসের প্রয়োজনীয়তা—আলংকারিক আলোচনা হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য।

১১৭৪-১১৮০ পদে শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া সুবলের নিকট নিজ মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন। সুবল সান্ত্বনা-প্রসংগে স্বপ্নদর্শনের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। ১১৭৪ ও ১১৭৫ পদে চণ্ডীদাসের পূর্ব পদের সংগে ভাষা, ভাব ও উপমামূলক এমন আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, যাহাতে আখ্যায়িকা-রচয়িতার ঐক্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়িত প্রমাণ মিলে।

"স্বপন আপন না হয় কখন
সকল মিছাই বাসি।" (১১৭৫)

স্বপ্নের অবাস্তবতা প্রমাণের জন্য এইরূপ মন্তব্য পুনঃ পুনঃ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

"ভাবিতে সঘনে দেখিয়ে নয়নে
শুনহ উত্তর বাণী।
ভৃঙ্গ পোক সম কহি তরতম
শুন সখা গুণমণি॥

ভৃঙ্গরাজ যেন ধরে কীট আন
বিন্ধয়ে আপন মনে।
বিন্ধিতে সে কীট হঞা যায় লট
চাহিতে তাহার পানে॥
দেখি সেই ভৃঙ্গ সেই কীট মরে
রাখয়ে আপন স্থানে।
যদবধি নহে তার সেই দেহ
তদবধি সেই ধ্যানে॥" (১১৭৬)

ঠিক এই উপমাটিই গ্রন্থের প্রারম্ভের দিকে ৬৪ সংখ্যক পদে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আখ্যায়িকার প্রথম ও শেষের দিকের রচনা যে একই ব্যক্তির তাহা সন্দেহাতীত।

সুবলের পরামর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটের দিকে ধেনুপাল লইয়া গিয়াছেন ও সেখানে স্নান-রতা রাধার সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহার স্বপ্ন-দর্শনজনিত মানসিক উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা আবার মুগ্ধ-বিবশা হইয়াছেন ও বংশীবাদকের পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এই পরিচয়-জিজ্ঞাসা আখ্যায়িকার দিক হইতে সম্পূর্ণ নিরর্থক; কেননা ইহার পূর্বে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অন্ততঃ শতবার মিলন সংঘটিত হইয়াছে। ইহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে কবি আখ্যায়িকার বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া এখন কেবল ধারাবাহিকতাবিহীন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালার মধ্য দিয়া রসঘন মুহূর্তের আস্বাদনে ব্রতী হইয়াছেন। আখ্যায়িকার মানদণ্ডে আর কবির বিচার চলিবে না। তীরের বন্ধনরজ্জু কাটাইয়া কবি এখন ভাবসমুদ্রে পাড়ি দিতে চলিয়াছেন।

"হেদে গো সজনি শুন মোর বাণী
তোমারে শুধাই ইহা।
কি নাম ইহারি কহ না উত্তর
শুনি জুড়াউক হিয়া॥
কিবা সে মূরতি বরণ সুছান্দ
নবীন মেঘের প্রায়।
তাতে বনমালা কিবা করে আলা
শিখিপুচ্ছ উড়ে বায়॥

মোহন মুরলী কি জানি বাজয়ে
হেন মনে লয় বাঁশী।
বিনি মুলে পায়ে বিকাইয়ে তায়
ও পদে হইয়া দাসী॥
কিবা সে কটাক্ষ চাহনি দেখিতে
হেন মোর মন হয়।
হিয়ার মাঝারে সদা ভরি রাখি
দীন চণ্ডিদাস কয়॥" (১১৭৮)

শ্রীকৃষ্ণের পর রাধার স্বপ্নদর্শন (১১৮১-১:৮৯)। রাধা সখিকে নায়কের সহিত স্বপ্নে মিলনের ও তাঁহার অতুলনীয় আদর-সোহাগের কথা জানাইতেছেন। আশ্লেষ-সুখের মধ্যে কোকিলের ডাকে তাঁহার নিদ্রাভংগ হইল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তুলনীয়)। "দারুণ কোকিলী" বাক্যাংশটি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিধ্বনি। নায়িকা কয়েকটি পদে কোকিলের প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। সখী রাধাকে আশ্বাস দিয়া আবার তাঁহাকে যমুনা-স্নানে লইয়া গিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে কয়েকটি পদ প্রকৃত-পক্ষে রসোদ্গার-পর্যায়ভুক্ত।

"এমন পিরিতি সুখের আরতি
না দেখি কোনহ ঠান।
শুন গো সজনি পরম বেদনি
ইহাতে নাহিক আন॥
আমার পায়ের বঙ্করাজখানি
সিজেতে পড়িয়াছিল।
নেতের আঁচলে মুছিয়া নাগর
আমার চরণে দিল॥
আপন গলার হার মনোহর
আমার গলায় দিয়া।
হরষিত হয়্যা বাঁশি করে লয়্যা
তুরিতে চলল গিয়া॥
হেনক সময় দারুণ কোকিলী
সুস্বর মধুর গানে।

তা শুনি আমার নিন্দ দূরে গেল
উঠিয়া বৈঠনু মেনে ॥
কেহ কতি নাঞি না দেখি সে ঠাঁঞি
পাইল বড়ই মোহে।
সেই হত্যে মোর সুখ নাহি গায়
আনচান করে দেহে ॥

*　*　*

নব ঘনশ্যাম রূপ নিরখিতে
যে মোর করিল বাধা।
আক্ষটি[1] হইয়া বধিএ সেজনে
মনে অনুমানি সদা ॥" (১১৮৪)

১১৯০—১২০২ পদে তুষ্যতা (?) ও বিকলারূপ আলোচিত হইয়াছে। ১১৯০—১১৯৭ পদে রাধা নিজগৃহে কৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন ও প্রভাতে নায়ক-সমীপে দূতী প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সেই মামুলী কৈফিয়ৎ—চোরা গাইএর বন্ধন ছিঁড়িয়া পলায়নের জন্য তিনি নায়িকার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এই পদগুলি তুষ্যতা (?) রসের উদাহরণ। ১১৯৮—১২০২ পদে শ্রীমতী কৃষ্ণের জন্য কুঞ্জপ্রয়াণ করিয়াছেন—এমন সময় রতনমঞ্জরী সংবাদ দিল যে কৃতাভিসার নায়ককে পথিমধ্যে অন্য কোন রমণী দূতীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ইংগিতে রাধার অভিমান প্রবলতর হইয়াছে। ইহাকে বিকলা-রস সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। অলংকার শাস্ত্রানুসারে এই পদগুলি বিপ্রলম্ভ ও উৎকণ্ঠিত রসের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য বোধ হয় যে কবি দ্বারা উল্লিখিত তুষ্যতা (!) ও বিকলা রস এই দুই প্রধান ও সুপরিচিত রসের প্রকারভেদ মাত্র। সে যাহাই হউক পদগুলিতে কবিত্বশক্তির অপ্রাচুর্য নাই।

নিম্নলিখিত পদাংশগুলিতে নায়কের সহিত মিলনের অভাবে রাধার চিত্ত-বিকার বর্ণিত হইয়াছে।

"খেনে উঠ খেনে বৈঠহ ঠায়। মলিন হইল গউর গায় ॥
ক্ষেণেক নাসায় নিঃশ্বাস পড়ে। নাসার বেসর খসিয়া পড়ে ॥

১। ব্যাধ।

এক দিঠি পানে চাহিয়া রও। খেনেক খেনেক অবশ হও ॥
অঙ্গের ভূষণ দূরেতে ডার। যেমত বাতাসে খসিয়া পড় ॥
কি হেতু ইহার বলনা দেখি। কহ কহ শুনি কমল মুখি ॥
ভিজল বসন নয়ন জলে। সিন্দুর মুছিলে আপন ভালে ॥”(১১৯২)

“নিশি আধ গেল জাগিয়া পোহাল
না আসে পরাণ-নাথ।
অধিক বিরহে বিকল পরাণ
বুকে দিয়া দুটি হাত ॥
চরণের সাথে বেড়ে ফণিরাজে
নূপুর করিয়া মানি।
কুলিশ পড়ল কত শত তাহা
কিছুই নাহিক জানি ॥
গুরুর বচন গৌরব গভীর
ঠেলিলু চরণ দিয়া।
বহু সাধে হেদে কুঞ্জেতে আয়ল
না মিলে রসিক পিয়া ॥
যাহারে ভজন তারে না পায়ল
বিফলে গোঙানু নিশি।
কোন কলাবতি সুঘড় যুবতী
বঞ্চল হেনক বাসি ॥
মনোরথ কাম সেহ ভেল বাম
বিকল হইলা ধনি।
চণ্ডিদাস কয় হেন মনে লয়
আমি সে সকল জানি ॥” (১১৯৮)

“কাহার কারণে বেণীর বন্ধানে
করিল বেশের ঘটা।
বিঘটিত ভেল তাহার মিলন
সে পথে পড়ল কাঁটা।

সাজল কাজল সে ভেল বিফল
সে যেন গরল হেন।
মলয় চন্দন পবন-পরশে
গরাসে হুতাশ যেন॥
গলে গজমতি হার মনোহর
সে ভেল ভুজঙ্গ যৈছে।
করের কঙ্কণ— গরাসল রাহু
আমারে লাগল তৈছে॥
সিঁথার সিন্দুর সে রবি কিরণ
অধিক উত্তাপ হয়।
নীলের বসন আন্ধার যেমন
দেখিয়া লাগয়ে ভয়॥
কিঙ্কিণী-কলনা বড়ই বেদনা
মদন তাহাতে মাতি।
চরণে নূপুর বাজিত মধুর
সে ভার হইল অতি॥
সিজ যেন লাগে কণ্টক সমান
শুইলে ছেদয়ে গায়।
বিকল পরাণ নাহি শুনে আন
দীন চণ্ডিদাস গায়॥"

এই পদ ও অন্যান্য উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে কি চণ্ডীদাসের সরল, মর্মস্পর্শী সুর-ঝংকার শোনা যায় না! ১২০২ পদে বনপাশ পুঁথি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই আবিষ্কারের ফলে মণীন্দ্রবাবুর পদ-বিন্যাস-রীতির কিরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া বিধেয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

(৮)

কিন্তু তৎপূর্বে মণীন্দ্রবাবুর সংকলিত পদাবলীর শেষের কয়টি পদ হইতে (১৮৬১-৬৫, ১৯০৩-১৯০৭ ও ১৯৯৯-২০০২) আখ্যায়িকার গতি সম্বন্ধে কিরূপ ইংগিত পাওয়া যায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৬১-১৮৬৫ পদে নায়কের সহিত নায়িকার মিলনের জন্য সুবলের নূতন কৌশল অবলম্বনের

কথা আছে। এই কৌশল নীলরতনবাবু সম্পাদিত চণ্ডীদাসে বর্ণিত কৌশলের প্রকারভেদ মাত্র। প্রথমবার সুবল দশ অবতারের চিত্রাভিনয় করিয়াছে; এবার সেই গুলিকেই পটে অংকিত করিয়া দেখাইয়াছে। ১৮৬৪-১৮৬৫ পদে বর্ণনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও মূল পরিকল্পনার ঐক্য রচয়িতার অভিন্নত্বের সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য অনুকরণের সম্ভাবনা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ১৯০৩-১৯০৫ পদে সুবলের কৃষ্ণকে বনদেবতারূপে প্রচার ও তাহার কৌশলে বন-ভূমিতে নায়ক-নায়িকার নির্জন মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এই বনদেবতারূপে কৃষ্ণের পরিচয়দানের কথা বনপাশ পুঁথিতে ৮৯৩-৯৩২ পদে উল্লিখিত দেখা যায়। সুতরাং এখানেও পরিকল্পনার ঐক্য। পূর্বরাগ, নবোঢ়া-মিলন প্রভৃতি পূর্বোদ্ধৃত আলংকারিক পরিভাষার পুনরুল্লেখও ঐ একই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। তবে এই পদগুলি খণ্ডিত ও নীরস-বিবৃতি-প্রধান বলিয়া ইহাদের মধ্যে কবিত্বের অপ্রাচুর্য লক্ষিত হয়। একই বিষয়ের পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তিও কাব্যোৎকর্ষহীনতার কারণ হইতে পারে। ১৯০৬ পদে রাজা পরীক্ষিত, ব্যাসদেব, শুক, পিক প্রভৃতি অনেক নূতন বক্তা ও শ্রোতার প্রবর্তন ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত, গরুড় পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ গ্রন্থারম্ভের কল্পনা-শক্তিবর্জিত, শুষ্ক পৌরাণিক আখ্যানের অনুসরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ও আখ্যায়িকা-চক্রের এক নূতন আবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত করে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর ইঞ্জিনের মধ্য হইতে যেমন একপ্রকার কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ নির্গত হয়, দীর্ঘ-ভ্রমণ-শ্রান্ত কবির কাব্যরথচক্র হইতেও সেইরূপ অমসৃণ, ছন্দোসুষমাহীন, তথ্যকংকর-পেষণের ঘর্ঘর-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মণীন্দ্রবাবু অনুমান করেন যে ১৯০৭ পদ হইতে প্রেমবৈচিত্ত্য-পর্যায়ভুক্ত আক্ষেপানুরাগের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে ও ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক শেষের চারিটি পদ তাঁহার এই অনুমানের সমর্থন করে। আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে কবিত্বশক্তির যথেষ্ট অবসর আছে ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ এই সম্বন্ধে রচিত। সুতরাং হয়ত এই বিষয়ে কবির গীতি-প্রতিভার আবার নূতন স্ফুরণ হওয়া অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তি-সূচক শেষ চারিটি পদকে উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। ২০০২ পদে ব্যাধ-বাণ-বিদ্ধ হরিণীর উপমা দীন চণ্ডীদাসের পুঁথিতে বারংবার লক্ষিত হয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত পুঁথিটি যে একই হাতের রচনা তাহার প্রমাণ সন্দেহাতীত। ১২০৩ হইতে ১৮৬০ পর্যন্ত এই যে ৬৫৮টি পদের বিরাট ছেদ তাহা কবি কিরূপে পূরণ করিয়াছিলেন

তাহা অনুমানেরও কোন উপায় নাই—চক্রাবর্তনরীতিতে একই বিন্দু পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে পারে। আক্ষেপানুরাগের অনেক পদও এই ফাঁকে অনায়াসে বসান যায়। যাহা হউক আজ পর্যন্ত যে উপকরণ হস্তগত হইয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি যে অব্যাহতভাবে ক্রমোন্নতিশীল তাহা বলা যায় না—কবিত্ব-গ্রামের আরোহণ-অবরোহণ-প্রবণতা তাঁহার কবিত্বশক্তির চূড়ান্তবিচারকে দুরূহ ও সংশয়-জড়িত করিয়াছে।

এই পুঁথির আলোচনায় ভণিতা বিষয়ে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি নাই। কেননা, যেখানে রচয়িতার ঐক্য সম্বন্ধে প্রমাণ যথেষ্ট, সেখানে ভণিতার বিভিন্নতার কোন মূল্য নাই। তথাপি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কোন ভণিতা কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ দিতেছি। ৩১০-১২০২ পদের মধ্যে 'দীন' ৮৮ বার, 'দ্বিজ' ৭ বার ও 'দীনক্ষীণ' ১৩ বার প্রযুক্ত হইয়াছে—বাকী পদে বিশেষণহীন কেবল 'চণ্ডীদাস'। 'বড়ু' বা 'বাসলী'র উল্লেখ পুঁথিমধ্যে একবারও পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে 'দীন', 'দ্বিজ', 'দীনক্ষীণ' প্রভৃতি অভিধান নামের অংশ নয়, লেখকের জাতি ও বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের দ্যোতক মাত্র। যখন অধিকাংশ পদে কবি নিজেকে কেবল 'চণ্ডীদাস' নামেই পবিচিত করিয়াছেন, তখন ভণিতা-বৈচিত্র্যের অজুহাতে বিভিন্ন কবির পরিকল্পনা নিছক কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ ভণিতা-সংযোজনার বৈশিষ্ট্য কতটা কবির নিজের অভিপ্রেত, কতটা বা লিপিকারের প্রমাদ বা স্বেচ্ছাচার তাহা যখন অভ্রান্তভাবে নিরূপণের কোন উপায় নাই, তখন একই কবির নাম-সংযুক্ত বিভিন্ন ভণিতার প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

(৯)

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের সহিত বনপাশ পুঁথির সম্পর্ক নিম্নলিখিত তুলনামূলক লোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে।

দ্রবাবুর সংস্করণ	বিষয়	আকর	বনপাশ পুঁথি
ম খণ্ড পদসংখ্যা		সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, ১৯৪৯ নং	
১-৬৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	৺ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত।	

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ	বিষয়	আকর		বনপাশ পুঁথি
৬৩-১০২	শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭৫৯ নং পুঁথি—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক আবিষ্কৃত।		
	রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পূর্বরাগ বাদ গিয়াছে।			
১০৩-১৯২	„ গোষ্ঠলীলা	নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস পদাবলী হইতে সংগৃহীত।	মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের=	বনপাশ পুঁথিতে
১৯৩-২২২	অক্রূরাগমন	„	২০৯-২১৭	৩১০-৩১৮
২২৩-২৪২	যশোদা বিলাপ ও	„	২১৮-২৩৩	বনপাশ পুঁথিতে
	গোপ বিলাপ	„	২৩৪-২৪২	„ ৩৩৪-৩৪২
			২৪৩এর প্রারম্ভ-২৫৮ শেষ,	বনপাশ পুঁথিতে
			২৫৯-২৭৬	„ ৩৫৯-৩৭৬
২৪৩-২৭৬	ছত্রিশ অক্ষরের করুণা		২৭৭-২৯০	„ ৩৭৭-৩৯০
২৭৭-২৯০	রাখাল বিলাপ		২৯১-৩১৩	„ ৩৯১-৪১৩
			৩১৪-৩৩৮	„ ৪১৪-৪৩৮
২৯১-৩১৩	গোপী বিলাপ		৩৩৯-৩৬০	„ ৪৩৯-৪৫৪
৩১৪-৩৪০	কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন		৩৬১-৩৮৬	„ ৪৫৫-৪৭৪
	কংসবধ ও নন্দবিদায়		৩৮৭-৪২১এর	
			পরিবর্তে	৪৭৫-৪৭৯
৩৪১-৩৪৯	যশোদার শোক			সংখ্যাক নূতন
৩৫০-৪২১	রাধিকার শোক, কৃষ্ণের নিকট সখী প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণ ও সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তর, মিলন, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি	চণ্ডীদাসের কতকগুলি কৃষ্ট পদের বিন্যাস।		

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ	বিষয়	আকর	বঃ পুঁথি	বিষয়
দ্বিতীয় খণ্ড, পদসংখ্যা ৪৮০—৫০২	পিরীতির উৎপত্তি ও প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত	২৩৮৯ ও ২৯৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি	৪৮০—৪৯৯ পদের পঞ্চম পংক্তি [৪৯৯—৫১৭ পদের প্রথমার্ধ পুঁথিতে নাই]	ঐ
৫০৩-৫৪৬	মাথুর বিরহ ও উদ্ধব সন্দেশ	২৯৪ পুঁথি	৫১৭-৫৪৬	ঐ
			৫৪৭-৫৫১	অতিরিক্ত

।সংস্করণ	বিষয়	আকর	বনপাশ পুঁথি	বিষয়
।-৬৩৪	রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট হংসদূত প্রেরণ	২৩৮৯ পুঁথি	নাই	
১২-৬৭২	রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট কোকিলদূত প্রেরণ	"	নাই	
২-৭২৬	মথুরায় কৃষ্ণের সহিত সুবলের মিলন	"	৭৩২	সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্তন
			৭৩৩-৭৪৪	রাধা বিরহ
			৭৪৫-৭৯০	রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট পবনদূত প্রেরণ ও পবনের প্রত্যাবর্তন।
			৭৯১-৮০০	রাধা বিরহ।
			৮০১-৮০৫	ললিতার মথুরা-গমন ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে মথুরা-নাগরীদের ভাব-বিপর্যয়।
			৮০৬-৮৯২	ভ্রমর-দৌত্য ও পরকীয়া তত্ত্ব-প্রতিপাদন।
			৮৯৬-৯৩২	পূর্বরাগ
			৯৩৩-৯৬২	নবোঢা, বাসক-সজ্জিতা ও উৎকণ্ঠিতা নায়িকার বর্ণনা।
			৯৬৩ ৯৮০	পদ নাই।
		নাই	৯৮১-৯৮৫	মনঃ-শিক্ষা, রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রতিপাদ
			৯৮৬-১০০০	রসোদ্গার
			১০০১-১০১৬	বিপ্রলব্ধরস
:-১০৫১	গৌণরাস	২৩৮৯ নং পুঁথি	১০১৭-১০৮৫	নাই
			১০৮৬-১০৯১	গৌণরাস-অন্তর্গত বর্ষাভিসার শেষ; জ্যোৎস্নাভিসার আরম্ভ।
৭-১০৭৯	গৌণরাসে রাধা-কৃষ্ণের মিলন		১০৯২-১০৯৪	মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১০৭৭-১০৭৯এর সহিত অভিন্ন

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ	বিষয়	আকর	বনপাশ পুঁথি	বিষয়
১০৮০-১০৮৪	মহারাস	২৩৮৯ নং পুঁথি ও নীলরতনবাবুর পদাবলী সংগ্রহ	১০৯৫-১১০০	
নাই			১১০০-১১০৩	মহারাস শেষ
			১১০৪-১১১৯	স্বয়ং দৌত্য; রাধার ও সখিবেশে কৃষ্ণ মানভঞ্জন; নর্ত্তক-রাস
			১১২০-১১৩২	হাস্যরস—বংশীহরণলী
			১১৩৩-১১৩৯	জল কেলি
			১১৪০-১১৫৫	ঝুলনরাস
			১১৫৬-১১৬৫	শ্রীকৃষ্ণের অচৈতন্য
			১১৭৪-১১৮০	শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন
			১১৮১-১১৮৯	শ্রীরাধিকার স্বপ্নদর্শন
			১১৯০-১২০২	দুষ্যতা ও বিকলারস (বিপ্রলম্ভ ও উৎকণ্ঠিত প্রকার-ভেদ বলিয়া মনে হ
				এইখানে বনপাশ পুঁথির পরিসমাপ্তি
১৮৬১-১৮৬৫	পূর্ব্বরাগ	২৩৮৯ নং পুঁথি		
১৯০৩-১৯০৫	সুবলের কৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন	„		
১৯০৬	পূর্ব্বরাগ, নবোঢ়া ও সুবল-মিলন শেষ ও যুগল মধুর রস আরম্ভ	„		
১৯০৭	রাধাকৃষ্ণের চাঁপাবনে মিলন—তাহা হইতে বিপ্রলম্ভরসোৎপত্তি	„		
১৯৯৯-২০০২	আক্ষেপানুরাগ	„		

এই আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিস্ফুট হইতেছে ঃ—

প্রথম খণ্ড

(১) মণীন্দ্রবাবুর অনুমিত প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ পদ বনপাশ পুঁথির দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

(২) মণীন্দ্রবাবুর ৩৮৭-৪২১ অর্থাৎ ৩৫টি পদের পরিবর্তে বনপাশ পুঁথিতে মাত্র ৪৭৫-৪৭৯ অর্থাৎ ৫টি পদ মিলিতেছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর অধিকাংশ অনুমান-বিন্যস্ত পদ আখ্যায়িকার ক্রম-বহির্ভূত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

মিলন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলি আখ্যায়িকার বর্তমান স্তরে অপ্রযোজ্য দাঁড়াইতেছে।

(৩) মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ ও বনপাশ পুঁথির পদগুলির ক্রমিক সংখ্যা তুলনায় বোঝা যাইতেছে যে শেষোক্ত পুঁথিতে চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার যে আভাস মিলে তাহাতে প্রায় ১০০ পদ বেশী আছে। এই সিদ্ধান্ত আখ্যায়িকার যথাযথ বিন্যাস ও পরিণতির দিক দিয়া যুক্তিসংগত মনে হইতেছে। পূর্বরাগ, প্রথম মিলন ও রাসলীলা সংক্রান্ত পদগুলি মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই এবং এই পদগুলির সংখ্যা ১০০ অনুমিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭১-৭১৩ ও ৫৪৪-৬৭৫ পদের প্রয়োজনীয় অংশ এই ছেদ-পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১) মণীন্দ্র বাবুর সংস্করণ ও বনপাশ পুঁথি উভয়ত্র নিঃসন্দেহে একই উপাখ্যান অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে ৭২২-৭২৬ পদে কৃষ্ণের সহিত সুবলের মিলন ও দ্বিতীয়ে ৭৩২ পদে সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্তন বিবৃত হইয়াছে। এই দুই ঘটনা একই উপাখ্যানের অংগ। আবার প্রথম গ্রন্থে ১০৪৫-১০৫১ পদে দিবাভিসার ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন-সংকেত বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ঠিক পরে পুঁথিতে—১০৮৬-১০৯৪ পদে সেই গৌণরাসের অন্তর্গত আরও কয়েকটি লীলা—যথা বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ও ১০৯৫ (সংস্করণের ১০৮০) পদে গৌণরাসের পরিসমাপ্তি ও মহারাসের আরম্ভ উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই মধ্যবর্তী অপ্রাপ্ত পদগুলিতেও যে একই বিষয়ের আলোচনা আছে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

(২) পুঁথিতে ৮৯২ পদ পর্যন্ত মাথুর বিরহ ও নানাবিধ দৌত্য-প্রেরণ আখ্যাত হইয়াছে। ৮৯৩ পদ হইতে আখ্যায়িকার অগ্রগতি বন্ধ হইয়া পূর্বস্মৃতি—পর্যালোচনার পালা আরম্ভ হইয়াছে। আবার পূর্বরাগ, প্রথম-মিলন, বাসক-সজ্জিতা ও উৎকণ্ঠিতা নায়িকার বর্ণনা, বিপ্রলম্ভরস, রসোদ্গার, গৌণ ও মহারাস ইত্যাদি পূর্ব-বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাইতেছে। ১৮৬১ পদ হইতে তৃতীয়বার পূর্বরাগ, সুবলের সাহায্যে নায়ক-নায়িকার মিলন,

নবোঢ়ারস ইত্যাদির আলোচনা চলিয়াছে। কাজেই অগ্রগতির পরিবর্তে চক্রাবর্তন, আখ্যায়িকার পরিবর্তে রসের ও ভাবের বিচ্ছিন্ন আলোচনা—ইহাই পুঁথির শেষ দিকের বিশেষত্ব দাঁড়াইতেছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর একটি প্রধান সিদ্ধান্ত—আখ্যায়িকার মানদণ্ডে পদাবলীর অকৃত্রিমতার বিচার—ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন যে কোনও বিচ্ছিন্ন, ভাবপ্রধান পদ উপাখ্যান-সূত্র-গ্রথিত না হইলেও চণ্ডীদাসের বলিয়া দাবী করা চলিবে। আখ্যায়িকার রজ্জু গলায় বাঁধিয়া তাঁহার গীতি-কবিতার শ্বাসরোধের চেষ্টা অসমর্থনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পূর্বরাগের আখ্যান-অংশ প্রত্যেকবার পুনরাবৃত্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছে—তিনবার আমরা তিন বিভিন্ন প্রকারের তথ্যগত বিবরণ পাই। কাজেই আখ্যায়িকার প্রতি আনুগত্য চণ্ডীদাস-কাব্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ-নীতি নহে ইহা পুঁথির প্রমাণ বলে জোর করিয়া বলা যায়।

(১০)

এখন আর একটি শেষ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুঁথিতে যে চণ্ডীদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে ও পদাবলীর বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস, যাঁহার গানের সুর আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রাণ আকুল করিয়া আসিতেছে—এই দুইএর মধ্যে কি সম্পর্ক? ইহারা কি এক না বিভিন্ন? পুঁথিব পদগুলির বহুল উদ্ধার ও বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া এই প্রশ্নের যথাযোগ্য বিচার হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে এইটুকু সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে কবিত্বশক্তির দিক দিয়া আখ্যায়িকার ও পদাবলীর রচয়িতার মধ্যে যে দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান ছিল, বর্তমান আবিষ্কারের ফলে তাহা অনেকটা সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। দীন চণ্ডীদাসকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি বলিয়া আমরা বরাবর উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং বাস্তবিক তাঁহার রচনার যে নমুনা আমাদের নিকট উপস্থিত ছিল তাহাতে এইরূপ ধারণা যে অযৌক্তিক তাহা বলা যায় না। . পৌরাণিক ঘটনার শুষ্ক, রসহীন বর্ণনা, ভাষার শ্লথ-শিথিল বিন্যাস, কেবল ছন্দের পাদ-পূরণের জন্য অহেতুক বাক্যাবলীর বারংবার প্রয়োগ, অসংযত, পরিমিতিহীন বহুভাষিতা, একই বিষয়ের ক্লান্তিকর, পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি, ভাবসংহতি ও রস-গাঢ়তার অভাব—এ সমস্ত দোষই

তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই শিশু-সুলভ অর্থহীন কাকলীর কবি যে মহাকবি চণ্ডীদাসের সরল, মর্ম্মস্পর্শী, ভাব-ঘন পদগুলির রচয়িতা হইতে পারেন ইহা যেন আমাদের ধারণারও অগম্য। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসে আরোপিত পুরাতন ও নূতন পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রতীতি হয় তাঁহার দুর্বলতার বীজ ঠিক কবিত্বশক্তির দৈন্য অপেক্ষা পরিকল্পনার অনুপযোগিতার মধ্যেই নিহিত আছে। কোন কবি যদি সংকল্প করেন যে তিনি কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ও রাধাকৃষ্ণলীলার খুঁটিনাটি কিছুই বাদ না দিয়া প্রত্যেকটি ঘটনার উপর কবিতা লিখিবেন ও রসোদ্রেক অপেক্ষা ঘটনা-বিবৃতিই তাঁহার মুখ্যতর উদ্দেশ্য হইবে তবে তিনি যত বড় কবিই হউন না কেন তাঁহার অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী। 'ছত্রিশ অক্ষরের করুণা' একটা হাস্যকর বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ইহার দ্বারা হাস্যরস ছাড়া যদি কোন করুণ-রসের উদ্রেক হয় তবে তাহা কবির এই ব্যর্থ-প্রচেষ্টা-সম্বন্ধীয়। ইংরেজ কবি চসারও যীশুমাতার উপর A. B. C. নামধেয় বর্ণমালার অক্ষরানুযায়ী এক কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং সেই প্রচেষ্টার ফলও একরূপই হইয়াছিল। কবিত্বের রথ পথ-বিপথ, পাহাড়-জংগল, উপত্যকা-অধিত্যকা সর্বত্র চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার হোঁচট্ অনিবার্য।

তথাপি আমার মনে হয় যে দীন চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে এমন এক পরিণতিতে পৌছিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার পক্ষে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর রচয়িতা হওয়া অসম্ভব নহে। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা পাওয়া যায়। ইহাদের সুর, ভাব, উপমা ও রস-গাঢ়তা মহাকবির সর্বজন-পরিচিত পদগুলির কাব্যোৎকর্ষের সহিত তুলনীয়। চণ্ডীদাসের প্রথম শ্রেণীর পদ সংখ্যায় ৫০।৬০টির অধিক নহে। যদি আখ্যায়িকাকারের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায়, তবে এই ৫০।৬০টি পদের জন্য এক স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের গীতি-কবিতা—সংকলন-গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে এমন কি শেক্সপিয়ার, শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ণ, টেনিসন প্রভৃতি সর্বোচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্য-রচয়িতাদেরও কবিতার সহিত অসংখ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ও অল্লাধিক কয়েকটা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থে একত্র গ্রথিত দেখা যায়। সংকলনকারী অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবিতাই নির্বাচন করিয়া থাকেন—চণ্ডীদাসের তথা সমগ্র বৈষ্ণব-কবির

সম্বন্ধেও এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু সংকলন-গ্রন্থে অনুল্লেখের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। সুতরাং মহাকবি চণ্ডীদাসের নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা ছিল এবং আখ্যায়িকা-গ্রন্থের আবিষ্কার হয়ত সৌভাগ্যক্রমে সেই হারানো সূত্রটি আমাদের নিকট পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আশাকরি প্রবন্ধের মধ্যে অংশতঃ উল্লিখিত ও শেষে উদ্ধৃত পদগুলি হইতে পাঠকেরা এ বিষয়ে কিছু ধারণা করিতে পারিবেন।

(১১)

নিতান্ত সংকুচিতভাবে এই সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে গিয়া আমি চণ্ডীদাস-সমস্যার অসাধারণ জটিলতা মোটেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করিতেছি না। আখ্যায়িকার মধ্যে চণ্ডীদাস-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট পদগুলি একটিও এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ইহা পূর্বোক্ত অনুমানের আপাত-বিরোধী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আখ্যায়িকার ১২১০ হইতে ১৮৬০ বা ৬৫০র বেশী পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পদগুলি অনায়াসেই স্থান লাভ করিতে পারে। যদি সম্পূর্ণ পুঁথির আবিষ্কারের পরেও উক্ত পদগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত না দেখা যায়, তবে সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হইবে। ইহাও সত্য যে চণ্ডীদাস নামের অন্তরালে ছোট বড় অনেক কবি আত্মগোপন করিয়া আছেন; সুতরাং চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে অভিমত তাহার গঠনে চণ্ডীদাস ছাড়া অন্যান্য কবিরও প্রভাব থাকা সম্ভব। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস প্রভৃতি সমধর্মী কবির কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়া থাকিবে, সুতরাং তাঁহার শিরোদেশ হয়ত ঋণ-করা মুকুটের রশ্মিজাল-ভাস্বর হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত জটিলতার সূত্র স্বীকার করিলেও ইহা নিশ্চিত যে চণ্ডীদাস একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি ছিলেন; তাহা না হইলে খ্যাতি-লোলুপ অন্যান্য কবি তাঁহার বিরাট মহিমার নিকট আত্মবিলোপ করিবেন কেন ও অন্য কোন কোন শ্রেষ্ঠ কবির ন্যায্য গৌরব তাঁহাতেই বা আরোপিত হইবে কেন? সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পরের দ্রব্য সগৌরবে আত্মসাৎ করা দিগ্বিজয়ী বীরের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণের চক্ষে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব-কবিত্ব-মহিমার প্রতীক না হইলে অন্যের ঐশ্বর্য-সম্পদ রাজকরের ন্যায় তাঁহার প্রতিভা-বেদীমূলে সমর্পিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। দীপশিখা উজ্জ্বল না হইলে তাহাতে পতংগকুল ঝাঁপ দেয় না ; পূর্ণচন্দ্র-দীপ্তিতেই নক্ষত্রসমূহ আপন আপন রশ্মি মিশায়। মোট কথা, আমাদের অনুমান যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহা বৈষ্ণব-কাব্য-জগতে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করে।

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। যখন চণ্ডীদাস-সমস্যা জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন হইতে রমণীমোহন মল্লিক ও নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহগ্রন্থদ্বয়ে উপাখ্যানমূলক পালা-গান ও বিশুদ্ধ গীতি-ধর্মী পদ-সমূহ পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে কোন উৎকট অসামঞ্জস্য না পাঠক না সংকলনকারী কাহারও বিচার বুদ্ধিকে আঘাত করে নাই। উভয়বিধ রচনাই চণ্ডীদাসের বলিয়া নির্বিবাদে স্বীকৃত হইয়াছে।* হয়ত তাঁহারা একই আকর-গ্রন্থে দুই রকম পদই পাইয়াছিলেন, অথবা নূতন পালা-গানগুলি পূর্ব-পরিজ্ঞাত বিখ্যাত পদাবলীর সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বিষয়ক পদগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বে রমণীবাবু বা নীলরতনবাবুর সংগ্রহগ্রন্থে কতকগুলি পদ কবিত্বশক্তিতে নিকৃষ্ট ও চণ্ডীদাসের নামের সহিত জড়িত হইবার অযোগ্য এরূপ আপত্তি কখনও উত্থাপিত হয় নাই। আখ্যায়িকার প্রারম্ভসূচক পদগুলির আবিষ্কারের সংগে সংগেই এইরূপ সন্দেহ প্রথম মাথা তুলিল। এরূপ সন্দেহ যে স্বাভাবিক তাহা ঠিক ; পদগুলির কাব্যগত অপকর্ষ কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু সেই কারণেই ইহা যে চণ্ডীদাস নামধেয় অপর এক নিকৃষ্ট কবির রচনা এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় না। হয়ত এগুলি কবির প্রথম বয়সের, কাঁচাহাতের রচনা ; হয়ত এগুলিতে পৌরাণিক উপাখ্যানের অন্ধ অনুসরণ ও বিবৃতিমূলক উপাদানের অতি-প্রাধান্য কবিত্বরস-বিকাশের অনুকূল হয় নাই। আখ্যায়িকার আগাগোড়া একই হাতের রচনা-চিহ্ন সুপরিস্ফুট ; বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোজক-সূত্রের অস্তিত্ব, ভাব, ভাষা, উপমা ও দার্শনিক তত্ত্বের সাম্য ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় এত অপটু ও দ্বিধা-কম্পিত-হস্ত, তিনিই রাসলীলা, মাথুর, বিরহ ও আক্ষেপানুরাগের পদে কবিত্বের অনেক উন্নততর পর্যায়ে পৌছিয়াছেন। এই ক্রম-পরিণতির প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, উভয় কবিকে অভিন্ন মনে

* ১৩৩৪ সালের ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ সন্দেহের একটা ইংগিত দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা স্পষ্টোক্তিতে পরিণত হয় নাই।

করার বিরুদ্ধে যে দুরতিক্রম্য বাধা সাধারণতঃ অনুভূত হইয়া থাকে তাহা অনেকাংশে অপসারিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আমার সিদ্ধান্ত মণীন্দ্রবাবুর সহিত এক। কিন্তু সিদ্ধান্ত অভিন্ন হইলেও আমাদের পারস্পরিক যুক্তিধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মণীন্দ্রবাবু আখ্যায়িকার অনুরোধে চণ্ডীদাসের সর্বোৎকৃষ্ট পদগুলি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছেন। আমার মতে এরূপ বিসর্জন অনাবশ্যক। চণ্ডীদাসের সমস্ত পদ, অন্য কোন বিরুদ্ধ দাবী প্রমাণিত না হইলে আখ্যায়িকার কাঠামোর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে এবং আখ্যায়িকার মধ্যেই এমন কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন আছে যাহাতে প্রথম শ্রেণীর পদগুলির জন্য স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য আমার যুক্তির সারবত্তা প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে একটি সর্তপূরণের উপর—তাহা হইতেছে এই যে নবাবিষ্কৃত পুঁথির মধ্যে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলির সহিত সুরসাম্য ও কবিত্বশক্তি-সামঞ্জস্যের যে অনুভূতি আমি পাইয়াছি, সুধী-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক রসবোধের দ্বারা তাহার সমর্থন। ঐই অনুভূতি যদি অসমর্থিত হয়, তবে তাহার নূতন সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইবার উপযোগিতা বহুলাংশে দুর্বল হইবে ইহা সর্বথা স্বীকার্য। সাহিত্য-সমস্যা বিচারে নানাবিধ গুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হইলেও, সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক রসবোধই শ্রেষ্ঠ সহায়। ইহাই প্রশ্ন-নিষ্পত্তির উচ্চতম বিচারালয়। সেই উচ্চতম বিচারাধিকরণের উপর চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়া তাহার অভিমত প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

(১২)

পুঁথিতে প্রাপ্ত কয়েকটি পদ নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। এইরূপ কবিত্ব-গুণসম্পন্ন অন্ততঃ ৪০।৫০টি পদ ইহাতে পাওয়া যাইবে।

"শুনহ মধুকর, তাঁহারে বলিব কোন কথা।
যেমত জলের মীন, জল-আচ্ছাদনে থাকে
ইদিক্ উদিক্ নাহি তথা॥
ধীবর দেখিলে যেন তরাসে কাঁপিয়া মরে
দাঁড়াইতে নাহি কোন স্থান।
বনের-হরিণী যেন বাউল হইয়া ফিরে
আন-বনে তেজয়ে পরাণ॥

অকূল সমুদ্র মাঝে মকর ডুবিয়া থাকে
এ কূল ও কূল নাহি পায়।
তেমত মকর সম পড়িলাম দরিয়াতে
সকলি তেমতি হেন প্রায়॥
সিন্ধু সেবিলুম (আশে !) পিয়াস যাইব দূরে
পিয়াস হইল দুগুণ বড়ি।
শীতল হইব বলি করিনু চাঁদের সেবা
তাহাতেও তাপ দুনু পড়ি॥
কল্পতরুর গাছ সেবিনু যতন করি
তাহা গেল ডালে মূলে ভাঙ্গি।
ছায়ার কারণ আউ রবির কিরণ পাই
বড়ই বিধাতা ইহ রঙ্গি॥
কত না কহিব দুখ কহিলে কি জানি হয়
কহিতে বিষম উঠে জ্বালা !
সে দুখ জানাব যারে সে গেল মথুরাপুরে
শরণ রহিল তরুতলা॥
কদম্ব কানন বন এখানে করিত কেলি
ঐ দেখ রাস-রস-লীলা।
এই দেখ বংশীবট যমুনা কানন বনে
এইখানে বসন হরিলা॥
এই দেখ ভোজন-থালি যজ্ঞ-পত্নী অন্নলয়া।
দুভাই খাইলে নিজ সুখে।
ঐ দেখ মাধবিলতা এখানে সঙ্কেত স্থান
করিত লালস অতি মোকে॥
ঐ দেখ করল রাস এইখানে অদেখ ভেল
যবে সে কহিল নিতে কান্ধে।
সবারে তেজিয়া পহু গেলা কতি প্রাণনাথে
গোপী কভু স্থির নাহি বান্ধে॥
এইখানে আসিয়া মেলি সকল গোপিনিগণে
হরষে ভেটল ঘনশ্যাম।

চণ্ডীদাস মুরছিয়া পড়ি রহে তা দেখিয়া
শুনিতে পুরব অনুপাম ॥" (৮৬৩নং পদ)

"ঘর হল্য কাল কানন সমান
গুরুজনা হল্য বিষে।
ভাবনা গণনা কালা জপমালা
নিবারণ পাব কিসে ॥
ঘুমাইলে দেখি কালার বরণ
শুইলে সোয়াস্তি নাঞি।
গমনে কালিয়া দেখিয়ে ভালিয়া
সতত সকল ঠাঁঞি ॥
হৃদয়ে কালিয়া দেখিএ সঘনে
মুদিলে নয়ন দুটি।
দেখিতে দেখিতে নয়নের জল
সঘনে সঘনে ছুটি ॥
দেখিতে সেরূপ রাখিব কোথাহ
থুইতে নাহিক ঠাঞি।
নয়নে না ধরে উথলিয়া পড়ে
হেন কভু দেখি নাঞি ॥
রূপ মনোহর কি মোহিনী সই
দেখিলে নয়ন ঢলি।
কিসে নিবারিব এ হেন পিরিতি
তুমি ভুলাইলে ভালি ॥
কালিয়া বরণ কি হল্য মরমে
সপনে দেখিএ কালা।
উঠিতে বসিতে দিক নেহারিতে
ঘেরল বিষম জ্বালা ॥
ভাবিতে ভাবিতে কালিয়া কানুরে
কালিয়া হইল তনু।

কিসে ভাল হবে কহ না উপায়
বেদনা হল সে তনু ॥
চণ্ডীদাস বলে পাইবে ঔষধ
কহিএ ওঝার বাড়ি।
পূর্ণমাসী ভাল প্রবীণ চেতনি
সেই সে কর্য্যাছে ডেড়ি ॥" (৯৪৯)

"হেদে গো সজনি সই।
তাহার কারণে সব তেয়াগিব
মরম-মরমি তুই ॥
সকল ছাড়ুক গুরু পরিজনা
কুলে তিলাঞ্জলি দিব।
শ্যামের লাগিয়া এ তনু রাখ্যাছি
মাণিক করিয়া নিব ॥
মাণিক করিয়া পদক গড়াঞা
হৃদয়ে পরিব গলে।
কারিগর কাছে গিয়া কুতূহলে
তাহাই বান্ধাব ভালে ॥
মাঝে নীলমণি তার চারি ধারে
রতন মাণিক বেড়া।
সেই রূপখানি তাহে নিরখিব
তিলেক নহিব ছাড়া ॥
হিয়াতে রাখিব কেহ না দেখিব
আপন মনেতে জানে।
কালরূপ খানি তাথে নিরখিব
লহেত আমার মনে ॥
শুনহ সজনি সো মোর পরাণি
শরণ লইল তায়।
এক আছে কথা বড় হিয়া ব্যথা
পরিণামে আছে ভয় ॥

এখন এমতি সরস বচনে
করিয়া প্রেমের লেঠা।
পরিণামে পাছে গরলের রাশি
পথে জানি হয় কাঁটা॥
যখন চলিএ সরাসরি বাটে
নয়ান মুন্দিয়া যাই।
পুন সেই বাটে আসিতে আসিতে
কণ্টক বাজয়ে পায়॥
মধুর গাগরি পিয়াস লাগিলে
খাইতে বড়ই সুখ।
সেই সে অমিয়া কোন ফল দিল
গরল সমান দুখ॥
কখন সময়ে শীতল বাতাস
কখন গরম (?) হয়।
কালের গতিকে দারুণ কুজন
কখন ভালুই নয়॥
বন্ধু একজন থাকয়ে বেথিত
পরাণ সোসর সেই।
একদিন কালে সেই বন্ধুজনা
রিপুর সমান হয় (?)॥
পরিণামে পাছে দুখের সাগরে
পড়িএ দরিয়া মাঝে।
পরের পিরিতি দেখিএ তেমতি
করার সময় কাজে॥
চণ্ডিদাস বলে পরিণাম গণ
কি তার করিছ ভয়।
হৃদয় মানসে বান্ধহ বন্ধুরে
মোর মনে হেন লয়॥" (৯২৯)

"হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়া থাকিএ
তবু সে হারায়ে কত।
মুখে মুখ ভরি রসিক মুরারি
মধু পীতে চাহে যত॥
হেন তার মন যৌবনের বন
হইতে চাহেন পাখি।[১]
ফুলে মধু খাঞা বুলএ ফিরিয়া
এই মনে লয় সাথি॥
রসের বাগানে রসের ফুলেতে
খাইতে রসের স্বাদ।
হেন তার চিত কহেন বেকত
তাহে গুরুজনা বাদ॥
নহি স্বতন্তর বিষ যেন ঘর
কি তার কহিব কথা।
নহে সে নাগরে হিয়ার ভিতরে
রাখিলে না হয় ব্যথা॥
হেন লয় চিতে বসি এক ভিতে—
তেজি পাষণ্ডির সঙ্গ।
বসাইয়া কাছে যত মন আছে
করিএ রসের রঙ্গ॥
হিয়া বিদারিয়া রাখিএ ভরিয়া
যেখানে পরাণ মোর।
মনের ডোরেতে বান্ধি এ বন্ধুরে
সদাই করিএ কোর॥
আঁখে রাখি যদি সেই গুণ-নিধি
না করে নয়ন-ব্যথা।
রূপ বেশ করি লঞা অঙ্গে পরি
নয়ন-অঞ্জন রাতা॥

১ জ্ঞানদাস তুলনীয়।

নহে সেইরূপ আনন্দের কূপ
বসনে বান্ধিয়া রাখি।
নিরন্তর যেন বিরলে বসিয়া
আল্যায়া (?) সে রূপ দেখি॥
এ সব বচন সখির সহিতে
কহেন সুন্দরী রাধা।
চণ্ডীদাস বলে লোকের কথায়ে
তাহে কি আছয়ে বাধা॥" (৯৯৮)

উপন্যাসের প্রকৃতি ও বিচার-পদ্ধতি

(১)

সম্প্রতি উপন্যাসের প্রকৃতি ও সমালোচকের পক্ষে ইহার আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বাদ-বিতণ্ডার অবতারণা হইয়াছে। যাঁহারা সাহিত্য-সমালোচনায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের পক্ষে উপন্যাসের মূল সূত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য এ বিষয়ে উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্ন, উপন্যাসের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা বিষয়ক। উপন্যাসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটা মূলগত ঐকমত্য না থাকিলে উহার পূর্বাভাস ও উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ খুব স্বাভাবিক। আমার 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় যে সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি ও যাহার মানদণ্ডে ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষের নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা মোটামুটি এইরূপ—উপন্যাস একরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত গল্প—ইহাতে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও বস্তুতান্ত্রিক চিত্রণের মধ্য দিয়া মানবপ্রকৃতি ও জীবনের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ গল্পের সংগে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহাতে ঘটনাবিবৃতি অপেক্ষা চরিত্র-স্ফুরণ ও জীবন-সমালোচনাই মুখ্যতর উদ্দেশ্য। গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের সনাতন ধর্ম এবং এক প্রকারের গল্প-সাহিত্য অতি প্রাচীন যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলিকে আমরা উপন্যাসের মর্যাদা দিই না, কেননা ইহাদের মধ্যে অলৌকিক উপাদানের প্রাধান্য, ঘটনাবিবৃতির মধ্যে আকস্মিকতা, চরিত্রসৃষ্টির অপ্রয়াস ও জীবন-সমালোচনার স্বল্পতা বিদ্যমান—অর্থাৎ এক কথায়, বাস্তবগুণের যথোপযুক্ত বিকাশ হয় নাই। কিন্তু ইহাদিগকে পূর্ণাংগ উপন্যাস বলা না চলিলেও, ইহাদের মধ্যে যে আংশিক বাস্তবচিত্রণের পরিচয় বা লেখকের অনেকটা অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রতি বাস্তবতাপ্রধান দৃষ্টিভংগীর যে ইংগিত মিলে, সেই জন্য ইহাদিগকে উপন্যাসের পূর্বসূচনারূপে গণ্য করিলে অন্যায় হয় না। আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে, উপাখ্যান-আখ্যায়িকায় এইরূপ অনেক বাস্তব-রস-প্রধান খণ্ডাংশ আছে—এগুলি উপন্যাসরচনা-প্রবণতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণীয়।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে এক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বাস্তব-ধর্মিতা উপন্যাসের বিশেষ ও অপরিহার্য লক্ষণ স্বীকার করিলে উহার আদর্শ "রসরূপের" প্রতি কি উপেক্ষা দেখান হইবে না? উপন্যাস যদি উচ্চাংগের সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে সৌন্দর্য-সৃষ্টি উহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে; জীবনের বিচিত্র, রসসমৃদ্ধ, সমস্ত তথ্যের নির্যাসরূপ এক অখণ্ড ঐক্য উহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতে বাধ্য।) ভূগর্ভস্থ মূলের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইলে পরিপক্ব ফল, পরিণত সৌন্দর্যের দাবী গৌণ হইয়া পড়িবে। সুতরাং উপন্যাসের পূর্বোক্তরূপ সংজ্ঞাই ভ্রান্তিমূলক।

এই আপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে স্মরণ করিতে হইবে যে, কি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, কি সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান—শিল্পকলা ও সমাজনীতির সর্বত্রই ক্রমবিবর্তনের ফলে মৌলিক উদ্দেশ্যের সহিত চরম পরিণতির একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান লক্ষিত হয়—কিন্তু তথাপি এই উভয় অবস্থার মধ্যে এক অখণ্ডনীয় যোগসূত্রের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বাস্তব প্রেরণা হইতে উপন্যাসের উৎপত্তি—এই সত্যকে তাহার ভবিষ্যতের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্যে অপ্রমাণ করা যায় না। সামাজিক ইতিহাসে বিবাহ-বন্ধনের মূল জৈব প্রয়োজন ও সমাজরক্ষার তাগিদ; কিন্তু বহু সহস্রবর্ষ ব্যাপী ক্রমপরিণতির ফলে আজ এই শুষ্ক, কঠিন প্রয়োজনবৃন্তের চারিদিকে কত সূক্ষ্ম, সুকুমার বিকাশের কুসুমরাজি সৌন্দর্য ও সুরভি বিকীরণ করিতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়া প্রভাবশীল। উপন্যাসের আবির্ভাবের প্রথম যুগে বস্তুতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব মনোবৃত্তিই পূর্ণমাত্রায় প্রকট। ক্রমশঃ ইহার রূপ ও গঠন-বৈশিষ্ট্য স্থিরীকৃত হইলে, কাব্যধর্মী মনোভাব, সূক্ষ্ম, কবিত্বময় অনুভূতি, জীবনের রহস্যময়, উঁচু সুরে বাঁধা ভাব-রাজি উপন্যাসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার বাস্তব ভিত্তির উপর নিজ আসন দৃঢ় করিয়া লইল। তা ছাড়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সংগে সংগে বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের ধারণারও বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে আমরা ইহার দ্বারা কতকগুলি স্থুল, প্রয়োজন-মূলক, সহজ-বোধ্য মনোবৃত্তিকেই বুঝিতাম। এখন ইহার গভীরতা ও পরিধি বিস্তৃত হইয়া ইহার মধ্যে প্রায় সমস্ত আদর্শ-লোকই, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্য, ও জটিল, ক্ষণিক, ধরাছোঁয়ার অতীত আশা-আকাংক্ষাগুলিই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাজেই পরবর্তী উপন্যাসের বাস্তববাদ ইহার প্রথম যুগের বস্তুতন্ত্রতার তুলনায় সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

২

এই পরিবর্তনের ধারাটি ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতেই উদ্ধার করা যায়। ইংরেজী উপন্যাসের আবিষ্কর্তা রিচার্ডসন মানব-জীবনের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে ইহার প্রাথমিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি-গুলিরই প্রাধান্য। তাঁহার হৃদয়-বিশ্লেষণে ছোটখাট সংঘাতের স্পন্দন অনুভূত হয়, সুদূর-প্রসারী গভীর আলোড়নের বিপুল তরংগ দোলা দেয় না। তাঁহার উপন্যাসের গঠনও আকার সংক্ষিপ্ত না হইলেও খুব আঁটসাট, প্রসার-শীলতার লক্ষণ-হীন (rigid), কেবল কাজের কথার ফ্রেমে বাঁধা। ফিল্‌ডিংএর হাতে ইহার অন্তঃ-প্রকৃতি প্রায় একরূপ থাকিলেও ইহার বহির্গঠন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। প্রাণের উচ্ছ্বসিত তরংগবেগে ইহার পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমারেখা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে; লেখকের রসিকতা, পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে সম্বোধন করিয়া তাহাব সংগে সহজ মৈত্রী-সম্পর্ক-স্থাপনের উদ্যম, তাঁহার প্রাণখোলা হাসি ও স্নিগ্ধ উদার মনোভাব উপন্যাসের আকৃতিতে একটা দিগন্ত-প্রসারিত উন্মুক্তির, অসীম সম্ভাবনার সূচনা আনিয়া দিয়াছে। ইহাদেরই সম-সাময়িক ষ্টার্নের হাতে আবার উপন্যাসের রূপে এক বিস্ময়কর অভিনবত্ব প্রবর্তিত হইয়াছে। ঘটনা বিবৃতির প্রয়োজন, ধারা-বাহিকতার শৃংখল লুপ্তপ্রায় হইয়া গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উদ্ভট খেয়াল ও কারুণ্য-রস-প্রবাহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তারপর একদিকে স্কট, অপরদিকে জেন অষ্টেনের রচনায় উপন্যাসের বিষয় ও আলোচনা-ভংগী আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে—নবজাত শিশুর দেহে যৌবন-লাবণ্য সঞ্চারিত হইয়াছে। জেন অষ্টেন রিচার্ডসনের ধারা অনুসরণ করিয়া সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, পারিবারিক কলহ, বিরোধ, কন্যাদের বরসংগ্রহ করিতে মাতাদের অশোভন ব্যস্ততা প্রভৃতি মনোভাবের ঈষৎ ব্যংগাত্মক, অথচ কলা-কৌশলে নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। স্কট মধ্যযুগের বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা বর্ণনা দ্বারা উপন্যাসের মধ্যে প্রথম কাব্য-ধর্মিত্বের বীজ বপন করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের উপন্যাস-সাহিত্যে এই কাব্য-মনোভাব ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া বাস্তব চিত্রণের সহিত প্রায় সমকক্ষত্ব লাভ করিয়াছে। হার্ডি, হথর্ণ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের রচনায় কবিত্ব-ধর্মী উপন্যাসের চরম পরিণতি হইয়াছে। আবার বিংশ-শতাব্দীতে উপন্যাস সাধারণ মানস-প্রগতির সহিত তাল রাখিয়া আধুনিক যুগের নানা বিচিত্র সমস্যা, জীবনের কেন্দ্রভ্রষ্ট বিশৃংখলা, পুঞ্জীভূত তত্ত্ব ও তথ্যের

গুরুভার আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে—এই নূতন প্রয়োজনের চাপে ইহার গঠন-পারিপাট্য ভাংগিয়া চুরিয়া গিয়াছে ও ইহার পরিধি স্ফীত হইতে স্ফীততর হইয়া যন্ত্রযুগের আকাশস্পর্শী, কুদর্শন সৌধসমূহের সারূপ্য লাভ করিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ বিবর্তনই প্রতিফলিত হইয়াছে। 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সমাজ-জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছে তাহাতে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কোন উচ্চতর নৈপুণ্যের নিদর্শন নাই। ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে যে অশান্তি ও উত্তেজনা বংগসমাজে ফেনায়িত হইয়াছিল, এই সমস্ত উপন্যাসে তাহাই খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোনরূপ উন্নততর সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা বা গভীরতর ঐক্যের অনুভূতি ইহাদের ঘন তথ্য-সন্নিবেশ ও তীক্ষ্ণ কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। অথচ ইহাদের অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেন যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে বস্তুতন্ত্রতার ভিত্তির উপর এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্যলোক রচিত হইয়াছে। উপন্যাসের রংগমঞ্চে ইতিহাসের আবির্ভাবের সংগে সংগেই, যেমন তাহার সাজ-সজ্জায় নূতন সমারোহ ও বর্ণাঢ্যতা, সেইরূপ তাহার ধমনীতে উষ্ণতর রক্ত-প্রবাহ ও ভাষায় জ্বালাময় আবেগ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইল। ক্রমশঃ সামাজিক উপন্যাসেও এই দ্রুততর জীবনস্পন্দন ও নিগূঢ়তর ভাবাবেগের সংক্রমণে উপন্যাস তাহার প্রাথমিক যুগের সাধারণ, সাদা-সিদে চাল-চলনের পরিবর্তে এক রাজকীয় ঐশ্বর্য ও সম্ভ্রমে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইলে" জীবনের যে মহিমা-মণ্ডিত, দ্বন্দ্ব-মথিত, রহস্য-ঘন চিত্র প্রকটিত হইল, তাহা যেন 'আলালের ঘরের দুলালের' সহজ, ব্যঞ্জনাহীন অথচ নৈতিক উদ্দেশ্যের চাপে অভিভূত বাস্তব বর্ণনার সহিত একেবারে ভিন্নজাতীয় বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও 'শেষের কবিতায়' মহাকাব্যের বৃহৎ পট-ভূমি, হৃদয়-রহস্যের গভীরতর স্তরের সন্ধান-কৌশল ও গীতি-কাব্যের সুষমা ও সৌন্দর্যময় প্রতিবেশ উপন্যাসের বাস্তব পরিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। ইহার উপর শরৎচন্দ্রের হাতে মানব-প্রকৃতির অনেক নূতন রহস্যের আবিষ্কার ও নূতন সমস্যার আলোচনা, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ ও ইহার উৎপীড়ন-ক্লিষ্ট হতভাগাদের প্রতি করুণ

সমবেদনা ইহার সুরটিকে আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী, সমালোচনায় তীক্ষ্ণ ও অনুভূতিতে কোমল ও কারুণ্যরস-সিক্ত করিয়াছে। অতি-আধুনিক উপন্যাসেও একদিকে যেমন ইহার বাস্তবতা আরও নগ্ন ও বীভৎস, কাপট্যমুক্ত ও সত্যানুগামী হইয়াছে, তেমনি এক ব্যঞ্জনাগূঢ়, সূক্ষ্ম-অনুরণন-ধ্বনিত, আদর্শ-লোকও রেখায়, বর্ণে, আভাসে স্পষ্টতর রূপ-পরিগ্রহ করিয়া ইহার চারিদিকে এক জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করিয়াছে।

৩

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উপন্যাসের এই সমস্ত উন্নততর সংস্করণের সহিত ইহার আদিম বাস্তবতা-প্রধান রূপের যোগ-সূত্র কি অক্ষুণ্ণ আছে, না ইহাদিগকে মূলতঃ ভিন্নজাতীয় সাহিত্য হিসাবে গণ্য করিতে হইবে? ইহাদের বিচার করিবার সময় কি উপন্যাসের মৌলিক, সনাতন আদর্শ প্রযোক্তব্য, অথবা ইহারা সৌন্দর্য-প্রধান কাব্য-সাহিত্যেরই একটা বিভাগ, এই বিবেচনায় ইহারা স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচারণীয়? "আনন্দমঠে" জীবনের একটা মহান্, বিরাট প্রচেষ্টার "রসরূপ" অংকিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার বাস্তব ভিত্তি দুর্বল বলিয়া ইহা উপন্যাস হিসাবে শ্রেষ্ঠ নয় এরূপ উক্তি কি অযৌক্তিক? "চন্দ্রশেখরে" শৈবলিনীর মানস প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি কি কেবল কাব্য-সৌন্দর্য ও কল্পনার অনুভূতি-গাঢ়তার দিক দিয়া বিবেচিত হইবে, না শৈবলিনীর অতীত ইতিহাসের সহিত সম্পর্কান্বিত তাহার চিত্তবিক্ষোভের ছন্দের সহিত গ্রথিত করিয়া ইহাদিগকে দেখার কোন বাধ্যবাধকতা আছে! "শেষের কবিতায়" যে কাব্যোচ্ছ্বাস আমাদিগকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে, তাহার মধ্যে ঔপন্যাসিক উপযোগিতা ও চরিত্র-সংগতির লক্ষণ আবিষ্কারের চেষ্টা কি সমালোচনার অপপ্রয়োগ? উপন্যাসটির সমাপ্তিসূচক দুইটি কবিতা (যাহা হইতে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে) কি অমিত ও লাবণ্যের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি, না ব্রাউনিংএর "Any Wife to Any Husband" নামক কবিতার ন্যায় যে কোন প্রেমিক-প্রেমিকার মনোভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য? এক কথায় লেখক উপন্যাসের বহিরাকৃতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরিত্রাংকন ও ভাব-বিশ্লেষণে বাস্তবানুবর্তিতার বিশেষ কোন দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসাই কাব্যধর্মী উপন্যাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যা।

এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্নরুচি ও ভিন্ন-আদর্শাবলম্বী পাঠক বা সমালোচকের নিকট ঠিক একরূপ হইবে না। আমার নিজের মত এই যে, যদি কাব্য হইতে উপন্যাসের প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে উভয়ের বিচার-প্রণালীতেও কিছু পার্থক্য থাকা উচিত। বৈষ্ণব কবিতায় যে মাধবীলতা বেষ্টিত তমালতরুর কথা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে, উপন্যাসক্ষেত্রেও সেইরূপ ঋজু, দৃঢ় তথ্য-বোধের চারিদিকেই কাব্য-সুষমা জড়িত থাকা বাঞ্ছনীয়। চরিত্রাভিব্যক্তির সহিত নিঃসম্পর্ক, অপরিমিত কাব্যোচ্ছ্বাস, সৌন্দর্যের হেতু হইলেও উপন্যাসের একটা দুর্বলতা। অবশ্য কাব্য-সৌন্দর্যে আমাদের মন সাড়া না দিয়া পারে না, কিন্তু সুদৃঢ় কার্যকারণ-শৃংখলে গ্রথিত না হইলে উপন্যাসে এইরূপ অমূলক সৌন্দর্যকে আমরা প্রাণখোলা প্রশংসা করিতে পারি না। কাজেই এরূপক্ষেত্রে আমাদের অভিমত-প্রকাশ কতকটা কুণ্ঠিত ও বিপরীত মানদণ্ডের মধ্যে দোলায়িত হইতে থাকে। উপন্যাসে কবিকল্পনার সহিত তথ্যবোধের যে চমৎকার সমন্বয় অসম্ভব নহে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ হাডির 'Return of the Native' ও হথর্ণের 'The Scarlet Letter'এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত উপন্যাসে প্রকৃতির মধ্যে যে মানবোচিত নির্মম ঔদাসীন্যের আরোপ করা হইয়াছে, তাহা কাব্যসুষমায় ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভংগীতে মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিসর্গ-কবিতার সুরের সংগে তুলনীয়। কিন্তু হাডির চরিত্র-বিশ্লেষণ এমন সূক্ষ্ম ও গভীর, মানুষের সংগে প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তাবোধ, পাত্র-পাত্রীর প্রতি চিন্তা, কার্য ও ব্যবহারে এমন ব্যাপক ও নীরন্ধ্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, প্রকৃতির প্রতি তাহার মনোভাবকে আমরা কখনই নিছক কবি-কল্পনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যেন আকাশবিহারী কল্পনা বাস্তবতার শত-সহস্র সূত্রে গ্রথিত জালে আবদ্ধ হইয়া মনস্তত্ত্বের দৃঢ় অবিচল নিয়মের কক্ষপথে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হথর্নের উপন্যাসে সমস্ত প্রকৃতি যেন অপরাধী মনের উৎকট, আত্মনিপীড়নকারী প্রায়শ্চিত্তের কৃচ্ছ্র-সাধনক্লিষ্ট হইয়া, তাহার স্বহস্ত-পাতিত বক্ষঃশোণিতে রক্তরঞ্জিত হইয়া এক বিরাট জীবনব্যাপী রূপকের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেকটি ইংগিত, প্রকৃতির মুখে প্রতিফলিত প্রত্যেক পরিবর্তনশীল ভাবের ছায়া—একদিকে সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতি, অন্যদিকে অব্যভিচারী চরিত্রানুবর্তন—এই দ্বিবিধ নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অনায়াস-লভ্য সুসংগতির সহিত স্বীকার করিয়াছে। এই সমস্ত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই সমালোচককে

উপন্যাসে কাব্য-সৌন্দর্যের পরিমিতি ও উপযোগিতার সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪

এই প্রসংগে সংপৃক্ত আর একটি প্রশ্নেরও আলোচনা করিতে হইবে। কোনও উপন্যাসের বিচারকালে তাহার বিভিন্ন স্তর ও উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে নিন্দা-প্রশংসার তারতম্য-প্রয়াস কাহার কাহারও বিচারবুদ্ধি ও রসবোধকে পীড়িত করে। ইহাদের মত এই যে, উপন্যাসটি সমগ্রভাবে বিচার্য ; কেন না ইহার মধ্যে আর্টের অখণ্ড ঐক্য বা "রসরূপ" হয় আছে, না হয় নাই। যদি থাকে, তবে ইহা লেখকের শিল্পবিন্যাস-শক্তির সার্থক প্রয়োগরূপে প্রশংসনীয়, অন্যথা নিন্দার্হ। একই উপন্যাসকে কোথাও ভাল, কোথাও মন্দ বলা, কোথাও ইহার মধ্যে মহাকাব্য বা গীতি-কবিতার লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া ইহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, কোথাও বা বাস্তবতার আপেক্ষিক অভাবের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ আসল সমালোচনাপদ্ধতির অনুসরণ নহে। এইরূপ ভালো-মন্দ মিশানো সমালোচনার আর একটা দোষ এই যে, ইহাতে পাঠকের চূড়ান্ত অভিমত দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—এই স্তুতি-নিন্দার নাগরদোলায় পাক খাইয়া তাহার বিচারবুদ্ধি গুলাইয়া যায়। কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে নিঃসংশয়িত ধারণা করার মধ্যে যে একটা স্বস্তি ও আত্মপ্রসাদ আছে, এই জাতীয় সমালোচনা পাঠককে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার মনে সমালোচকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অনুযোগ জাগায়।

পাঠকের এইরূপ বিরক্তি যে অস্বাভাবিক নহে তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। তবে ইহার জন্য দায়ী ঠিক সমালোচক নহে, দায়ী উপন্যাসের জন্ম-ইতিহাস। আসল কথা, উপন্যাসের কোন প্রামাণ্য সুনির্দিষ্ট রূপ নাই। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকেরা ও গ্রীস ও রোমের আরিষ্টটল ও হোরেস যেরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণপূর্বক তাহার বাহিরের আকার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সদ্যোজাত উপন্যাস সম্বন্ধে সেরূপ বিধিনিষেধ কখনও আরোপিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, অনেকটা যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রতি ঠিক থাকিয়া, ইহা পুরাণ-বর্ণিত তিলোত্তমার

ন্যায় কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া নিজ অংগ-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্যের দৃঢ়বদ্ধ, পরিবর্তনহীন আংগিক ইহার নাই—ইহার গঠন-শিথিলতাই ইহার বহিরংগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই ইহার সুবিশাল ও ক্রমবর্ধমান পরিধির মধ্যে কাব্যোচ্ছ্বাস, মহাকাব্যের বিরাট সার্বভৌম ব্যঞ্জনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাত, ব্যংগ-বিদ্রূপ ও পরিহাস-রসিকতা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজনীতির আধুনিকতম তত্ত্বালোচনা তুল্যরূপ আদর ও আতিথেয়তা লাভ করিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার জীবন-চিত্রণ সত্যানুগ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন উপাদানকেই একেবারে অবান্তর বলিয়া বর্জন করা যায় না। কেননা, ইহাদের সকলের মধ্যেই মানব-প্রকৃতির সত্য প্রতিচ্ছায়া বর্তমান। নাটকে যেমন গীতি-কবিতার আতিশয্য তাহার প্রকৃতি-বিরোধী বলিয়া নিঃসংকোচে অপকর্ষ-লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়, উপন্যাসে সেরূপ সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ অবিধেয়। উপন্যাসের ঐক্যতানে এই সমস্ত বিচিত্র রকমের সুরেরই একটা প্রয়োজনীয় অংশ আছে। উপন্যাসের সর্বত্র বাস্তবতার প্রকাশ সমানরূপ তীক্ষ্ণ ও অকুণ্ঠিত নহে, সেইজন্য বাস্তবের স্তর-বিভাগ অনুসারে ইহার বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ সময় সময় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই যেখানে বাস্তব অপেক্ষাকৃত অপ্রধান, সেখানেও গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের সুর-ঝংকার একদিকে উপন্যাসের কাব্যোৎকর্ষ বাড়ায়; অপরদিকে বস্তু-তন্ত্রতার মধ্যেও যে সূক্ষ্মতর মূর্ছনা ও আভাস মৌন থাকে তাহাকে অনুরণিত করিয়া ইহার পূর্ণতা সাধন করে। কাজেই সমালোচনা এই সমস্ত উৎকর্ষ-অপকর্ষের জটিল সমাবেশ লক্ষ্য করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইহা সর্বথা স্বীকার্য যে, উচ্চাংগের প্রতিভা এই সমস্ত বিশৃংখল উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে, ইহাদের নৈকট্য ও বৈপরীত্যের নিপুণ প্রয়োগে এক অখণ্ড রস-সংহতি ও রূপ-সমন্বয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ ঔপন্যাসিকেরা এরূপ নিখুঁত গঠন-পরিপাট্যের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া শক্তিমত্তার সাবলীল উপেক্ষার সহিত উপন্যাসের অবয়বগত শিথিলতা ও অবিন্যস্ত প্রাচুর্যকেই স্বীকার করিয়া লন। উপন্যাসের সমালোচনা যে ইহার অখণ্ড রূপের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য না হইয়া খণ্ড-খণ্ড বিশ্লেষণেই অধিক তৎপর হয়, তাহার মুখ্য কারণ সমালোচকের রসবোধের অভাব নহে, উপন্যাসেরই জন্মগত মিশ্রতা ও বর্ণ-সাংকর্য।

৫

পরিশেষে আর একটি আপত্তির কথা উত্থাপন করা প্রয়োজন। উপন্যাসের ইতিহাস ঠিক কখন হইতে সুরু করা উচিত, উহার জন্ম-মুহূর্ত না আরও পূর্ববর্তী স্তর হইতে? যদি গল্পের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ, সজ্ঞান বাস্তবভংগী প্রবর্তন উপন্যাসের মৌলিক প্রেরণা হয়, তবে এই ভংগী অজ্ঞাতসারে, অন্য উদ্দেশ্যের আড়ালে, যেখানেই লক্ষ্য-গোচর হয় সেখানেই উপন্যাসের উপাদানের উপস্থিতি মানা কি অযৌক্তিক? বাল্মীকি মুনি রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; আধুনিক সাহিত্যসমালোচকও কোন বিশেষ সাহিত্য-বিভাগ রূপায়িত হইবার পূর্বেই অতীতের অন্ধকারে তাহার বিচ্ছিন্ন অণুপরমাণুগুলির অনুসন্ধানে রত থাকেন। বিজ্ঞানের প্রভাবে জীব ও জড় উভয়েরই উদ্ভব-রহস্যের স্তরগুলি এই ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জীবের জন্মের বহু পূর্বে তাহার প্রথম প্রাণস্পন্দন হইতে তাহার অপরিণত ভ্রূণাবস্থার বিচিত্র ইতিহাস নির্ণীত হইয়াছে। এমন কি, মৃত্তিকার বর্তমান জমাট-রূপের পিছনে সমুদ্রগর্ভ হইতে তাহার উদ্ধার ও প্রথম ধূলিকণার সৃজন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে। সাহিত্যেও এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই ইহার সমস্ত বিভাগেই আদিম উৎস অনুসন্ধানের কার্যে বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। বীজ অংকুরিত হইবার পূর্বে ভূগর্ভে অদৃশ্য অন্ধকারের মধ্যে ইহার প্রাণের যে নিগূঢ় প্রক্রিয়া কার্য করিতে থাকে, তাহা বাদ দিলে উদ্ভিদের ইতিহাস-সংকলন অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তি-সংকুল হয়। সেইমত উপন্যাসের রসরূপ দানা বাঁধিবার পূর্বে ইহার বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশগুলি কি করিয়া দীর্ঘ শতাব্দীর অর্ধ-সচেতন প্রেরণা ও কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কেন্দ্রসংহতি ও বিশিষ্ট রূপসৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহাও ইহার ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ। অবশ্য সৌন্দর্যবিলাসী, রুচিবাগীশ সমালোচক এই ভূগর্ভ-খননের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কোহিনুরের সন্ধানে মাটি খুঁড়িয়া যাঁহারা নিজ অংগে প্রচুর ধূলিমলিনতা লেপন করেন সেই হতভাগ্যেরা ইহাদের সহানুভূতি ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত থাকেন। সৌন্দর্য-সৃষ্টির উচ্চ আদর্শে বিচার করিয়া ইহাদের এই কাজকে কুলিমজুরের কাজ বলিয়া ঘৃণাভরে উপেক্ষা করা খুবই সহজ। কিন্তু তথাপি ইহা ইতিহাস-রচনা ও সাহিত্য-রসাস্বাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই নীতি ইউরোপীয় সাহিত্যের

সর্বত্রই স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে। উপন্যাসের পূর্বাভাসের হাতছানিতে ইহার ঐতিহাসিকেরা অষ্টাদশ শতকের সীমা ছাড়াইয়া পিছন হাঁটিতে হাঁটিতে সুদূর অতীতে গিয়া থামিয়াছেন—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্ব-মূলক চরিত্রসৃষ্টি (Characters); এলিজাবেথীয় নাটক ও গল্প; চসার ও মধ্যযুগের বীরত্ব-গাথা; অ্যাংলো-সাক্সন যুগের যুদ্ধবিগ্রহের মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যগুলি, এমন কি গ্রীক সাহিত্যের অলৌকিক পূর্বদেশীয় আখ্যায়িকা-সমূহ—এ সমস্তই উপন্যাসের পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। এমন কি, র‍্যালে প্রমুখ কোন কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক যে উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে এই পূর্বসূচনার সূত্র আবিষ্কারেই সীমাবদ্ধ। কাজেই যুক্তি ও নজীর উভয়ই আমার অনুসৃত প্রণালীর সমর্থক। অবশ্য যুক্তি ও নজীর উদ্ধার করিলেই যে তাহা মানিতে হইবে তাহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কোন কোন সমালোচক কাব্যের প্রকৃতি-বিশ্লেষণে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বাণী ও অভিমত উদ্ধার করিয়া নিজ প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ করেন—কিন্তু সমালোচনার প্রয়োগক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টান্তের অনুসরণকে বোধ হয় মৌলিকতার অভিমানে ঘা লাগিবার আশংকায় অস্বীকার করেন। এই উৎকট মৌলিকতা-স্পৃহা শরৎচন্দ্রের টগর বৈষ্ণবীর সগর্ব উক্তির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—বিশ বৎসর ভিন্নজাতীয় এক জনের সংগে ঘর করিয়াও জাতির বিশুদ্ধি কিরূপে বজায় রাখা যায়, সেই মন্ত্ররহস্য ইঁহারা কোন অজ্ঞাত কৌশলে আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ঔপন্যাসিক বংকিমচন্দ্র

বংকিমচন্দ্রের জন্মের শত-বার্ষিক উৎসবের সম্ভাবনায় যে দেশব্যাপী উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে বংকিমের লোকোত্তর প্রতিভার পুনরালোচনার একটা সুন্দর অবসর ঘটিয়াছে। অতিশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বংকিমের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের আলোচনা যথোপযুক্ত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগে মাত্র দুইজন সুধী এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন—গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বংকিমের প্রতি এই আপেক্ষিক ঔদাসীন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটা অমার্জনীয় অপরাধ। ইউরোপের কোন দেশে তাঁহার ন্যায় লেখকের জন্ম হইলে, তাঁহার সশ্রদ্ধ আলোচনায়, যুক্তিসহ বিচার-বিশ্লেষণে সে দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে বংকিমচন্দ্র যে স্তুতি, প্রশংসা না পাইয়াছেন তাহা নহে ; কিন্তু সে প্রশংসার অধিকাংশ নিবেদিত হইয়াছে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতা ও দূর-প্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রতি। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে ; তাঁহার "আনন্দমঠ" শত শত দেশবাসীর প্রাণে দেশপ্রীতির প্রথম বীজ বপন করিয়াছে সত্য ; কিন্তু যে নিয়মে আমরা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র-প্রণেতা ঋষিকে বিস্মৃত হইয়াছি, সেই নিয়ম বংকিম-সম্বন্ধেও অনেকটা প্রযোজ্য হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে মতবাদ আমরা উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা ভক্তিবিহ্বলতায় অস্পষ্ট, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য-বিড়ম্বিত। পক্ষপাতহীন সমালোচনার দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ ও কীর্তির যথাযোগ্য মূল্য নির্ধারণ, ঔপন্যাসিক-সমাজে তাঁহার চিরন্তন স্থান-নির্দেশ—এদিকে বিশেষ কোন সম্মিলিত চেষ্টার কৃতিত্ব আমরা দাবী করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের বংকিমচন্দ্রের উপর একটি সাধারণ সমালোচনা ও রাজসিংহ উপন্যাসের আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রসগ্রাহিতা অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু যিনি ইচ্ছা করিলে সমালোচনা-ক্ষেত্রে একটা নূতন ধারা প্রবর্তন করিতে পারিতেন, আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাঁহার নিকট এই মুষ্টিভিক্ষায় আমাদের মন তৃপ্ত হয় না—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশপ্রেমিক বংকিমের শিষ্যত্ব-স্বীকার ও সাহিত্যিক বংকিমের প্রতি বিমুখতা—এই অদ্ভুত সমন্বয়শীল মনোবৃত্তির একটা বিশেষ কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। বংকিম-পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষার নদীতে যেমন জোয়ার আসিয়াছে, আমাদের সাহিত্যিক রোমান্স-প্রবণতার প্রবাহে সেইরূপ ভাটারই প্রাদুর্ভাব। রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার আবশ্যক নাই—ইহা অতিশয় স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের যে সনাতন রোমান্স-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাই পরবর্তী যুগে সংকুচিত হইয়া এখন অতি শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। বংকিমের অব্যবহিত পরবর্তী যুগ এক বিপ্লবকারী রুচি-পরিবর্তনের যুগ। ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সহিত নিবিড়তর সংযোগের ফলে আমাদের সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ অনুসৃত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সমাজে কতকগুলি অপ্রতিবিধেয় ও স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ও ইহাদের আলোচনা সাহিত্যেরও প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইতেছে—যৌন ও দারিদ্র্য সমস্যা। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ-নীতির আদর্শ-বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলতার জন্য এবং ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবস্থা-বৈষম্যের জন্য এই সমস্যাগুলি জীবনে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে এবং জীবনের মর্মস্থল হইতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে স্বতঃই স্থানান্তরিত হইতেছে। এই সমস্ত সমস্যার সংগে সংগে বাস্তবতা-প্রধান ও রোমান্স-বিমুখ সাহিত্যিক মনোবৃত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজে এই সমস্ত প্রশ্ন কেবল অংকুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া এই সমস্ত অর্ধ-কৃত্রিম সমস্যাবিচারে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং ইহাব অনুকূল সাহিত্যিক ভংগী ও মনোবৃত্তি অর্জনে সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাই বংকিমের সহিত অতি-আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিচ্ছেদ। এই জাতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য যেরূপ আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহার অভাবই অতি-আধুনিকের চক্ষে বংকিমের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি। ইহাই সাধারণতঃ বংকিমের অবাস্তবতা, গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

তারপর অক্ষমতাও বংকিমের পদাংক অনুসরণের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। বংকিম ঐতিহাসিক প্রতিবেশ হইতে যে রোমান্স আমাদের প্রাত্যহিক

পারিবারিক জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তীরা সেই রোমান্সের মূলসূত্র ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাসলব্ধ রোমান্স উপন্যাসক্ষেত্রে বংকিম এবং রমেশচন্দ্র ও নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের যখন যোদ্ধবেশ, যখন ইহা বীরত্ব-প্রভায় ভাস্বর, তখন ইহার গতিবেগ ও দীপ্তি সাধারণ জীবনে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। ইতিহাসের এই রণোন্মাদনা জীবনের তালকে দ্রুততর করে, ইহার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একটা বিরাট উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সংহত করিয়া এক স্মরণীয় বিকাশের দিকে লইয়া যায়। বর্তমান যুগের ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের রংগমঞ্চে এই বীরত্বের অভিনয়, এবং বিশাল ব্যক্তিত্ববিকাশের অবসর দেখিতে পান না ;—আধুনিক ইতিহাস কূটনীতি ও তার্কিকতার লীলাক্ষেত্র। অতীত ইতিহাসে পুনর্জীবন সঞ্চার করিতে বংকিম যেটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক কল্পনার একান্ত অভাবের জন্য আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা তাহার কাছাকাছিও যাইতে পারেন না। সুতরাং ইতিহাসের সিংহদ্বার তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসে ইতিহাসক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের বিরাট প্রাংগণতলে তিনি আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের দুই-একটি ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। পরবর্তী যুগে বংকিম-প্রভাবের খর্বতার ইহাও একটি কারণ।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিপরীতমুখী প্রভাব। বংকিমের তিরোভাব হইতে না হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আবির্ভাব আমাদের সমস্ত বিচার-শক্তি ও রসবোধকে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে—সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নব-জ্যোতিষ্কের আড়ালে পড়িয়া বংকিমের স্মৃতি যে অপেক্ষাকৃত ম্লান ও ধূসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্স বংকিম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক-জাতীয়—ইহার উদ্ভব ইতিহাসের বহিঃপ্রাংগণে নহে, লেখকের নিজ মানস-কল্পলোকের মধ্যে। তাঁহার সর্বগ্রাসী কাব্যশক্তি উপন্যাসকে কবিতার অধীন করদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। আবার তাঁহার 'ঘরে বাইরে', 'চতুরংগ' প্রভৃতি উপন্যাসে আধুনিক সমস্যা

চিরন্তন সমাজ-গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া একটা অসাধারণ তীব্রতা লাভ করিয়াছে। বংকিমের সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত, বাহিরের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত সমস্যা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এত তীক্ষ্ণ ও প্রশ্নসংকুল হইয়া উঠে নাই। শরৎচন্দ্রও মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার রোমান্স আসিয়াছে সমাজ-শৃংখলহীন, ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পল্লীবালকসুলভ নির্ভীক দুঃসাহসিকতার কাহিনী হইতে। তিনি প্রেমের উদ্ভব-রহস্য, ইহার বিধি-নিষেধ-উল্লংঘন-প্রবণতা ও সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের যেরূপ গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, বংকিমের বিশ্লেষণে সেরূপ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টি নাই। বংকিমের প্রেমের ধারণা প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ-রীতি হইতে গৃহীত; তাঁহার ভ্রমর, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রেমের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা মোটের উপর চির-প্রথাগত পৌরাণিক তটভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে তিনি সনাতন মিলন-বিরহ, অভিমান-মনোমালিন্য ও পুনর্মিলনেরই শোভাযাত্রা দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-কাহিনীতে দুইটি মাত্র প্রবল বিপরীত ধারার প্রবাহ লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে আবার যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীচি-বিক্ষেপ, সংশয়-আন্দোলনের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, তাঁহার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেগুলি ধরা পড়ে নাই। অবৈধ প্রেম তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কবিত্বময় সাংকেতিকতার মধ্য দিয়া, আণুবীক্ষণিক দিন-লিপির মধ্য দিয়া নহে। তাঁহার রোহিনী কি করিয়া গোবিন্দলালের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার মূলসূত্রটি তিনি সূক্ষ্ম ইংগিতের সাহায্যে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার অতৃপ্ত প্রেমাকাংক্ষা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের সমবেদনায় এই ক্ষীণ প্রেমশিখা উজ্জ্বল হইয়াছে; বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিবার চেষ্টাতে ইহার অপ্রশমিত বেদনার অতর্কিত বিকাশ আমাদিগকে বিস্ময়-ব্যথিত করিয়াছে। গোবিন্দলালের দিক দিয়াও একটা অনুরূপ আকর্ষণ একটিমাত্র পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্যন্ত দেখাইয়াই তিনি বিশ্লেষণ-কার্য স্থগিত রাখিয়াছেন। হৃদয়ের বিক্ষোভ ও আকর্ষণ কি করিয়া দৈহিক সম্বন্ধের নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহার গ্রন্থিবন্ধনগুলি নিখুঁতভাবে দেখানো তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। প্রলোভন ও পতন—ইহার মধ্যবর্তী স্তরগুলি পাঠক অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে, এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার বিশ্লেষণে ইচ্ছা করিয়াই

অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছেন, তাঁহার সুরুচি ও সংযম-জ্ঞান এইখানে কলমের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক ও পাঠক কিন্তু এই সংকোচের সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বংকিম যে স্তরগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, ঠিক তাহাদের মধ্যেই কোন বিশেষ প্রণয়-কাহিনীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। প্রায় সমস্ত প্রেমেরই আদি ও অন্ত—আকর্ষণ ও পদস্খলন একরূপ; যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহা ঐ মধ্যবর্তী স্তরগুলির মধ্যেই বর্তমান। আবার বংকিমের উপন্যাসে পদস্খলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—মোহভংগ ও অনুতাপ। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস এই সনাতন নীতির অনুমোদিত পরিসমাপ্তির বৈধতা স্বীকার করে না। বর্তমান যুগের ঔপন্যাসিক সমাজবিধি উল্লংঘনের মধ্যে হয় প্রশংসার্হ বিদ্রোহ ও মুক্তির আনন্দ আবিষ্কার করেন, না হয় মনুষ্যত্বের আরও গভীরতর অবনতি, নিদারুণতর লাঞ্ছনা, চরম অধোগতির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। আর্টের পদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে বংকিমের সহিত তরুণ পাঠকের এই মতভেদ আজ তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কুহেলিকা কাটিয়া গেলে সূর্যালোক যেমন দীপ্ততর হইয়া উঠে, সাময়িক ভ্রান্তি-নিরসনের পর বংকিমের প্রতিভাও সেইরূপ দেদীপ্যমান হইবে—ইহা আশা করা অসংগত হইবে না।

বংকিমের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক সমালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে সম্ভব নহে; বর্তমান উপলক্ষ্যও সেরূপ চেষ্টার প্রতিকূল। আমি কেবল এখানে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণের উপর তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে—তাঁহার সর্বাংগীন আধুনিকতা। বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য অনেকেই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—রাজা রামমোহন রায়; তিনিই প্রথম শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্মজীবনের বিচারে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তন করেন। সে হিসাবে তিনিই আধুনিকতার অগ্রদূত। তাঁহার পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাবীই অগ্রগণ্য। ইহারা নানা দিক্ দিয়া পুরাতন সমাজ-মনে স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া, তাহার অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোণগুলি প্লাবিত ও পরিষ্কৃত এবং সেখানে অনেক নূতন চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করিয়াছেন, যাহা এখন ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিকতার সৃষ্টি করিতে শুধু যে মৌলিক

চিন্তার প্রয়োজন হয় তাহা নয়, নূতন ভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষাও তাহার একটা অপরিহার্য অংগ। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর নূতন ভাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভাষার দিক দিয়া তাঁহারা অতীত সংস্কৃতির সংকীর্ণতার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিল তিল করিয়া নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা আধুনিক মনোবৃত্তির ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা আড়ষ্ট, জড়তাগ্রস্ত ও মন্থরগতি ছিল। আধুনিক মনের লীলা-চঞ্চলতা, ক্ষিপ্র-গতি, সব্যসাচিত্ব (versatility), বিদ্যুৎশিখার ন্যায় ভাস্বর পরিবর্তনশীলতা, আবেদন-বৈচিত্র্য (variety of appeal) বংকিমচন্দ্রেই সর্বপ্রথম পূর্ণ-বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তীদের তূণীরে এক প্রকারেরই অস্ত্র ছিল—তাঁহাদের গুরু-গম্ভীর বচন-বিন্যাস, অভ্রান্ত শাস্ত্র-বিচার ও উঁচু-স্বরে-বাঁধা নৈতিক আবেদন প্রতিপক্ষের স্থূল গণ্ডার-চর্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। বংকিমচন্দ্র যুদ্ধ চালাইবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন; তাঁহার আক্রমণ তাঁহার পূর্ববর্তীদের গদাযুদ্ধে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার তূণীর বিচিত্র আয়ুধে পূর্ণ ছিল—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্র, প্রচ্ছন্ন পরিহাস, গূঢ়ার্থ রূপক, অচ্ছেদ্য তর্কজাল ও শ্রেণীবিন্যস্ত যুক্তি-পরম্পরা, ইতিহাসের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত পূর্বোদাহরণ (precedent), অফুরন্ত স্বতঃউৎসারিত রসিকতা, লঘু কল্পনার ইন্দ্রজাল (fantasy) ও গভীর, মর্মস্পর্শী, অশ্রুপূর্ণ আবেগ—এই সমস্ত অস্ত্রেই তাঁহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল। পুরাণবর্ণিত বীরের ন্যায় তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের যুক্তিকে ক্রোধের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত করিয়াছেন, অজস্র উপহাসের বরুণাস্ত্রে গংগাপ্রবাহে ঐরাবতবং ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন ও ভাবাবেগের বায়ব্যাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিয়া অণুপরমাণুতে গুঁড়া করিয়া উড়াইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থে দেশাচারকে সম্বোধন করিয়া যে দীর্ঘ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোমল, দয়ার্দ্র হৃদয় ও অপরিণত তর্কশক্তি একসংগে প্রকাশিত হইয়াছে। বংকিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহনিবারণ-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে বহু-বিবাহ-রোধকল্পে ধৃতাস্ত্র লেখককে ডন কুইক্সোটের সহিত তুলনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রচেষ্টাকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। বংকিমের যোদ্ধবেশ সুদর্শনহস্ত বিষ্ণুর ন্যায় যুগপৎ সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করে। তাঁহার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গ অভিমন্যুর নিকট কুরুসৈন্যের ন্যায় পরাজিত ও ছত্রভংগ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার তর্কের মধ্যে একটু জোর-জবরদস্তির ভাব, প্রতি

পক্ষের প্রতি একটা অবহেলা ও অবজ্ঞার সুর সময় সময় লক্ষ্য করা যায়। ইহা নীতির দিক দিয়া হয়ত সর্বথা সমর্থনযোগ্য নহে ; কিন্তু তর্কযুদ্ধে ইহা প্রত্যেক আঘাতের শক্তি বাড়াইয়া প্রতিপক্ষকে একেবারে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে। বংকিম যদি একখানিও উপন্যাস না লিখিতেন, তথাপি তাঁহার 'বিবিধ-প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিত। আর এই যুদ্ধের উপযোগী ভাষা তাঁহার হাতে শাণিত তরবারির ন্যায় শ্লেষ-বিদ্রূপ-ভাবাবেগের সূর্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষাই তাঁহার সম্পূর্ণ আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের ন্যায় 'ভূধর হইতে ভূধরে ছুটিয়া', 'রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া', বাধা-বিঘ্নের উপলখণ্ডকে সবলে অপসারিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, গিরিনদীর নৃত্য-চপলতা ও ধূর্জটির জটাজালের ন্যায় মহান্ গাম্ভীর্য, উভয় গুণেরই অপরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

বংকিমের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হইতেছে—তাঁহার উপন্যাসাবলীর পরিকল্পনার মৌলিকতা। আমরা প্রায়ই বংকিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আওড়াইয়া থাকি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বংকিমের উপন্যাসসমূহ ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৮৭ পর্যন্ত এই একুশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একটি দিক্‌পাল। ইহার পূর্ববর্তী যুগে Scott ও Jane Austen, এবং এই যুগে Dickens, Thackeray, George Eliot, Charlotte Bronte, George Meredith ও Thomas Hardy প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা লেখনী চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু বংকিমের উপন্যাসের প্রণালী ও ভাবভংগী যে ইহাদের কাহারও দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া নিজ মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। আমরা সাধারণতঃ বংকিমকে স্কটের সহিত তুলনা করি, ও তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহের সহিত আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয় সম্পর্কটির সহিত Ivanhoe-র সহিত Rowena-Rebecca-র সম্বন্ধের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সাদৃশ্য-আবিষ্কার সম্পূর্ণ অনুমানসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। বংকিম যে স্কটের নিকট তাঁহার উপন্যাসের মূল ঘটনা সম্বন্ধে ঋণী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দুইজন

ঔপন্যাসিকের রচনায় নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকিলেই যে নিছক ঋণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসংগত নহে। আর এই ঋণ মানিয়া লইলেও বংকিমের মৌলিকতার কোন হানি হয় না। এই দ্বৈত প্রণয়-কাহিনীটি তিনি সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছেন; হতাশ-প্রেমিকা Rebecca-র সহিত আয়েষার ও Rowena-র অহংকৃত পরুষভাবের সহিত তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, কোমল, ব্রীড়াসংকুচিত ভাবের কোনই সাদৃশ্য নাই। সামাজিক অবস্থার দিক দিয়াও Rebecca ও আয়েষা তুলনীয় নহে—Rebecca তদানীন্তন যুগের ঘৃণ্য, পতিত ইহুদিতনয়া, আয়েষা নবাব-নন্দিনী। ইহা ছাড়া স্কটের লিখন-ভংগী হইতে বংকিমের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্কটের কৃতিত্ব ইতিহাসপরিবেশ রচনায়, নিজের দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু ভাব-গভীরতা ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক দিয়া বংকিমের স্থান স্কটের অনেক উর্ধ্বে। তাঁহার বর্ণনা-ভংগী, জীবন-সমালোচনা, মনুষ্য-জীবনে নিগূঢ় দৈবের লীলা ফোটাইয়া তোলার প্রণালী, সরস কথোপকথন-চাতুর্য, ভাবোচ্ছ্বাস—এ সমস্তই তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত। পরিধির সংকীর্ণতা ও সংঘাতের স্থায়িত্ব-কাল বাদ দিলে বংকিম যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরাজ ঔপন্যাসিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। উপন্যাসের কাঠামো ও পটভূমি তিনি পশ্চিম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর সমস্যা সম্পূর্ণরূপে এতদ্দেশীয়, বংগদেশের সমাজ ও পরিবার-প্রতিবেশ হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে উদ্ভূত। ইউরোপীয় সমস্যা বাংগালীর পোষাকে সাজাইয়া, বাংগালীর ব্যবহার ও ব্যক্তিগত জীবনকে ইউরোপীয় সমাজনীতি ও দার্শনিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া বংকিম সস্তায় বাহাদুরি লইবার প্রবৃত্তি দেখান নাই। তাঁহার ভ্রমর-সূর্যমুখীর অভিমান স্নিগ্ধ ও উত্তাপহীন—কেন-না, তাহারা চিরন্তন সমাজ-নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে; কক্ষচ্যুত তারকার উল্কাগতি ও অস্বাভাবিক প্রখর দীপ্তি তাহাদের নাই। বংকিম-প্রতিভার বিশ্লেষণকালে তাঁহার মৌলিকতার এই শ্রেষ্ঠ গৌরব আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বংকিমের তৃতীয় কৃতিত্ব এই যে, তিনি বংগ সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাধারণ পরিকল্পনার জন্য তিনি যে Scott এর নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস ও

ব্যক্তিগত জীবনের সম্মিলনের উপর জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই মূলসূত্রে সমস্ত পরবর্তী ঔপন্যাসিক Scottএর নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। বংকিমের ইতিহাস-পরিধি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বংগ-বিজয় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ফাঁক আছে। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত তুলনায় তাঁহার ইতিহাস দায়িত্বজ্ঞানহীন কাল্পনিকতা ও তথ্যহীন সংকেতের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ইহার জন্য দায়িত্ব বংকিমের নহে; কেন-না, এই মন্দভাগ্য দেশে বিশ্বাসযোগ্য, তথ্যবহুল ইতিহাসের একান্ত অভাব। ইতিহাসের অভাব ছাড়া আর একটি কারণে বংকিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই; তাহা সাধারণ দেশবাসীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগ। দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব আসিয়াছে তখন তাহা রাজা বা রাজবংশীয়দের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ পারিবারিক জীবন এই ঝটিকায় বিপর্যস্ত হয় নাই, নিজ চিরন্তন নিস্তরংগ স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। বংকিমের সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস-প্রভাব তুল্যরূপ গভীর বা প্রবল হয় নাই, ইতিহাস-অংশের সহিত ব্যক্তিগত জীবন সবক্ষেত্রে সমান নিবিড়ভাবে বিজড়িত হয় নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতা সেরূপ মারাত্মক ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুর্কবিজয়ের সহিত হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ; পশুপতি-মনোরমার রহস্য-জড়িত সম্পর্কের সহিত ইহা বরং অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তুর্ক-বিজয়ের সময় দেশের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল বা তাহার অব্যবহিত কারণ কি, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইতিহাসেও নাই—সুতরাং বংকিমের উপন্যাসে যে থাকিবে না, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! তবে গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠনের চিত্রটি যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, এখানে আশ্চর্য স্বচ্ছ, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কল্পনা ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। আর সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক গৌড়-বিজয়ের কিংবদন্তীর অন্তরালে অবিসংবাদিত বিশ্বাসঘাতকতার যে কংকাল উঁকি মারিতেছে, বংকিম তাহাতে রক্ত-মাংস যোগ করিয়া, একটু আত্মঘাতী হীন চাতুর্য ও প্রণয়াকাংক্ষা মিশাইয়া পশুপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। পশুপতি ঐতিহাসিক চরিত্র নহে, কিন্তু সে না হইলে ইতিহাসের পাদপূরণ হয় না। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ও ‘কপালকুণ্ডলা’

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে ইতিহাসের প্রাধান্য; ইতিহাসের ঝটিকাবর্ত নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া তাহাদের জীবনে প্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়াছে। উপন্যাসে ষোড়শ শতাব্দীর কোন সামাজিক চিত্র নাই, তবে chivalry বা ক্ষাত্রযুগের একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। পাঠান-মোগল-রাজপুতের জাতিগত বৈষম্য দেখান হয় নাই, তবে কতলু খাঁ ও ওসমানের চরিত্রে দুর্দমনীয়, অসংযত আবেগের বিবরণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় মিলে। বিমলার অসমসাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ব্যক্তিগত গুণ হইলেও কাল-প্রভাবেরও ইংগিত বহন করে। আর বিমলার সহিত বীরেন্দ্র সিংহের সম্পর্কে ও অভিরাম স্বামীর আত্মকাহিনীতে যে সামাজিক দুর্নীতি ও শিথিলতার ছবি পাওয়া যায়, তাহাকে মোটামুটি যুগধর্মব্যঞ্জক বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ‘কপালকুণ্ডলা’তে ইতিহাস অত্যন্ত গৌণ—মতিবিবিকে প্রথমে নূরজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বিনী পরে নবকুমারের প্রণয়াকাংক্ষিণী করিয়া দেখানতে প্রকারান্তরে নবকুমারের গৌরব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা যে রাজ্যের অধিবাসিনী, ইতিহাসের সন-তারিখ মিলাইয়া তাহার সীমা নির্দেশ করা যায় না। ‘রাজসিংহ’ সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইহার মধ্যে দিল্লী-সম্রাটের ঐশ্বর্যসমারোহপূর্ণ রাজসভা ও পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ হৃদয়বিক্ষোভ চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা ইহাতে নাই; কিন্তু রাজনৈতিক কূট ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে যে সনাতন মানব-হৃদয় রাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে তাহার চিরন্তন ক্ষুধা-আকাংক্ষা-অভিমান-মনোবেদনা লইয়া আন্দোলিত, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। তাহার পর বংকিম একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। ‘সীতারামে’ ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ জীবন-যাত্রার আমরা যে পূর্ণতর চিত্র পাই, তাহার কারণ ইহার সহিত বর্তমান যুগের বিশেষ প্রভেদ নাই। গংগারামের কৃতঘ্নতা, রমার ভাববিহ্বলতা, সীতারামের পদস্খলন—এ সমস্তই প্রায় আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়াই অনুভূত হয়। সীতারাম যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া জাতিগত জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই; কাজে কাজেই তাঁহার চরিত্রের অধঃপতনের সংগে ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণ

প্রজার শোচনীয় ঔদাসীন্য রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের নিরুদ্বেগ, নির্লিপ্ত ব্যবহারে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক যুগেও প্রতিষ্ঠান ভূমিসাৎ হওয়ার ব্যাপারে আমরা সীতারামের যুগের অধিক অগ্রসর হই নাই।

'চন্দ্রশেখরে' ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভিত্তিস্থাপনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইতিহাস এখানে সুদূর দিক্‌চক্রবালের মত উপন্যাসকে নির্লিপ্তভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। ইতিহাস-সূত্রে ইংরাজের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসিম নিয়তির দুশ্ছেদ্য বন্ধনরজ্জুতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতিহাসের আর বিশেষ প্রাধান্য নাই। ভাগীরথী-তীরস্থ বেদগ্রামের সামাজিক জীবন, প্রতাপ-শৈবলিনীর নির্দোষ, সুখময় কৈশোর-প্রণয়—এ সমস্তই আমাদের সুপরিচিত, অতীতের কুহেলিকাভেদকারী দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে হয় না। সুতরাং বংকিম এখানে পরিচিত ভূখণ্ডেই পদক্ষেপ করিয়াছেন। মীরকাসিমের চরিত্রগৌরব, গুরগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরাজ বণিকের দৃপ্ত শৌর্য ও আত্মপ্রত্যয়—এইগুলি বংকিমের অন্তর্দৃষ্টির সুন্দর পরিচয়। 'আনন্দমঠ' ঠিক ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এখানকার আকাশ-বাতাস আদর্শ লোকের অপার্থিব জ্যোতিঃতে পরিব্যাপ্ত। এই ইন্দ্রজালমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের পরিচয়পত্র লইয়া প্রবেশ করা যায় না। এখানে অতীতের ছদ্মবেশে দেশ-প্রেমিকের কল্পনা-প্রসূত সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, কাজেই ইহা ইতিহাস-রাজ্যের বহির্ভূত। পদচিহ্ন গ্রামে কোন কৌতূহলী পথিকের পদ-চিহ্ন পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর যে শুষ্ক, শীর্ণ কংকাল-কণ্টকিত পটভূমিতে এই সোনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য, ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সহিতই চিত্রিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আর একটু পরের সময়ের প্রতিকৃতি। এখানেও ঐতিহাসিক পটভূমিতে আদর্শবাদের মূর্তিস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য। তবে প্রফুল্ল তাহার নিষ্কাম ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সন্তান-সম্প্রদায়ের মত একেবারে কল্পলোকের উচ্চস্বর্গে বিচরণ করে না। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সিংহাসন হইতে বাঙালী পরিবারের গৃহকর্ত্রীর পদে নামিয়া আসিয়াছে। ভবানী পাঠকের কল্পনা সত্যানন্দের মত আকাশ-স্পর্শী নহে। প্রফুল্লর জীবন-সমস্যা খাঁটি আধুনিক যুগের জিনিস। হরবল্লভ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। 'দেবী চৌধুরাণী'র

ইতিহাসাংশ বাংলায় ইংরেজ-শাসনের দৃঢ়ীকরণের প্রথম যুগের ব্যাপার, সুতরাং এখানে ঐতিহাসিক প্রায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী। অরাজকতা দমন ও শান্তিস্থাপনের জন্য ইংরাজের ব্যর্থ প্রয়াসই দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সূচিত করে। এই বিশৃংখল যুগের এলোমেলো বাতাসে একজন গৃহস্থ-বধূ দস্যুদলনেত্রীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাই এ যুগের ইতিহাস-প্রভাবের বিশেষ পরিচয়। বংকিমের ইতিহাস ত্রুটিবহুল ও অনেকাংশে অনুমানসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তথাপি তিনি ও রমেশচন্দ্র ছাড়া আর কেহ অতীতের মানবিকতা ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সর্বশেষ কথা—বংকিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের যে অদ্ভুত রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্তিসৌধের ভাস্বর স্বর্ণচূড়া। উপন্যাসের চরম কৃতিত্ব মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্যা-সংঘাতগুলিকে মহান ও গৌরবময় প্রতিপন্ন করা, মনুষ্যজীবনের জটিল দুর্জ্ঞেয়তাকে—ইহার পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের তীব্রতাকে ফুটাইয়া তোলা। এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের সহিত তুলনায় বংকিমের কীর্তি স্বতঃই প্রতিভাত হইবে। বংকিমের পূর্ববর্তী উপন্যাসের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু বংকিমের উপন্যাসের সংগে ইহার কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! 'আলালের ঘরের দুলাল' এক প্রকার মিশ্র ও গঠনসামঞ্জস্যহীন রচনা; ইহার মধ্যে বাস্তব-বর্ণনা, সরস কথ্যভাষার সহযোগে ঘটনা-বিবৃতি, চরিত্র-চিত্রণ, নীতিপ্রচার-মুলক বাগাড়ম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিদ্যমান। ইহাকে পূর্ণাংগ উপন্যাস না বলিয়া উপন্যাসের ভ্রূণাবস্থা বলা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রানুগ দৃষ্টি, ঐক্যবিধায়ক মনন-শক্তির এখানে একান্ত অভাব, লেখক কতকটা শিশুর মত চোখের সামনের যে দৃশ্য, তাহার দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া অসংলগ্নভাবে টিকা-টিপ্পনী-মন্তব্য যোজনা করিয়া কলা-নৈপুণ্যের দিক দিয়া নিজের শৈশবোচিত অপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন। মতিলালের দুর্দশা ও অনুতাপ, রামলালের মহানুভবতা, ভ্রাতাদের পুনর্মিলন—এ সমস্তই যেন লঘু হাল্কাভাবে আমাদের স্পর্শ করে—এ যেন রূপকথার দায়িত্বহীন, সুলভ নীতিনিয়ন্ত্রিত, 'সব-ভাল-যার-শেষ-ভাল'-জাতীয় জীবন-যাত্রারই একটা বাস্তবতর সংস্করণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া কি আমাদের জীবনের অপরিমেয় রহস্যময়তা সম্বন্ধে কোন ধারণা হয়? এ

বিষয়ে বংকিমের উপন্যাসের প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। তাঁহার অপরিণত রচনাও আমাদের অন্তরে এক গভীর সুরের রেশ ধ্বনিত করে। আয়েষার ব্যর্থ প্রেম একটি জলভারনত বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতই আমাদের অন্তরতলে ছায়াপাত করে। উদার মনোবৃত্তির সহিত নৈরাশ্যময় বিফলতার বিধিনির্দিষ্ট সংযোগ উপলব্ধি করিয়া মন সম্ভ্রম-বিস্ময়ে অবনত হয়। 'কপালকুণ্ডলা'র জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি সমাধানহীন প্রশ্নের মতই আমাদের অন্তরদ্বারে করাঘাত করিতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ একদিন যাহাকে লোকালয়ের বালুকাতটে শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল, জাহ্নবী-তরংগের আর একটি উচ্ছ্বাস আসিয়া তাহাকে আবার সেই অজানাদেশে ভাসাইয়া লইয়া গেল—ইহার আবেদন রবীন্দ্রনাথের এক ভাবব্যঞ্জনাময় কবিতার সুরের মত আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। মানস-ব্যভিচার আমাদের এই পবিত্রতাস্পর্ধী সমাজেও নিতান্ত বিরল নহে; এবং যে পাপ মনের সীমা ছাড়াইয়া কর্মরাজ্যে পদক্ষেপ না করে, তাহা আমাদেব অত্যন্ত কঠোর নীতিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকেরও দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে। কিন্তু বংকিম শৈবলিনীর এই মানস-পাপের যে আশ্চর্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহার অনুভূতির মধ্যে অনুতাপের যে প্রখর বহ্নিস্ফুলিংগ ছড়াইয়াছেন, তাহা আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে বিভীষিকাময় নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে ও এক সূক্ষ্মতর, অমোঘতর বিচার-বিধানের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' পাঠের পর আমাদের কণ্ঠাগ্রে Shakespeare এর সেই অমর উক্তি 'There are more things in heaven and earth than are dream't of in your philosophy, Horatio' উচ্চারিত হইতে থাকে। দাম্পত্য-কলহ আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং এক প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে ইহাকে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বংকিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের নিরসন করিয়াছেন। যে-কেহ নগেন্দ্রনাথের অনুতাপদগ্ধ বিরহ-ব্যাকুলতা, ভ্রমরের অভিমান-দুর্বিষহ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আর এই লঘু প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-প্রেমের পর নগেন্দ্রনাথের ও গোবিন্দলালের প্রলোভন ও পদস্খলন মানবমনের দুজ্ঞেয়তা, নানা বিরোধী শক্তির সমবায়-ফলে ইহার চাঞ্চল্য ও আদর্শচ্যুতি, আকর্ষণের প্রবলতা ও মোহভংগের তীব্রতা সম্বন্ধে

এক অভিনব আলোকপাত করে। এইরূপে বংকিমের প্রত্যেক উপন্যাসই আমাদের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানব-জীবনের উপর এক অপরূপ অর্থ-গৌরব ও ভাব-মাহাত্ম্য আরোপ করিয়াছে ; রাস্তার ধূলিকণার উপর স্নিগ্ধ সমবেদনার শিশিরবিন্দু-সম্পাতে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। উপন্যাসের এই উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নই বংকিমের সর্ব-প্রধান কীর্তি—তাঁহার হাতে উপন্যাস অখ্যাত জীবনযাত্রার বিবৃতি হইতে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' কেবল ভাবসর্বস্ব, কল্পনা-বিলাসীর উচ্ছ্বাসোক্তি নহে , তিনি সাধারণ জীবনের নিগূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র দেশের মধ্যে মাতৃ-মূর্তির বিরাট সাংকেতিকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আঁকিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের গর্ভধারিণীকেও রত্নপ্রসবিনী, রত্নসিংহাসনারূঢ়া মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কালজয়ী মহামন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে তাহার ভিত্তিস্বরূপ তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ঔপন্যাসিক বংকিম দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি বংকিমচন্দ্রের সাধনামার্গের নির্দেশক ও সিদ্ধির উত্তর-সাধক।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ

১

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে, যখন নূতনত্বের মোহ আমাদের মনকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল, সেই যুগের সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে একটি বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন ইংরাজী সাহিত্যের মোহ এতই তীব্র ছিল যে, আমাদের দেশীয় সাহিত্য আলোচনার সময় আমাদের সমালোচনাপ্রবৃত্তি বংগদেশীয় সাহিত্যিকের একটি ইংরাজী নামাকরণ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইত না। এই প্রবৃত্তি সময় সময় অতিরঞ্জিত হইয়া সামান্য সাদৃশ্যকে বড় করিয়া দেখাইয়াছে ও মৌলিক প্রভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে; কিন্তু ইহার মূলে যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরাজী ভাবে অনুপ্রাণিত কবি, ইংরাজীশিক্ষিত পাঠকের মনে স্বতঃই ইংরাজী সাদৃশ্য ও তুলনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; দেশীয় সাহিত্যে তাহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই বৈদেশিকের সহিত তুলনার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম এই সমালোচনা-প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা, নূতন ছন্দ প্রবর্তনে, ভাষা ও ভাবের নূতনত্বে ও একটা গভীর অর্থগৌরবে স্বভাবতঃই আমাদিগকে মিল্‌টন ও হোমারের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। মাইকেলের পর এই ধারার অনুসরণ করিয়াই আমরা পরবর্তী সাহিত্যিকদেব সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি; নবীনচন্দ্র সেন বাংলার বাইরণ, কালী-প্রসন্ন ঘোষ ইহার কার্লাইল, ও রাজনীতিক্ষেত্রে পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ইহার বার্ক বা মেকলে—এইরূপে প্রত্যেকের এক-একটি ইংরাজী নামকরণ করিয়াই তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী নামে অভিহিত করাই বোধ হয় এই প্রবৃত্তির শেষ অভিব্যক্তি।

কিন্তু প্রথম প্রথম এই নামকরণের মধ্যে যে একটা সার্থকতা ও প্রকৃত রসবোধ ছিল, আজকাল তাহা আর সে পরিমাণে বিদ্যমান নাই। এখন আমাদের চিন্তাধারা যে-পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে ও সমালোচনার ক্ষমতা যতদূর পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক সাহিত্যিক-সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই

প্রকারের সমালোচনার মধ্যে যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমাদের জড়তা ও আলস্যকে প্রশ্রয়ও আমাদিগকে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের কর্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছে। এই একান্ত সহজ নামকরণের অন্তরালে আমাদের লেখকদের স্বরূপটি ও বিশেষত্বগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান্ ও নবোন্মেষসম্পন্ন কবির পক্ষে এইরূপ সমালোচনা নিতান্তই অবিচারের হেতু হইয়াছে। যদিও তাঁহার প্রতিভার সাধারণ-প্রকৃতি শেলীর অনুরূপ, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলেই এই সাধারণ ঐক্যের মধ্যে গভীরতর প্রভেদের লক্ষণ ও উভয়ের সুরের বিশেষত্বগুলি সহজেই ধরা পড়ে। শেলীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্যের সীমানির্দেশ ও প্রকৃতিগত ঐক্যের মধ্যে বিকাশের প্রভেদগুলি লক্ষ্য করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ এক বয়সের দিক দিয়াই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। শেলী ত্রিশ বৎসর বয়সের পুর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর* অতিক্রম করিয়াছেন, শেলীর চিন্তাধারার মধ্যে যৌবনসুলভ অপরিণতি ও সংকীর্ণতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। যৌবনের এই স্বপ্ন-কুহেলিকা-জড়িত ভাবকে তিনি আশ্চর্য কবিতার সুরে প্রকাশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার চিন্তা-কল্পনাগুলির মধ্যে তখনও পরিণতির রং ধরে নাই; তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর সময়ে তিনি নূতন নূতন চিন্তারাজ্যের দ্বার খুলিতেছিলেন মাত্র। যৌবনের প্রচণ্ড আবেগ ও অসংযত উচ্ছ্বাস তখনও একটা প্রশান্ত, আত্ম-সমাহিত শক্তির মধ্যে পর্যবসিত হইতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য-জীবনের শেষদিকে তিনি জীবনের বাস্তব-সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার ভাষা ও ভাবের মধ্যে অস্পষ্টতার ঘোর কাটিয়া একটা তীব্র, গভীরভাবে অনুভূত সত্যের জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইতেছিল। শেলীর প্রথমদিকের কবিতা 'Alastor'এর সহিত মৃত্যুর অল্প পূর্বে রচিত 'Adonais' ও 'Triumph of Life'এর তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন ও পরিণতির প্রকৃতিটি পরিষ্কার হইবে। শেষ দুইটি কবিতার মধ্যেও অস্পষ্টতা ও রহস্যময় দুর্বোধ্যতার অভাব নাই; কিন্তু এই সমস্ত পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের ভিতর হইতে এক আশ্চর্যরকম সত্যের জ্যোতিঃ

* —এই প্রবন্ধ বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সনে লিখিত হয় এবং 'নব্যভারতে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফুটিয়া বাহির হইতেছে, কবির অন্তরের বাণীটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল বেশী বলিয়া তাঁহার কবিতার পরিসর অনেক বৃহত্তর; এবং তাঁহার কাব্যে পরিণতির অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করার চিহ্ন বর্তমান।

(২.)

শেলীর শেষ কবিতা 'Triumph of Life'এর মত তাঁহার জীবনেরও, এক বিরাট উত্তরহীন প্রশ্নের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। জীবন কি, তাহার রহস্য কি করিয়া ভেদ করা যায়—এই প্রশ্ন উচ্চারণের সংগে সংগেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে; এই প্রশ্নের রহস্য তাঁহার সমস্ত মনকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রতিমুহূর্তেই তাঁহার জীবনের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোন সন্তোষজনক সমাধান তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে এই সমাপ্তি ও সমাধানের সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান যে একটা প্রশান্ত, অক্ষুব্ধ সফলতার মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে, তাঁহার সমস্ত চাওয়া যে পাওয়ার মধ্যে পূর্ণকাম হইয়াছে তাহা তিনি প্রতিপদেই আমাদিগকে অনুভব করিতে দেন। অবশ্য যে অফুরন্ত নবোন্মেষ প্রতিভার প্রধান সম্পদ তাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এখনও নিঃশেষিত হয় নাই; এই বয়সেও * তিনি তাঁহার যৌবনের অসামান্য সৌন্দর্য-বোধ ও সুরপ্রাচুর্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া ও গভীরতর চিন্তার সহিত তাহাদের সম্মিলন সাধন করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলেন। তাহা হইলেও মোটের উপর তাঁহার সৃজন-কার্য শেষ হইয়াছে ও একটা বিরাট কার্যের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ আছে, তাহা অনুভব করিবার তিনি অধিকারী হইয়াছেন, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; এবং তাঁহার নিকট হইতে আর নূতনত্বের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার সমস্ত রচনার ব্যাপকভাবে রসোপলব্ধি করা ও আমাদের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত মতামতগুলিকে সংহত ও একীভূত করিয়া তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আমাদের শেষ ধারণাটি স্পষ্টতর করিবার প্রয়াস বোধহয় সমালোচকের প্রধান কর্তব্য।

যে তরুণ বয়সে শেলীর জীবন শেষ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পান নাই; তখনও তিনি ঘন অন্ধকার, অস্ফুট, ছায়াময় কল্পনারাশির ও একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ভাবোচ্ছ্বাসমূলক বিষাদের অপর্য্যাপ্ত

* ('পূরবী' ও 'মহুয়া')

দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর শেলীর 'The Night' অথবা 'Hymn to the Spirit of Delight' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায় যে একটা নূতন, মানুষের অপরিচিত ও অপার্থিব (elfin) সুরটি পাই, তাহা রবীন্দ্রনাথে নাই। শেলীর প্রকৃতিটি সময় সময় মানুষের রক্তমাংস ও নীতিজ্ঞানের বোঝা ফেলিয়া দিয়া একটি অস্বাভাবিক লঘুতা লাভ করিয়াছে; যেন তিনি মানবের জটিল ও বিচিত্র প্রকৃতিটি পরিহার করিয়া একটি মাত্র সরল সুর ও অবিমিশ্র আবেগের সহিত নিজেকে একাত্ম করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি যেন মানব-জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বর্জন করিয়া, বিরুদ্ধভাবের ঘাত-প্রতিঘাত ও জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে বিবিক্ত করিয়া, একমাত্র প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের বা প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, একটি সুরকে আশ্চর্য তন্ময়তার সহিত ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যেও এই জীবনের পূর্ণতা কখনও হারান নাই, জীবনের বিচিত্র রাগিনীকে একমাত্র সুরে পর্যবসিত করেন নাই ; এই বিষয়ে শেলীর সহিত রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কবিতাতেই একটি ব্যাকুল আকাংক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উভয়ের আকাংক্ষার প্রকৃতিটি ভিন্নরূপ। শেলীর আকাংক্ষা অপ্রাপ্যের জন্য ; ইহা তাঁহার কবিতাকে একটি করুণ বিষাদের দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ করিয়াছে। আবার তাঁহার মনে একটা প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না বলিয়া এই বিষাদের ছায়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যে আকাংক্ষা সর্বদা বিদ্যমান তাহা তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয় হইতে আনন্দের সুরের মত উত্থিত হইয়াছে। শেলীর কবিতার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ধর্মভাব বলি, তাহা বিশেষ মিলে না ; যে ভগবানের সহিত আমাদের ভক্তির ও পূজার মধ্য দিয়া সম্মিলন, তাঁহার স্থান শেলীর কবিতাতে নাই। সেইজন্য বিখ্যাত সমালোচক Bagehot শেলী সম্বন্ধে বলেন যে শেলী সৌন্দর্য-বোধকে তাঁহার কবিতার মধ্যে একটি জীবন্ত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন ও ইহাকে মানুষের প্রবল ও অতৃপ্ত আকাংক্ষার বিষয় করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার সহিত প্রকৃত ধর্মভাব, হৃদয়ের প্রকৃত শ্রদ্ধা-ভক্তির কোন সংযোগ সাধন করেন নাই।

পক্ষান্তরে গভীর ধর্মভাব রবীন্দ্রনাথের মনের প্রবলতম শক্তি; তাঁহার প্রত্যেক চিন্তাধারা স্বতঃই ধর্মাভিমুখী; বহির্জগতের সহিত তুচ্ছতম সংস্পর্শও তাঁহার মনের ভগবদ্‌ভক্তি জাগাইয়া তোলে ও ভগবানের সহিত গভীর মিলনের সূত্রপাত করে। ভারতবর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার মধ্যে বর্ধিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি আশ্চর্যরূপ তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ, ও তাঁহার অনুভূতি প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল। এখানেই শেলীর সহিত তাঁহার প্রধান প্রভেদ। শেলীর মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের বাণী বার বার সন্দেহ ও অনুযোগের বাষ্পে বদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা যে শক্তির নিকট তিনি ভক্তিপ্রণত হইবার উপক্রম করেন তাহা নিজেই অনিশ্চিত ও সন্দেহসংকুল।

আবার পৃথিবীর সর্বতোভাবে উন্নতি সাধন করা ও স্বাধীনতার উন্মাদনাকে জাগাইয়া তোলা শেলীর কবিতার দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ দুইটির প্রকাশ বিভিন্ন প্রকৃতির। এই স্বাধীনতাস্পৃহা ও সংস্কারপ্রয়াস তিনি কেবল নৈতিক জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, শেলীর মত তাহাকে একটা রুদ্র ধ্বংসনীতি-প্রচারে রূপান্তরিত হইতে দেন নাই। অবশ্য একদিক দিয়া তিনি বিদ্রোহীপদবাচ্য হইয়াছেন। তাঁহার কবিতা আমাদিগকে পরিচিতের সংকীর্ণ সীমা লংঘন করিয়া বিশাল অপরিচিত জগতের দিকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিতে সর্বদা উত্তেজিত করে; কিন্তু তাঁহার এই দুঃসাহসিকত্বের সমর্থনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতা ও সাংকেতিকতা বর্তমান থাকায় তাঁহার কবিতাগুলি শেলীর সমজাতীয় কবিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়।

ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা রচনায় শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু এখানেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদটি স্পষ্ট দেখা যায়। শেলীর গীতি-কবিতাগুলির মধ্যেই একটা অবিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক প্রবাহ বেশী আছে বলিয়া মনে হয়; রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতার মাঝে মাঝে যে একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় শেলীতে তাহা নাই। এই আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্যের জন্য সময় সময় রবীন্দ্রনাথের গানের সুরটি যেন চাপা পড়িয়া যায়। অবশ্য প্রসার ও বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের স্থান শেলীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে; এবং উভয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষের বিচার করিতে হইলে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান যুগে, যখন মানুষের প্রকৃতি আরও বিচিত্র ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, তখন কবিদের পক্ষে সেই

পুরাতন, সহজ, সরল গানের সুরটি ফিরিয়া পাওয়া নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য নহে। বর্তমান যুগের মানুষের মনে একপ্রকার নূতন, মিশ্র ভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে এবং পুরাতনের যে ভাবগুলি এতদিন গীতিকাব্যে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তাহাদিগকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতেছে। এখন এই নূতন ভাবগুলিই গীতি-কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছে। কিন্তু ইহাদের একটি অসুবিধা এই যে এই আদর্শ-পরিবর্তনের সময় ইহারা এখনও মানবের মনে খুব প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হয় নাই; অনিশ্চয় ও সন্দেহের ধূমাবরণ ত্যাগ করিয়া ধ্রুব সত্যের জ্যোতিঃতে এখনও ভাস্বর হইয়া উঠে নাই, মানবের সাধারণ হৃদয়ের বাণীতে পরিণত হয় নাই। একটা নূতন ভাব মানুষের মনে প্রথম আবির্ভাবমাত্রেই রস-রচনা বা গীতি-কাব্যের জন্য উপযোগিতা লাভ করে না; প্রাথমিক অবস্থার অনিশ্চয় ও বাষ্পময় অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া যখন ইহা মানব-হৃদয়ের সহিত একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে, যখন মানব-হৃদয়ের গভীর আবেগ ও অনুভূতিগুলির সহিত একই আসন অধিকার করে, তখনই ইহা গীতি-কবিতার সুরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অধিকারী হয়। তৎপূর্বে তাহাদিগকে গানে প্রকাশ করিতে গেলে, গানের সুরটি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; বীণার তারটি উচ্চ গ্রাম হইতে বারবার নামিয়া পড়ে ও গীতি-কবিতার যে প্রধান সম্পদ, সেই একান্ত সরল অভিব্যক্তিটি, সেই ঝরণাধারার মত উৎসারপ্রাচুর্যটি নষ্ট হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গীতি-কবিতায় এই অর্ধোত্থিত, অবরুদ্ধ গানের সুরটি আমাদিগকে পীড়িত করিয়া তোলে।

সাহিত্য-সমালোচনার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের স্থান শেলী অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। শেলী তাঁহার 'Defence of Poetry'তে কেবল কবিতার কতকগুলি মূলসূত্র ও কবি-প্রতিভার রহস্য প্রভৃতি কতকগুলি প্রাথমিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও সংস্কৃত-সাহিত্যের সমালোচনার মধ্যে আশ্চর্যরকম রসোপলব্ধি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেগুলিকে নূতন সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য উভয়ের মধ্যে তুলনা করিবার সময় একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে শেলীর সাহিত্যিক জীবন নিতান্ত স্বল্পকালস্থায়ী ছিল এবং তিনি সমালোচনা-ক্ষেত্রের কেবল দ্বারদেশ অতিক্রম করা ছাড়া আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

(৩)

উভয়ের মধ্যে ভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট; তবে তাঁহাদের প্রথম কাব্য-জীবনে ও প্রতিভার বিশিষ্টতা লাভের পূর্বে তাঁহাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য অনুভব করা যায়। কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহারা একই চিন্তারাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন; তারপর আপন আপন প্রতিভার রুচি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে একই রকম সুর পাওয়া যায়। বিশাল কল্পনাসমূহের ক্ষীণ, অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরিপক্ক আলোচনা, একটা অস্বাস্থ্যকর বিষাদ ও অস্পষ্ট, অপরিণত, ছায়াময় ভাব—এইগুলি যেন উভয়ের কবিতার সাধারণ গুণ। এই সমস্ত লক্ষণ শেলীর সর্বপ্রথম কাব্য 'Queen Mab' ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম অবস্থার গীতি-কবিতার মধ্যে তুল্যভাবেই সুপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির নামেই তাহাদের বিষয়বস্তু ও কবির মানসিক ভাবের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে। 'তারকার আত্মহত্যা' (সন্ধ্যা-সঙ্গীত), 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' (প্রভাত-সঙ্গীত), 'মহাস্বপ্ন' (ঐ), 'নিশীথ-চেতনা' (ছবি ও গান);—এই নামগুলিই কবির তদানীন্তন মানসিক বিকারের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও প্রতিভার পরিণতির সংগে সংগেই উভয়ের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। শেলীর স্বপ্নময় অবাস্তবতা তাঁহার 'Prometheus Unbound'এ ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাহার প্রণয়-কবিতার উচ্ছ্বসিত বাণীতে পরিণত হইয়াছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তার মধ্যে একটা গভীরতর বাস্তবতার প্রবর্তন করিয়াছেন; প্রবলতর আবেগ, স্পষ্টতর চিন্তাধারা, মানব-হৃদয় সম্বন্ধে গভীরতর অভিজ্ঞতার সঞ্চার করিয়াছেন এবং উচ্চতর কল্পনার প্রভাবে তাঁহার নূতন কবিতাগুলির আশ্চর্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। ইহার পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম কাব্যজীবনের কুহেলিকাজড়িত অবাস্তবতা বিসর্জন দিয়া, মনের গভীরস্তরশায়ী অস্পষ্ট, অন্ধকারাবৃত ভাব-রাজির বিশ্লেষণ বর্জন করিয়া, এই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, বিচিত্ররূপশালিনী পৃথিবীর সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ও মানবমনের উপর তাহার গূঢ় প্রভাবের রসটি উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইখানেই শেলীর সহিত তাঁহার প্রভেদ বিশেষ প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। শেলীর

প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও রসজ্ঞতার পরিচয় আছে—পৃথিবীর অফুরন্ত ও বিচিত্র সৌন্দর্যরসপানে তিনিও কোনও কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির চিত্রের উপর একটা অপার্থিব, চঞ্চল সৌন্দর্যের ছায়া পড়িয়াছে; তাঁহার অতৃপ্ত দৃষ্টির নিকট পৃথিবীর সৌন্দর্যগুলিও যেন একটা অপ্রকাশিত নূতনরূপ প্রকাশ করিয়াছে, পরিচিত বস্তুগুলিও যেন হঠাৎ অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। শেলী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্যবর্ণনার উপর যেন একটা দূর-সীমান্তবদ্ধ, উদাস মনের রং মাখাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরও পরবর্তী যুগের প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে প্রায় এইরকম বিশেষত্বই লক্ষিত হয়; কিন্তু তাঁহার মধ্যবর্তীযুগের 'মানসী' ও 'সোনার তরী' নামক কবিতাগুলিতে বৈরাগ্যবর্জিত, স্বাভাবিক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কবিতার মধ্যে একটি অনবদ্য প্রকাশক্ষমতা, স্পষ্ট-রেখাঙ্কিত চিত্রসৌন্দর্য ও প্রকৃতির সৌন্দর্যোপভোগের জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা ও প্রবণতা দেখা যায়। শেলীর কবিতার প্রকৃতি-বর্ণনা হইতে ইহা সর্বতোভাবে বিভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা কীটসের সহিত অধিকতর সাদৃশ্য অনুভূত হয়—কবির সৌন্দর্যপিপাসা কীটস্‌এরই মত তীব্র বলিয়া আমরা বোধ করি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তার প্রভাব কীটস্ অপেক্ষা প্রবলতর, এবং প্রকৃতির সহিত মানব-মনের বিচিত্র ও রহস্যময় সম্পর্কটি পরিস্ফুট করিবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁহার অনেক বেশী। নতুবা কেবল সৌন্দর্যবোধের দিক্ দিয়া তাঁহাকে কীট্‌সের সহিত সর্বতোভাবে তুলনা করিলে বোধহয় বিশেষ কোন অবিচার করা হইত না।

আবার জীবনের এই বিচিত্র রহস্যময়তা, প্রকৃতির এই চঞ্চল, অস্থির সৌন্দর্য ও প্রেমের অতৃপ্ত বেদনা শেলী যেরূপ উচ্চস্বরে ঝংকৃত করিয়াছেন, যেরূপ প্রবল আবেগের সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ এতটা পারেন নাই—'Epipsychidion' ও 'Adonais'এর শেষ কয়েকটি stanzaর অনুরূপ কিছু রবীন্দ্রনাথে খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শেলীর মত অতিদূর নক্ষত্রলোকেও পক্ষবিস্তার করে নাই বা সাময়িক অক্ষমতার জন্য খুব নিম্ন প্রদেশেও অবতরণ করে নাই; একটা সমান অক্লান্ত শক্তি লইয়া মধ্যদেশে বিচরণ করিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে তাঁহার বিষয়ের প্রসার ও পরিধি শেলী অপেক্ষা অনেক বেশী; এবং তাঁহার সমস্ত কবিতাতেই

প্রতিভার এমন একটা সমতা (equality) দৃষ্ট হয় যাহা তাঁহার কবিতার পরিমাণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

(৪)

শেলী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রধান ঐক্য তাহা এই যে উভয়েই জীবনের এই আপাতদৃষ্টিতে স্থির ও তুচ্ছ আবরণের অন্তরালে যে চির-চঞ্চল প্রাণ-শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাদের কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই এই জীবনের বহিরাবরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রজালিক সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত তাহার অভ্যন্তরস্থ গূঢ় ভাবসমূহ, অস্পষ্ট, অপরিণত আশা-আকাংক্ষাগুলিকে মূর্তি দিতে চাহিয়াছেন—মোট কথা, যে গূঢ় শক্তির প্রভাবে আমাদের জীবন এত বৈচিত্র্যময় ও রহস্যমণ্ডিত, যাহা জীবনকে এক অফুরন্ত গতি-বেগের দ্বারা নব নব উন্মেষের দিকে পরিচালিত করিয়াছে, উভয়ের কবিতাতেই সেই শক্তির মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। এই অর্থে উভয়কেই দার্শনিক কবি বলা যাইতে পারে—তাঁহাদের কবিতা হইতে যে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতামত সংকলিত করা যায় সে জন্য নহে, পরন্তু উভয়েই জীবনের মধ্যে এক অনন্ত শক্তির প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন, জীবনকে অতীন্দ্রিয়-শক্তি-নিয়ন্ত্রিত ও অধ্যাত্মজগতের প্রতিবেশবেষ্টিত করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা দার্শনিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন। জীবনের মধ্যে যে রহস্যময় অধ্যাত্মচেতনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ও রহিয়া রহিয়া তাহার উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিতেছে, উভয় কবিই সেই অপরিচিত রহস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস-ইঙ্গিতগুলির প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, তাহার মৃদু নিঃশ্বাস-স্পর্শগুলির প্রতি একেবারে উৎকর্ণ হইয়া আছেন ও অনন্তের এই চকিত প্রকাশ, এই অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-ধ্বনিকে তাঁহাদের কাব্যজগতের ছন্দের মধ্যে গাঁথিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ লইয়া উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। শেলীর কাব্যজীবন প্রকৃতই একটি অজ্ঞাত রহস্যের অনুসরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। জীবনের চরম অর্থ শেলীর চক্ষে প্রকৃতই একটি অনিশ্চয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত ছিল। তাঁহার জীবনযাত্রার পথে, অন্ধকারের ভিতর দিয়া অপরিচিত আদর্শের দুঃসাহসিক অনুসরণের

মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চতুষ্পার্শে আলোকবিন্দু জ্বলিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি একটি রেখাতে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গন্তব্যস্থলের উপর অচঞ্চল আলোকপাত করে নাই বলিয়া তাঁহার সংশয়কে বাড়াইয়া তুলিয়াছে মাত্র। শেলী প্রাণপণ শক্তিতে যাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহা বার বার তাঁহার দৃঢ় মুষ্টির মধ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে আলোক স্বভাবচঞ্চল ও যাহা মুহুর্মুহু অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িতে চাহে, শেলী তাঁহার সমস্ত ব্যাকুল আগ্রহের সহিত সেই আলোককে তাহার চক্ষুর সম্মুখে স্থির ও চিরন্তন করিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে অসম্ভব কার্যে আত্মনিয়োগের যে একটি ব্যর্থতা তাহারই করুণ বেদনা পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্বক্ষণই এই পরম সত্যের দিকে স্থির, অচঞ্চল-ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে—তাঁহার নিকট সত্যের রূপ সর্বদাই পরিষ্কার ও অনাবৃত। তাঁহার গভীর বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির জন্য তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়াপাত মাত্র হয় নাই, সুতরাং প্রকৃত অবিশ্বাসীর যে তীব্র বেদনা ও নির্মম আত্মবিশ্লেষণ, তাহা তাঁহার কবিতাতে একেবারেই নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ বিশ্বাসের নিকট পৃথিবীর কোথাও কোন সন্দেহের মেঘাবরণ নাই—অবশ্য জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে দীর্ঘ যোগসূত্র আছে, তাহার মাঝামাঝি দুই এক স্থানে দুই একটি জটিল গ্রন্থি থাকিলেও এই স্বল্প বাধাতে তাঁহার বিশ্বাসের পথ অবরুদ্ধ হয় নাই। সেইজন্য জীবনের মধ্যে এই রহস্যময় ঐশী-শক্তির নিগূঢ় ক্রিয়ার আলোচনায় শেলীর মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; এই অধ্যাত্ম-শক্তির লীলা জীবনের মধ্যে যে নাটক রচনা করিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট নিতান্তই স্বচ্ছ ও সুগোচর। একদিকে মানুষ ও প্রকৃতি, অন্যদিকে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে নিগূঢ় লীলাখেলা, আভাস-ইংগিতের অর্থপূর্ণ বিনিময় চলিতেছে, তাহাদের শুভকারিতা ও চরম অর্থসম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। সেইজন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে শেলীর ন্যায় একটি অতৃপ্ত খেদের বা অপ্রাপ্যের অনুসরণ-জনিত অবশ্যম্ভাবী বিষাদের সুর সেরূপ প্রবল নহে। তাঁহার প্রথম বয়সের কতকগুলি কবিতাতে মাত্র মানুষের প্রতি প্রকৃতির নির্মম ঔদাসীন্য বা প্রবল বিরুদ্ধতাচরণের জন্য বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে—যেমন 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'প্রকৃতির প্রতি' (মানসী)।

আবার 'মানসীর' আরও কয়েকটি কবিতায় যথা 'সিন্ধুতরঙ্গ' ও 'শূন্যগৃহে' প্রকৃতির এই অজ্ঞেয়তা ও পরিবর্তনশীলতাই তাহার প্রতি মানব-মনের আকর্ষণের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শেলীর 'Alastor' নামক কবিতা রবীন্দ্রনাথ কখনও লিখিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না—তাহার মধ্যে যে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসার সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যে রহস্যময় চঞ্চল সৌন্দর্যরাণীর অনুসরণের কাহিনী একটি আশ্চর্যরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিবৎ বিবৃত হইয়াছে, যে অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে আঘাত করিয়া প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মনে তাহার অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। তাঁহার 'সোনার তরী'তে 'আকাশের চাঁদ' নামক একটি কবিতা আমাদিগকে শেলীর সহিত তাঁহার পার্থক্যের প্রকৃতিটি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়—শেলীর Alastorএ কবি আলেয়ার আলোর মতই দূর পর্বত ও গভীর অরণ্যের বিজনতার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং এই অশ্রান্ত ভ্রমণের শেষে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের নায়ক এই অপ্রাপনীয়ের অনুসরণের মধ্যে কেবলই মানব-জীবনের পরিচিত স্নিগ্ধশান্ত সৌন্দর্যের প্রতি বার বার ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর অন্ধকার গর্ভে অন্তর্হিত হইবার পূর্বে প্রাণপণ শক্তিতে ইহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। মোট কথা শেলীর আকর্ষণ অজ্ঞাত রাজ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রার দিকে; রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ আমাদের পরিচিত গৃহী জীবনের দিকে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাতে 'সিন্ধুপারে' নামক একটি কবিতা আছে—ইহা নিশীথ রাত্রে স্বপ্ন-বিচরণের কাহিনী এবং শেলীর অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণের সহিত ইহার অনেকটা ঐক্য আছে; কিন্তু শেষের দিকে পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁহার রহস্যময়ী প্রেমিকার যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হইল, তখন তাঁহার চিরপরিচিত জীবনদেবতারই হাসিমুখ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শেলীর সৌন্দর্যলক্ষ্মী চিরকালই রহস্যময়ী রহিয়া গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরের অন্তঃপুরে আনিয়া গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

(৫)

রবীন্দ্রনাথের অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা অধিকতর মানবসুলভ সহৃদয়তা ও প্রেমের উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ আছে।

শেলীর নিতান্ত অন্তরংগ প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেও একপ্রকার তুষারশীতল স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার 'Epipsychidion'এ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের নিগূঢ় ইতিহাসের মধ্যেও তাঁহার গভীর প্রেমানুভূতির উপরে যেন একপ্রকার ভাস্বর যবনিকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। অবশ্য ইহাতে শেলীকে কবিহিসাবে খর্ব করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে—প্রেমের কবিতায় এই যে একটা শীতল স্পর্শ, এই যে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ-নিরপেক্ষ, যৌন-সম্পর্কের অতীত একটা ভাব, ইহা শেলী ছাড়া অন্য কোন কবির মধ্যে নিতান্ত বিরল—রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাঁহার প্রতিভার পার্থক্যটি নির্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনার মধ্যে কিরূপ গভীর প্রণয়াবেগ ও আনন্দোচ্ছ্বাস সংক্রামিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'সোনার তরী'র অন্তর্ভুক্ত 'মানস-সুন্দরী' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটিতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটিতে কবির আত্মার সহিত বহিঃপ্রকৃতির মিলন-সংগীত ধ্বনিত হইয়াছে—মানবের মনের প্রতি প্রকৃতির যে অসংখ্য প্রকারের আবাহন ও নিবেদন আছে, কবি তাহার সমস্তগুলিকেই এক অপূর্ব সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত করিয়া একটি ব্যাপক প্রণয়-গীতির মধ্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। মানব ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে সনাতন প্রীতিসম্পর্কটি যুগ-যুগান্তর হইতে বর্তমান আছে, তাহা আর কোন কবিই এরূপ ব্যাকুল ও উচ্ছ্বসিত প্রণয়ের ভাষাতে ফুটাইয়া তোলেন নাই, এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রহস্যটি আর কেহই এরূপ অন্তরংগস্পর্শলোলুপ নিবিড় আলিংগনের মধ্যে ডুবাইয়া দেন নাই। যে প্রেম অধীর ব্যাকুলতার বেগে প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের সমস্ত বাধা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াও কেবল নিজের প্রখর নিশ্বাস-বায়ুর দ্বারাই উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যবনিকার সৃষ্টি করে, যাহা বৈষ্ণবকবিদের ন্যায় প্রেমাস্পদকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াও নিজ হৃদ-স্পন্দনের জন্যই একটি কাল্পনিক অথচ অনতিক্রম্য ব্যবধানের অস্তিত্ব অনুভব করে, প্রকৃতিসুন্দরীর প্রতি কবির প্রেম অনেকটা সেই জাতীয়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি যেন শেলীর 'Hymn to Intellectual Beauty' ও 'Prometheus Unbound' এর 'Hymn to Asia'র একটি নূতন সংস্করণ। শেলীর শেষোক্ত কবিতাটি, যে সৌন্দর্য ও প্রণয়ের রূপটি পৃথিবীর বাহিঃপ্রকাশের উপর একটি ভাস্বর ও কম্পমান অবগুণ্ঠনের মত বিরাজমান, তাহার প্রতি কবির ব্যক্তিগত উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন; এই কবিতার সমস্ত উত্তাপ,

উত্তেজনা ও আবেগকম্পিত বাণীর মধ্যে একটা শীতল অশরীরী স্পর্শ অনুভব করা যায়। শেলী যে উগ্রোজ্জ্বল, অপার্থিব সৌন্দর্যের চরণে নিজ প্রণয়-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাহা যেন নিজ জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যেই আত্ম-গোপন করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ মানবধর্ম্মবিশিষ্ট নহে ও মানবসুন্দরীর বেশে ধরা দিতে চাহে না। সেইরূপ তাঁহার 'Hymn to Intellectual Beauty'তে আমরা একটা গভীর খেদের আর্তনাদ, একটা ব্যর্থতার করুণ বিলাপ শুনিতে পাই—যে আলোকরেখা পৃথিবীর জড়পিণ্ডগুলির মধ্যে জীবনীশক্তির ন্যায় গূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, যাহাকে বাঁধিতে পারিলে চরম সিদ্ধি করতলগত হইয়া পড়ে, তাহা কবির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া পুনঃপুনঃ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে; কবি এই চঞ্চল মায়াবিনীর ব্যর্থ অনুসরণে নিজ জীবনের সুখশান্তি বিসর্জন দিতেছেন। এই জাতীয় বিষয়কে কোন একটু পৌবাণিক উপাখ্যানের সাহায্য লইয়া, রবীন্দ্রনাথ কিরূপ আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত করিতে পারেন ও সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহার 'উর্বশী'ই তাহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল—এখানে সৌন্দর্যের পুর্ণ উপলব্ধির মধ্যে কোন খেদের স্বর নাই,কোন ব্যর্থতার ছায়াপাত হয় নাই। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতাটি স্বর্ণ-প্লাবিত পশ্চিম-দিগন্তের দিকে এক প্রেমিক-হৃদয়ের অভিসার-প্রয়াণ; ইহাতে যে রহস্যের ভাবটি আছে তাহা প্রেমের নিবিড় আনন্দে ডুবিয়া প্রেমকে আরও বিচিত্র ও ডুর্নিবার করিয়া তুলিয়াছে মাত্র—Wordsworthএর 'Stepping Westward' নামক কবিতার আধ্যাত্মিক সংযম ও ঔদাসীন্যের সহিত ইহার প্রভেদ কত গভীর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শেলীর সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারেন তাহা নহে। অন্ততঃ একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে শেলীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে—তাঁহার 'বর্ষশেষ' (কল্পনা) কবিতাটির সহিত শেলীর প্রসিদ্ধ 'Ode to the West Wind' এর বেশ সুস্পষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। শেলীর কবিতাটিতে তাঁহার কল্পনার যথেচ্ছ প্রসারের মধ্যেও একটি আশ্চর্য ঐক্যের সুর, ভাবগত পরিণতির এক অচ্ছেদ্য বন্ধন লক্ষ করা যায়; কেন্দ্রগত ভাবটির উপর তাঁহার অধিকার এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় নাই—এক অখণ্ড চিন্তাধারা বিভিন্ন শ্লোকগুলির মধ্যে চমৎকার ভাবে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, এবং অবশেষে এক আশ্চর্য চরম পরিণতিতে নীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যে প্রাকৃতিক

দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া কবির উচ্ছ্বসিত ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি এক দুঃসাহসিক প্রবল কল্পনার দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার মধ্যে শেলীর ন্যায় একটি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয় নাই। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঝটিকার ভাবগত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই, এবং ইহাকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন ও তাহার শ্লোকগুলিকে স্থানে স্থানে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আবার দুই একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথেরই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়—তাঁহার 'রাত্রি' (কল্পনা) শেলীর 'To the Night' নামক কবিতাটির সহিত তুলনায় আরও উচ্চাংগের কল্পনা ও গভীরতর চিন্তার পরিচয় দেয়।

(৬)

অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম, ছায়াময় অনুভূতিগুলিকে সুস্পষ্ট আকার দেওয়ার ও তাহাদিকে একটি গভীর অন্তরংগ প্রেমের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহা সময় সময় তাঁহার বৈদেশিক সমালোচকগণের পক্ষে ভ্রান্তিবিমূঢ়তার হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলির আলোচনা করিতে গিয়া এই বৈদেশিক সমালোচকেরা কতকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সমালোচক টমসন সাহেব অনুযোগ করেন যে পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রভাব যে এখন এতটা খর্ব হইয়া পড়িয়াছে তাহার প্রধান কারণ তাঁহার এই 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলির অস্পষ্ট দুর্বোধ্যতা—তিনি পূর্ব হইতে কোনরূপ মুখবন্ধ না করিয়া ইউরোপীয় শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহার কবি-জীবন-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে যদি তাহারা কেবল নিছক কল্পনার খেয়াল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধী করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় সমালোচকের পক্ষে টমসন সাহেবের সহিত একমত হওয়া সুকঠিন। যিনি বিশেষ যত্নপুর্বক কবির কল্পনার স্বাভাবিক গতিটি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যাখ্যা বা মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কবিপ্রতিভার নিগূঢ় রহস্য—যে অজ্ঞেয় প্রেরণা প্রবল বন্যার ন্যায় কবির ইচ্ছা-শক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, যাহার

তরংগ-মধ্যে কবি একান্ত অসহায়ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন—সেই শক্তির উপলব্ধি কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই যে একা করিয়াছেন, তাহা নহে। শেলীও তাঁহার 'Defence of Poetry' নামধেয় প্রবন্ধে কবি-প্রতিভার এই অজ্ঞেয় রহস্যময়তার বিষয় স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, কবিতা-রচনা কবির ইচ্ছাশক্তির অধীন নহে। খুব প্রতিভাবান কবিও পূর্ব হইতে সময় নির্দেশ করিয়া, বাঁধা ধরা নিয়মানুসারে কবিতা রচনা করিতে পারেন না; কবির বর্হিভূত এক শক্তি, যাহা বায়ুর মত স্বচ্ছন্দবিহারী, যাহার আবির্ভাব-তিরোভাবের উপর কবির কোন অধিকার নাই, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং এই বিষয়টি যে ইউরোপীয় পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাহা নহে। তবে কবি যে ইহাকে গভীর প্রেমের রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার কবিপ্রতিভাকে রহস্যময়ী প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ইউরোপীয় সমালোচকদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি চিরন্তন লক্ষণ; তাঁহার 'মানস-সুন্দরী'তে যে প্রণালী প্রকৃতি ও কবিকল্পনার সম্বন্ধে অবলম্বিত হইয়াছিল, 'জীবন-দেবতা'তে কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে তাহারই একটা স্বাভাবিক প্রসারমাত্র হইয়াছে—উভয় ক্ষেত্রেই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। আবার 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'তে কবি আর একপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া, ভগবানের প্রতি সেই প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা জ্বলন্ত ও উচ্ছ্বসিত প্রেম, ক্রমান্বয়ে বহিঃপ্রকৃতির, কবিপ্রতিভার, সর্বশেষে ভগবানের সহিত তাঁহার সম্পর্কটিকে নিবিড় ও মধুরভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের এই মূলসূত্রটি ধরিতে পারিলে বৈদেশিকের পক্ষে তাঁহার রচনার মধ্যে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিশেষ কিছু থাকিবেনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(৭)

বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও উহার সহিত মানব-হৃদয়ের সম্পর্ক-স্থাপনে প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এক Wordsworth ছাড়া অন্য সমস্ত কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি বর্ণনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে কবিকে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হইবে—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোন কবিই

মানুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ-স্থাপনে এতাদৃশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। দুই একটি সামান্য স্পর্শের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যেন নিতান্ত অনায়াসেই প্রকৃতিকে মানবের বক্ষোলগ্ন এবং তাহার নিতান্ত সাধারণ প্রকাশগুলিকেও মানবের সাময়িক মনোভাবের সহিত একাংগীভূত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে কোন কবিতা যদৃচ্ছাক্রমে খুলিলেই তাঁহার এই অসাধারণ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এত অধিক সংখ্যক প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন যে তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে আমরা স্বভাবতঃই একই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই প্রকৃতি একটি সুন্দর, বিচিত্র বেশে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে, কোথাও কষ্ট-কল্পনা, অস্বাভাবিকতা বা পুরাতনের বিরক্তিকর পুনরুক্তি আমাদিগকে পীড়িত করে না। এই গুণটি তাঁহার কবিতার মধ্যে এত ব্যাপকভাবে বর্তমান যে বিশেষ উদাহরণ নির্বাচন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার সূর্যাস্ত-সন্ধ্যার সমস্ত চিত্রই এক প্রগাঢ় শান্তির রসে অভিষিক্ত; এবং কবি কত সহজে এবং কিরূপ স্বল্প চেষ্টায় এই শান্তির ভাবটি আমাদের নিকট মূর্তিমান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার কবিতায় দিবারাত্রির প্রত্যেক দণ্ড আমাদের হৃদয়ের নিকট একটি বিশেষ রকমের আবেদন জ্ঞাপন, আমাদের মনের প্রতি একটি বিশেষ-রকমের আকর্ষণ বহন করে, ও মানবের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-বন্ধনে গ্রথিত হয়। প্রকৃতির সহিত এই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাত আমরা পাই 'মানসী'তে। এই 'মানসী'ই নানা দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যোৎকর্ষের প্রথম পরিচয়স্থল। 'মানসী'র প্রথম কবিতা 'উপহারে'ই এই গভীর সুরটি প্রথম শোনা যায়; 'অপেক্ষা' নামক কবিতাটিতে দীর্ঘ দিবসটিকে প্রিয়মিলনোৎসুক অধীর প্রেমিকের মনোভাবের মধ্য দিয়া আরও দীর্ঘতর ও মন্থরতর করিয়া দেখান হইয়াছে; সুরদাস নামক কবিতাটিতে Wordsworthএর 'Ruth' নামক কবিতার ন্যায় প্রকৃতির মোহিনী শক্তি কিরূপে কবিকে বিহ্বল করিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রলোভনের বশীভূত করিয়াছিল তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় এবং 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটিতে কিরূপ আশ্চর্য কুশলতার সহিত নীরব নক্ষত্ররাজিকে কুতূহলী শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা করিয়া নভোমণ্ডলকে তপোবনের আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্মীভূত করা হইয়াছে! এই সমস্ত কবিতাই কবির প্রকৃতি-সিদ্ধ হস্তের সুন্দর উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনার আর একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা তাঁহাকে সমস্ত পাশ্চাত্যদেশীয় প্রকৃতি-কবিদের হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। তাঁহার অনেক কবিতাতে এই মাটির পৃথিবীর মূক, মৌন জীবনস্পন্দনের সহিত কবি-হৃদয়ের এক গভীর সহানুভূতি ও নিবিড় মিলনের বিবরণ পাওয়া যায়—পৃথিবীর এই জীবন মানব-জীবনের ন্যায় পূর্ণ পরিণতি ও স্পষ্ট প্রকাশক্ষমতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু ইহা একপ্রকার অস্ফুট গুঞ্জরণ-শিহরণের ন্যায় মানবের স্পষ্টতর বাণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে এক আশ্চর্য অন্তর্গূঢ় সুরে ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে ভরপুর করিয়া দেয়। ইংরাজ রোমাণ্টিক কবিরা প্রকৃতিপ্রেমে মাতোয়ারা বটেন, কিন্তু তাঁহাদেরও পৃথিবীর এই নগ্ন, অসংস্কৃত জীবনকে বরণ করিয়া লইবার সাহস নাই। তাঁহারা প্রকৃতিকে শোধিত ও আধ্যাত্মিকভাবমণ্ডিত করিয়া তবে তাহার নিগূঢ় স্পর্শলাভ করিতে চাহেন। প্রকৃতির আসল জীবনটিকে তাঁহারা অনেকটা সন্দেহের চক্ষে দেখেন; তাহার খরতর বিকাশগুলি, যাহাদিগকে সহজে আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়া যায় না বা মানবমনের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায় না, তাহাদিগকে ইহারা বিশেষ আমল দেন না; তাহাদিগকে কল্পনাসাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া, তাহাদের দেহ হইতে আত্মাটিকে বাহির করিয়া, তবেই তাহাদিগকে আলিংগনপাশে বদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই নগ্ন, অশোধিত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত হইতে চাহিয়াছেন; জীবনের যে আদিম স্পন্দন একটি ঘাসের পাতা হইতে এই বিশাল সৌর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রাণকে আত্মীয়তার নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছে। তিনি প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিংগনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই যে প্রকৃতির প্রতি কবিহৃদয়ের ভাবান্তর, তাহা অনেকটা আধুনিক ক্রমবিবর্তনবাদের মর্মকথাটি কল্পনার সাহায্যে নিগূঢ়ভাবে প্রণিধান করার জন্য সংঘটিত হইয়াছে—আমরা আজকাল স্বভাবতঃ জীবনের অন্যান্য বিকাশ, তৃণ-লতা-পশু-পক্ষীর সহিত একটা সহজ আত্মীয়তা, রক্তের নিগূঢ় ঐক্য অনুভব করিতেছি এবং এই সহজ আত্মীয়তার জন্যই আর আমাদিগকে আধ্যাত্মিকভাব-প্রসূত আত্মীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র অন্তর্ভুক্ত 'বসুন্ধরা' নামক কবিতাটি এই নূতন ভাবের আশ্চর্য পরিচয়স্থল। আমাদের বাংগালী কবি সাধারণতঃ যে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনটা নিতান্ত

নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ আপনার উচ্ছ্বসিত প্রাণবেগে সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনের লক্ষ উৎস হইতে পূর্ণ প্রাণপাত্রটি আস্বাদন করিয়াছেন এবং সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান উল্লংঘন করিয়া একেবারে প্রকৃতির আদিম জীবন-স্পন্দনের সহিত নিজ বক্ষোস্পন্দন মিলাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য প্রকৃতির যে জীবনের সহিত কবি আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা মানুষের প্রতি উদাসীন বা সহানুভূতিলেশ-শূন্য নহে ; প্রকৃতির সেই অপরিণত জীবন অনাদিকাল হইতে মানব জীবনের সুখদুঃখধারায় সিক্ত হইয়া আসিতেছে। নদীর নীলজল-প্রবাহের সহিত মানব চিত্তের সুখদুঃখ-প্রবাহ মিশ্রিত হইয়া তাহার বেগকে বাড়াইয়া দিয়াছে ও তাহার কলকলধ্বনির সহিত এক অত্যন্ত গভীর অনুভূতি ও অর্থগৌরব মাখাইয়া দিয়াছে ; হরিৎপত্রমণ্ডিত অরণ্যানী যে আনন্দ-হিল্লোলে কম্পমান তাহার অনেকটা আনন্দবিভোর মনুষ্যহৃদয়ের দান। প্রকৃতির চারিদিকে মানুষের সুখদুঃখমণ্ডিত আশা-আকাংক্ষা গ্রথিত হইয়া একটা ঘন ভাবময় প্রতিবেশ রচিত হইয়া গিয়াছে ; যুগ-যুগান্তর হইতে মানব-মনের সহিত প্রকৃতির যে নিগূঢ় লীলা ও ভাববিনিময় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির জীবন নূতন অর্থ-গৌরব ও ব্যঞ্জনা-শক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই বর্তমান যুগের কবির পক্ষে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা এত সহজ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তীদের পদক্ষেপে পৃথিবী মাধুর্যময়ী ও ভাবসমৃদ্ধা হইয়াছে; মানবের সহিত তাহার একটা সহজ হৃদয়ের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজেরও আশা যে তাঁহার কবিতা প্রকৃতির মুখের উপর একটি ঘনতর সৌন্দর্য দিয়া যাইতে পারিবে, এবং আজ হইতে এক শতাব্দী পরে ভবিষ্যৎ যুগের পাঠক, প্রকৃতির প্রতি তিনি যে নূতন সৌন্দর্য আরোপ করিয়াছেন তাহা পৃথক করিয়া লইতে ও তাহার বিচার করিতে পারিবে। প্রকৃতির প্রতি ঠিক এই প্রকারের মনোভাব ইংরাজ কবিদের মধ্যে বিরল ; Meredith ও Hardyর কোন কোন গীতি-কবিতায় ইহার অনুরূপ কিছু কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

(৮)

রবীন্দ্রনাথের আর এক শ্রেণীর কবিতায় আমাদের পৌরাণিক গল্প-উপাখ্যানগুলি তাঁহার কল্পনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পুরাতন কাহিনীগুলিকে নূতনভাবে রচনা করা ও

তাহাদের মধ্যে নূতন আলোক ও সৌন্দর্য-সঞ্চারের চেষ্টা ইংরাজ কবি শেলী ও কীট্‌সের মধ্যেও বিশেষ প্রকট। কিন্তু এই বিষয়ে ইংরাজ কবিদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাজ যে আরও অনেক কঠিন তাহা নিঃসন্দেহ। শেলী ও কীট্‌সের কবিতায় যে সমস্ত গ্রীক-দেশীয় পুরাণ-কাহিনী নূতনভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের কলা-সৌন্দর্য খুব পরিস্ফুট এবং তাহারা খুব সহজেই কবি-প্রতিভার নিকট আপনাদের মর্মস্থিত সৌন্দর্য-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। সেই জন্য ইংরাজ কবিদের কাজটি নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল না—তাঁহারা পুরাতন কাহিনীগুলির সহজ ধারাটি অনুসরণ করিয়াই তাহাদের হৃৎ-পদ্মনিহিত সৌন্দর্য-সারে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন; উহাদিগকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিতে তাঁহাদের কল্পনাশক্তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই—পুরাতন হৃদয়ের চারিদিকে নূতন নূতন সৌন্দর্যের পাপড়ি খুলিতেই তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এরূপ কোনও সাহায্য পায় নাই—আমাদের ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি নৈতিক ভাবের আধিক্যে পীড়িত বলিয়া কবি-কল্পনার আলোক-রেখার নিকট নিতান্ত দুর্ভেদ্য বলিয়াই মনে হয়। খনিগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় তাহাদের জ্যোতিঃ অর্ধস্তিমিত হইয়া ছিল এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত গোপন সৌন্দর্যের একটি রশ্মিও বাহিরে প্রতিভাত হয় নাই বলিয়া তাহারা এ পর্যন্ত কবির চক্ষুসমক্ষে আকৃষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সমস্ত বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু অসংগত বা অনুপযোগী তাহা বর্জন করিয়া, তাহাদের অন্তনিহিত সৌন্দর্যটি বাহিরে ফুটাইয়াছেন ও নূতন ভাব ও রসের সঞ্চার করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'মদন ভস্মের পূর্বে' ও 'মদন ভস্মের পরে'—এই দুই কবিতাই রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি মদন দেবতাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া পৃথিবীতে মানব-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যুবকের মত্ত, মুখর উৎসব ও তরুণীর গোপন, নীরব অনুরাগ এই প্রণয়-দেবতাকে ঘিরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মানব জীবনের প্রত্যেক আনন্দ-উৎসবে, প্রতি-দিনের বিলাস-বিভ্রমে ও ক্রীড়া-কৌতুকে দেবতা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। আবার 'মদন ভস্মের পরে' নামক কবিতাটিতে মহাদেবের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীর অনু-পরমাণুর মধ্যে কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, চারিদিকে প্রকৃতির সাধারণ কার্য-কলাপের মধ্যে কিরূপে নিজের প্রচ্ছন্ন

প্রভাবটি বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত দেবতার সেই একাত্মীকরণের কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে। কেবল সৌন্দর্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে Keats এর 'Ode to Psyche' রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি কবিতার সমকক্ষ হইতে পারে ; কিন্তু কল্পনার মৌলিকতায় ও নবীনতায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

এই পুরাতন উপাদানকে নূতন করিয়া গড়িবার আশ্চর্য ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' (মানসী) ও 'বৈষ্ণব কবিতা' (সোনার তরী) প্রভৃতি আরও কতকগুলি কবিতায় দেখা যায়। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনীর কুৎসিৎ অংশটি সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া প্রকৃতির জীবনের সহিত একাত্ম হইবার তাঁহার নিজের যে একটা তীব্র আকাংক্ষা ছিল, তাহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। পাষাণ-রূপিনী অহল্যা আদিম প্রকৃতির চিরন্তন হৃৎ-স্পন্দনটি নিজের বক্ষে অনুভব করিয়াছে ; যে অগণ্য প্রকারের জীব ধরিত্রী-মাতার বক্ষলগ্ন হইয়া তাঁহার স্তন্যরস পান করে, তাহাদের সুখদুঃখের সহিত এক সূক্ষ্ম সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, এবং তাহার জড়-পিণ্ডবৎ দেহের উপর দিয়া যে নূতন চেতনা-রস প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে স্নাত হইয়া এক অকলুষ, নির্মল আত্মার জ্যোতিঃতে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া মনুষ্য-সমাজের মধ্যে আবার নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 'মেঘদূত' ও 'বৈষ্ণব কবিতা' এই দুইটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রভাব ছাড়াইয়া প্রেমের চিরন্তন রূপটি আশ্চর্য-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই দুই প্রকারের কাব্যের ভাবগত আবেষ্টনটি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত পুনর্গঠন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রূপক কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার অবসর হইল না। এই রূপক কবিতার প্রতি প্রবণতা তাঁহার কাব্য-জীবনের শেষ অভিব্যক্তি ; এবং তাঁহার কবিতার এই ধারা এখনও শুষ্ক হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই—সুতরাং এ সময় ইহাদের সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা একটু দুরূহ। কবিতার সহিত আধ্যাত্মিক রূপকের সম্মিলন উভয়ের পক্ষেই একটু বিপজ্জনক ; ইহাদের মধ্যে সম্মিলন দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, কবিতা শুষ্ক, নীরস ও রূপক অস্পষ্ট হইয়া পড়ে ; অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অনেক কবিতা একটি স্বচ্ছ আভাস ও গভীর আধ্যাত্মিক ইংগিতে প্রাণস্পর্শী তাহাতে সন্দেহ নাই—

তাহাদের ছোট-খাট সরল সুরগুলির মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত গভীর রাগিনী বাজিয়া উঠিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দেয়। কিন্তু আবার অনেকগুলি কবিতাতে সুরটি আচ্ছন্ন ও ভাবটি কুহেলিকামণ্ডিত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার এই রূপক কবিতাগুলি ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মনে এক আশ্চর্য রকমের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং যে পর্যন্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে তাহাদের শেষ মূল্যটি নির্ধারণ করিয়া না দেয়, সে পর্যন্ত ইহাই তাহাদের প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এই রূপক-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে নাটকেও সংক্রামিত হইয়াছে, এবং নাটকে তাহার ফল মোটের উপর আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 'বলাকা' নামক কবিতা-সমষ্টিতেই তাঁহার এই গুণটি বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহাতে কবি একটি দার্শনিকোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রহস্যসমাধানের শক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং এই দুরূহ ভাব প্রকাশের জন্য আশ্চর্যরূপ স্বচ্ছ ও প্রকাশক্ষম ভাষার উপর অধিকারও দেখাইয়াছেন—দার্শনিক তত্ত্বান্বেষণের সহিত কাব্য-রস-সৃজনের সুন্দর সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহার ছন্দটিও তাহার স্বচ্ছন্দ লীলায় ও অনিয়মিত গতি-ভংগীতে কবির চিন্তাধারার স্বাভাবিক অনুবর্তন করিয়াছে।

কবির মধ্যে যৌবনের রসধারা এখনও যে প্রচুরভাবে প্রবাহিত, সেই শুভলক্ষণ তাঁহার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পাঠকবর্গ ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত ও আগ্রহপূর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার কবিত্ব-শক্তির উৎস হইতে নূতন নূতন ধারার প্রবাহের জন্য সকলেই সসম্ভ্রমে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

———

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য

(১)

নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সমালোচকই একমত। সেই বিশেষত্বটি এই যে, নাটক ঠিক ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভার উপর নির্ভর করে না; প্রতিবেশ-প্রভাব ইহার পক্ষে প্রায় তুল্যরূপেই প্রয়োজনীয়। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল যুগে ও দেশে নাটকের উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। পেরিক্লিসের যুগে গ্রীক নাটক, চতুর্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী নাটক ও এলিজাবেথ্ যুগের ইংরাজী নাটক সকলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেলে, চিন্তাশীলতা ও দার্শনিক তত্ত্বানুশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্য-সাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক্ ও ভিক্টোরিয় যুগে অনেক প্রতিভাবান কবি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলনীয় কবি-প্রতিভা নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয় নাই। সাহিত্য-রাজ্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা; এবং ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্ গোপন স্তরে লুকান আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অনেকটা এই কারণেই অতি-আধুনিক যুগে নাটকের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা গভীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অনেক চেষ্টার পরেও যখন পুরাতন নাটককে পুনর্জীবিত করা গেল না, তখন লেখক ও সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ এই সত্য ফুটিয়া উঠিল যে, এলিজাবেথ্ যুগের নাটককে বর্তমান কালে পুনর্জীবিত করা যায় না; তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জীবনের ধারা ও সমস্যা এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। যৌবনের স্বপ্ন ও কর্ম্মক্ষমতা প্রৌঢ়জীবনে

প্রতিফলিত করা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের নিকট জীবনের যে-প্রশ্ন, যে-সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একজন আধুনিক নাট্যকারের কাছে তাহারা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। লিয়ারের হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, ম্যাক্‌বেথের মূঢ় রক্ত-পিপাসা, ওথেলোর উন্মত্ত সন্দেহ, হ্যামলেটের অশান্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা—সমস্তই যেন একটা সুদূর জগতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে মানব-হৃদয়ের যে সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহারা চিরন্তন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু উহাদের সে পুরাতন তীব্রতা, সে উদ্দাম গতিবেগ নাই। অকৃতজ্ঞ সন্ততির এখন অভাব নাই, এবং বোধহয় কখনই অভাব থাকিবে না; কিন্তু আত্মপ্রতারণা ও মোহের যে উচ্চ শিখর হইতে ভূমিসাৎ হইয়া বৃদ্ধ রাজা লিয়ারের মর্ম-বেদনা এত করুণ ও অভ্রভেদী হইয়াছিল, বর্তমান জীবনের সমতল ভূমিতে সেই মোহ-পর্বতের স্থান কোথায়? সুতরাং বর্তমান যুগের লিয়ারেরা পড়ে ও কাঁদে, কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে সেই বিরাট, সর্বগ্রাসী সুর নাই। ম্যাক্‌বেথের উচ্চাভিলাষ বর্তমান যুগে হত্যার ছুরিকা না ধরিয়া উপায়ান্তরে নিজ উন্নতির পথ পরিষ্কার করে এবং ডাকিনীর সহিত পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—সুতরাং নাট্যকার তাহার মধ্যে আপনার চরম গৌরবের উপাদান খুঁজিয়া পান না। ওথেলোর ঈর্ষ্যা আজকাল সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়া বিবাহচ্ছেদ-বিচারালয়ের কার্য-বিবরণীর মধ্যে সুলভ সমাধান লাভ করে, এবং ডেসডেমোনা আত্মবলির পরিবর্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ স্বামীর সহায়তাই করে। হ্যামলেটের আত্মজিজ্ঞাসা অবশ্য বিশেষভাবেই আধুনিক কালের ব্যাধি; কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে তাহার চিত্ত-দৌর্বল্য ট্রাজেডির সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার পুনরাবৃত্তির অবসর কোথায়? মোটের উপর শেক্‌স্‌পীয়ারের সময়ের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ সুরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল আধুনিক কালে তাহার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; আজকাল জীবনের দুঃখ-জ্বালা, জীবন-সমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ট্রাজেডির বীরত্বপূর্ণ, অলংকারবহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়—"with little meaning, though the words are strong". বর্তমান জীবনের চরম মুহূর্তগুলি (crises) শেক্‌স্‌পীয়ারের যুগের সহিত এক নয়।

সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি

ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে। ঘটনা-বহুল পঞ্চাংক নাটক বর্তমানের ক্ষুদ্র সমস্যার মধ্যে তাহার রাক্ষসী ক্ষুধার যথেষ্ট খাদ্য পাইতেছে না, সেইজন্য খুব স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহার কলেবর সংকুচিত হইয়া তিন-অংক বা একাংক নাটকে দাঁড়াইতেছে। ভাষার কবিত্বময় উচ্ছ্বাস ও অলংকার-স্ফীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া প্রতিদিনের গদ্যে সংকুচিত হইতেছে। আবার এই আকৃতি পরিবর্তনের সংগে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি-পরিবর্তনও ঘটিতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির যুগে মানুষ বাহিরের বিস্ময় হইতে দৃষ্টি সংহৃত করিয়া অন্তরের গভীরতর রহস্যের দিকে প্রেরণ করিতেছে। বাহিরের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা বহিঃপ্রেরণার জন্য অন্তরের বিক্ষোভ যে-পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিতেছে, সেই পরিমাণে অন্তরের নীরবতা এক অপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হইয়া নূতন অর্থগৌরবে ভরিয়া উঠিতেছে। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহস্যের সংকেত ও ইংগিত স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। বাঁশীর মধ্যে ফুংকার-বায়ুর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত নীরব, নিশ্চল পদার্থের মধ্যে একটা গোপন শক্তির আনাগোনা, তাহার মৃদু পদক্ষেপ ও অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য (mysticism) ও সাংকেতিকতা (symbolism) সর্বপ্রথম গীতি-কবিতার ছন্দে গাঁথা পড়ে। কিন্তু এই লীলাময় বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষতঃ মানব-মন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গীতি-কবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের নাট্য-সাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে। ইহাকে symbolical drama বা রূপক-প্রধান নাটক নামে অভিহিত করা হইতেছে। Maeterlinck, Yeats, Synge প্রভৃতি এই নূতন নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। এই নূতন নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধে Maeterlinck যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, পুরাতন নাটকের সহিত ইহার কি গভীর মূলগত প্রভেদ।—

"I have come to believe that an old man seated in his arm-chair, waiting quietly under the lamp-light, listening without knowing it to all the eternal laws which reign

about his house……bowing his head a little, without suspecting that all the powers of the earth intervene and stand on guard in the room like attentive servants…—I have come to believe that this motionless old man lives really a more profound, human, and universal life than the lover who strangles his mistress, the captain who gains a victory, or the husband who 'avenges his honour'."

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এই সাংকেতিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই নূতন নাটকের আদর্শেই তাঁহার নাটকগুলির বিচার করিতে হইবে।

(২)

এই সাংকেতিকতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকগুলির মধ্যে ততটা সুপরিস্ফুট নহে। তাহাদের প্রধান বিষয় হইতেছে ধর্মঘটিত বিরোধ, ধর্মের প্রাণহীন সংস্কারের সহিত প্রবুদ্ধ ধর্মজ্ঞানের সংঘর্ষ। এই ধর্মপ্রাণতা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেরই সাধারণ লক্ষণ; কিন্তু আগেকার নাটকগুলির মধ্যে ধর্মের যে বিচার ও আলোচনা হইয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও হৃদয়-ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাহার মধ্যে রূপকের ভাস্বর আবরণ নাই, সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-বিকাশ খেলিয়া যায় না। হয়ত কোথাও কোথাও এই রহস্যময় ইংগিতের একটা অস্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছায়াবরণের পশ্চাতে যে গোপন লীলাময় খেলা চলিতেছে তাহার অপরূপ নৃত্য-ভংগীটি আমাদের কানে বাজিয়া উঠে না। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে আসল রূপ তাহা তাঁহার পরবর্তী নাটকেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই সাংকেতিকতার ক্রম-বিবর্তনের দিক্ দিয়াই তাঁহার নাটকগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) প্রকৃতির পরিশোধ; (২) মালিনী; (৩) রাজা ও রাণী; (৪) বিসর্জন—এই কয়েকখানি নাটককেই পূর্ব-সাংকেতিকতা (Pre-symbolism) যুগের বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'অচলায়তনের' স্থান দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি। ইহাতে যদিও রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু সেই স্পর্শের মধ্যে রহস্যঘন, লীলাচঞ্চল সুরটি বেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ পায় নাই।

ইহার প্রধান বিষয় হইতেছে জরাজীর্ণ, কুসংস্কার-কীট-জর্জর হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ ; এবং এই আক্রমণের মাত্রাধিক্যই রহস্যের স্বরটির অবাধ ও সাবলীল প্রকাশে বাধা দিয়াছে। সাংকেতিক নাটকের মধ্যে—(১) রাজা ; (২) ডাকঘর ; (৩) ঋণশোধ বা শারদোৎসব ; (৪) মুক্তধারা ; (৫) রক্তকবরীকে ফেলা যাইতে পারে। সর্বশেষ নাটক 'নটীর পূজা' অনেকটা সাংকেতিকতা-প্রভাব-মুক্ত ও তাহার মধ্যে সাধারণ নাটকোচিত গুণের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আদি-যুগের নাটকগুলি অনেকটা সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত। তাহাদের মধ্যে যে-বিরোধের সংঘাত অংকিত হইয়াছে, তাহা মূলতঃ অভিন্ন-প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত নাটকেই একই প্রকার সংঘাতের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছেন—প্রকৃত স্বাধীন ধর্মজ্ঞানের সহিত প্রতিষ্ঠান-বদ্ধ, আচার-ভার-ক্লিষ্ট ধর্মমতের সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষের বাহ্য-বিকাশ হইয়াছে রাজশক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির তুমুল প্রাণপণ সংগ্রামে। রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর রাজশক্তিকে স্বাধীন ধর্মজ্ঞানের অনুকূল ও ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে প্রাণহীন ধর্মান্ধতার দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে দেখাইয়াছেন। আবার নাটকীয় সংঘাতকে ঘনীভূত করিবার জন্য এই দুই প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও ভেদের অবতারণা করিয়াছেন। 'বিসর্জনে' রাণী ধর্মান্ধ পুরোহিতের দলে যোগ দিয়া রাজার কর্তব্য-পালনকে দুঃসাধ্যতর ও তাঁহার মনোবেদনাকে গভীরতর করিয়া দিয়াছেন ; আবার পুরোহিত-পক্ষীয় জয়সিংহ তাহার চিত্তসংশয় ও গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা রঘুপতির লৌহমুষ্টিকে কতকটা শিথিল ও তাহার দর্পিত বিজয়-শ্রীকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রাজকন্যা মালিনীর সুকুমার সার্বজনীন ধর্মের বিরুদ্ধে সংস্কারগত সনাতন ধর্মমতের যে-বিরোধ তাহার অগ্নিস্ফুলিংগ অংকুরেই বিনষ্ট হইল বটে ; কিন্তু চিরসুহৃৎ ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ের যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাই নাটকখানিকে ট্রাজেডির রক্ত-রাগে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল। 'রাজা ও রাণী'তে বিরোধের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র ; রাজা বিক্রমদেবের অভিমান-ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত প্রেমপিপাসার সাংঘাতিক বিজিগীষার দিক্-পরিবর্তনই ইহার মুখ্য ব্যাপার ; কিন্তু বিক্রম ও তাহার প্রতিযোদ্ধা কুমারসেনের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, রাণীর বিরুদ্ধে রাজার মর্মান্তিক অভিমানই তাহার ফিকে রংএর উপর এক গাঢ়তর বিষাদ-কালিমা লেপন করিয়াছে। 'প্রকৃতির পরিশোধে'ও কেন্দ্রস্থ

বিরোধ-কাহিনীটি একটু নূতন রকমের—একজন উদাসীন, সংসারের প্রতি জাতক্রোধ, মোহমুক্ত সন্ন্যাসীর সংসারের স্নেহ-মায়া-মমতার নিকট আত্মসমর্পণ। এখানে দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণরূপেই অন্তরের, কোন বহিঃশক্তির সহিত সংঘাত ইহার মধ্যে নাই।

এই সমস্ত প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে নাটকোচিত গুণের কতখানি বিকাশ হইয়াছে, ইহার আলোচনা করিতে গেলে কোন্ আদর্শে ইহাদের বিচার হওয়া উচিত, তাহাই সর্বপ্রথম নির্ধারণীয়। একদিকে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁহার নাটকগুলিকে সাধারণ নাটকের কঠোর নিয়ম-শৃংখলে আবদ্ধ করিতে চাহেন নাই। উহার সুনির্দিষ্ট অংক-গর্ভাংক-সংবলিত 'ঘন-পিনদ্ধ-কায়া', তাঁহার মনের মধ্যে যে মুক্তপক্ষ বিহংগ ডানা মেলিয়া আছে, তাহাকে লৌহপিঞ্জরবৎ পীড়িত করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত নাটকেই একটা শিথিল, স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গঠন আছে। তাঁহার লেখায় গীতি-ধর্মের অতি-প্রাধান্য যে অন্যান্য গুণকে অনেকটা হ্রস্ব ও সংকুচিত করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং খাঁটি নাটকের চির-প্রথাগত আদর্শ অনুসারে তাহাদিগকে বিচার করিতে গেলে উহাদের প্রতি বোধহয় সুবিচার করা হইবে না। আবার পক্ষান্তরে নাটকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, যাহাকে বিসর্জন দিলে নাটকের বাহ্যরূপ অবলম্বন করার কোনই সার্থকতা থাকে না। গীতি-প্রতিভা যতই উজ্জ্বল ও প্রচুর হউক না কেন, তাহা নাটকীয় গুণের অভাব পূরণ করিতে পারে না। নাটকের পাত্র-পাত্রীর নিয়ন্ত্রিত কথোপকথনের দ্বারা এমন একটি তীব্র, ঘন বিরোধের ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা গীতি-কাব্যের স্বতঃ-উৎসারিত একটানা প্রবাহের মধ্যে মিলে না। সেইজন্য 'কর্ণ ও কুন্তী' এবং 'কচ ও দেবযানী' নাটকের বাহ্য লক্ষণাক্রান্ত হইলেও ইহাদিগকে নাটক বলিয়া ভুল করা যায় না। নাটকের মধ্য দিয়া একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘনীভূত নির্যাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেই হইবে, যেখানে ইহার অভাব সেখানে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই বিরোধের প্রকৃতি এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক নাটকে পূর্বের ন্যায় সমুদ্রমন্থন,' দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম, দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধের অবসর না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে একটা নূতন ধরণের খেলা, প্রাণের মধ্যে একটা নূতন শক্তির আনাগোনা, একটা নূতন, রহস্যময় অতিথির লঘু পাদসঞ্চার, একটা নব

পরিচয়ের নিগূঢ় আবেগ ও উন্মাদনা দেখাইতে হইবে। সাংকেতিক নাটকে পূর্বকালের যুদ্ধের পরিবর্তে এই নূতন খেলার নৃত্যটি ফুটাইয়া তোলা হয় বলিয়া তাহার নাটকরূপে পরিচিত হইবার দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যুগের নাটকগুলির মধ্যে এই কেন্দ্রস্থ ভাবটির—তাহা বিরোধই হউক বা নব-পরিচয়ের প্রাণস্পন্দনই হউক—অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ভাবটি কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর উহাদের নাটকীয় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। তিনি নাটকের বাহ্য অবয়ব ইচ্ছাপূর্বকই বর্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সমালোচককেও ইহাকে গৌণ অংগ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার নিয়ম-লংঘন ও গীতি-কাব্যসুলভ আতিশয্যের মধ্যে নাটকীয় মূলসূত্রটি পাওয়া যায় কি—না, তাহার জন্য সমস্ত দৃষ্টিশক্তি ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হইবে।

(৩)

এইবার নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। 'প্রকৃতির পরিশোধ' কবির প্রথম বয়সের রচনা। যে অস্বাস্থ্যকর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার প্রথম কবিতাগুলির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা এই নাটকেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। ইহার নাটকোচিত গুণ খুব সামান্য। ইহাতে চরিত্র একটিমাত্র, এবং তাহার উক্তিগুলিও সমস্ত একতরফা। প্রকৃতির উপর সন্ন্যাসীর অভিমান ও বালিকার স্নেহ-আকর্ষণের মধ্যে যে-সংঘাত, তাহার মধ্যে নাটকীয় রূপ ও তীব্রতার একান্ত অভাব। অবশ্য সন্ন্যাসীর মনের পরিবর্তন-স্তরগুলি সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও নাটক এক নহে। বাহিরের যে ঘাত-প্রতিঘাতে এই মানসিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাস্তব-জীবনের যে কয়টি ছবি সন্ন্যাসীর মনোবিকারের হেতু-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অসংলগ্ন ও স্বল্পপরিসর, কোন উচ্চতর ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হয় নাই। স্থানে স্থানে আশ্চর্য কবিত্বের উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভাষা মোটের উপর অপরিপক্ক ও নাটকের অনুপযোগী। সেইজন্য মনে হয় যে লেখক বিষয়-নির্বাচনে নাটকোচিত সম্ভাবনার সন্ধান করেন নাই ; ভাষার উপর অধিকার ও প্রকাশক্ষমতা পরীক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'মালিনী'তেও নাটক অপেক্ষা গীতি-কাব্যেরই লক্ষণ অধিক সুপরিস্ফুট।

বইখানি আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বলিয়া মনে হয় যে, কবি ইহাকে নাটকের রূপ দিতে চেষ্টাই করেন নাই—ইহা যেন 'কচ ও দেবযানী' বা 'কর্ণ ও কুন্তী'র বৃহত্তর সংস্করণ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি প্রায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে—ভাষার জড়তা ও দৈন্য সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া একটা পূর্ণ প্রবাহের জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু কোন নাটকীয় প্রতিবেশ রচনা বা নাটকোচিত গুণের বিকাশের দিকে কবি একেবারেই উদাসীন। মালিনী, রাজা, রাণী ইত্যাদি কেহই নাটকের পাত্র-পাত্রী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না। তাহাদের নিজ বক্তব্যটি তাহারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে, অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু নাটকের ন্যায় একের উক্তি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার কোন লক্ষণই নাই। এক ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ের সম্পর্কের মধ্যে সামান্য একটু নাটকোচিত গ্রন্থিজাল পড়িয়াছে, কিন্তু সে-সমস্যা অতি সামান্য ও তাহার সমাধানও খুব সুলভ। 'মালিনী'তে গীতি-কাব্যেরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য, নাটকের বাহ্যরূপ তাহার অত্যন্ত স্বচ্ছ ছদ্মবেশ মাত্র। কবি যেন তাঁহার কাণায়-কাণায়-পূর্ণ গীতি-শক্তির একটা অনাবশ্যক তরংগ নাটকের শুষ্ক, শীর্ণ খাত দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন—নাটকের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বলিয়া নয়, একটা নবলব্ধ শক্তির উচ্ছ্বসিত বাধা-বন্ধহীন আনন্দে।

'বিসর্জন' ও 'রাজা রাণী' এই দুইখানি পূর্ণাবয়ব পঞ্চমাংক নাটক এবং ইহাদের মধ্যে নাটকের রীতি-নিয়ম যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে পালনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুইটিতে কবি নাটকের সূক্ষ্ম বিধি-নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে নিজ মুক্ত-স্বাধীন কবি প্রতিভাকে আবদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে নাটকীয় আদর্শে বিচার করা অন্যায় হইবে না। ইহাদের মধ্যে 'বিসর্জন' নাটকটি অনেকটা কবির নিজ অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য জনসমাজে অধিকতর পরিচিত।

রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য-শক্তির বিরোধের যে ক্ষীণ আভাস 'মালিনী'তে পাওয়া যায় তাহা এখানে নাটকোচিত পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। রঘুপতি গোবিন্দ-মাণিক্য পরস্পরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ; তাহাদের ইচ্ছাশক্তির পরস্পর সংঘাতে যে দাহ ও দীপ্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা নাটকীয় রূপ ধারণের উপযুক্ত—কেবল গীতি-কবিতায় তাহার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। ক্ষেমংকর যে-বিদ্রোহ গীতি-কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে, রঘুপতিতে

তাহা একেবারে উদ্দাম হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও কার্যক্ষেত্রে তাহার তীব্র অভিব্যক্তি হইয়াছে। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বটি নাটকের পক্ষে প্রবল ও ব্যাপক —বাস্তবিকই একটা গভীর অন্তর্বিপ্লবে তাহার মর্মস্থল পর্যন্ত উৎপাটিত হইতেছে, ইহা আমরা অনুভব করি। 'প্রকৃতির পরিশোধে' সন্ন্যাসীর অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট ক্ষোভ এখানে কায়া ও মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং নাটকীয় উপাদান ও প্রচেষ্টা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু তথাপি নাটক হিসাবে ইহা খুব উচ্চাংগের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর উক্তিগুলি অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও বাহুল্য-দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাটকোচিত সংযম ও অর্থপূর্ণতার অভাব। জয়সিংহের স্বগতোক্তিগুলিতে বিশেষভাবে এই দোষ লক্ষিত হয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত, অটল তেজস্বিতা ও স্নেহসিক্ত ন্যায়নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন, নাটকে ততটা ফুটিয়া ওঠে নাই। রাজা ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যে তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্যে যে-কথোপকথন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ছিল; কিন্তু লেখক সেই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তারপর নাটকের ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর খুব উপযোগী হয় নাই। কোন কোন দৃশ্য অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা শূন্যগর্ভ গীতিকাব্যোচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস। অপর্ণা 'প্রকৃতির শোধের' অনাথা বালিকার আর একটু উন্নততর সংস্করণ; কিন্তু তাহার অবিমিশ্র, একটানা খেদবাণী নাটকের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় নাই। লেখকের ভাষা গীতি-কাব্যের দিক দিয়া বেশ কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকের দমকা হাওয়ায় ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল নাটকের দাবী মিটাইবার পক্ষে যেন যথেষ্ট লঘু ও স্বচ্ছন্দগতি নয়। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, তাহা বুঝিতে গেলে তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সহিত 'বিসর্জন' নাটকটির তুলনা করিলেই চলিবে। উপন্যাসে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত মাধুর্য ও কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছেন; নাটকের অপরিচিত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা যেন অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া খণ্ডিত ও প্রতিহত হইয়াছে। রাজার যে অবিচল মূর্তিটি উপন্যাসে জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটকে যেন তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও হীনপ্রভ। উপন্যাসটি তাঁহার ডান হাতের লেখা ও নাটকটি যেন বাঁ হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়।

'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের অ-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া

মনে হয়। ইহাতে নাটকীয় অবসরও অনেক; কবি এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা প্রকৃত tragic sense, একটা প্রতিকূল দৈবের ক্ষমাহীন বিরোধের ভাব অনুভব করা যায়। বিক্রমদেবের মানসিক পরিবর্তন বেশ নিপুণভাবে ও যথেষ্ট হেতুবাদের সহিত সাধিত হইয়াছে। সুমিত্রার পতিগৃহ হইতে পলায়ন, খুব সাধারণ ঘটনা হইলেও, এমন একটা দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা মোচন করিতে কুমার ও সুমিত্রার শোচনীয় আত্মবলিদানের প্রয়োজন হইয়াছে। অপ্রধান চরিত্রগুলিও বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে, লেখক যেন দুই একটি কথাবার্তার দ্বারাই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটাইতে পারিয়াছেন। কুমারের পরিণাম নিয়তি-নিষ্পেষণের একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত। তাহার সবই ছিল—অপরিমেয় প্রেম, প্রজা ও সৈন্যদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ক্ষাত্রশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের অগ্নিপরীক্ষায় এ সমস্তই দুর্বার বন্যাস্রোতে বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া গেল। আর সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার নিজের মহত্ত্বই তাহার নিজের মাথার উপর দুর্ভাগ্যের বজ্রকে ডাকিয়া আনিল। ভগিনীর অনুরোধে ও ভগ্নীপতির সাহায্যার্থই তাহার প্রথম কার্যক্ষেত্রে অবতরণ; কিন্তু এই উদার, স্নেহশীল ব্যবহারের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তারপর আমরা ইহাও অনুভব করি যে, যদি কুমার নিজের বীর প্রবৃত্তির বাশ ছাড়িয়া দিয়া কাশ্মীরের বহির্দেশে বিক্রমদেবের সহিত রণক্ষেত্রে শক্তি-পরীক্ষা করিত, তাহা হইলে বোধহয় বিক্রমের অন্ধ হিংসা ও রোষানল সহজেই নির্বাপিত হইত। কিন্তু যে মুহূর্তেই সে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমা ও মৈত্রীর বাণীতে কর্ণপাত করিল, সেই মুহূর্তেই আপন সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। আবার ইলার সহিত বিবাহ অসম্পূর্ণ রাখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাহার উদার প্রকৃতির আর একটি সাংঘাতিক ভুল। কেননা বিবাহ তাহার ভাবী শ্বশুর অমরুরাজের দুর্বল, সংশয়াকুল চিত্তকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিয়া সর্বনাশের অন্ততঃ একটা ছিদ্রপথও বন্ধ রাখিতে পারিত। সেইজন্য কুমারের অপরাধের শাস্তি আমাদিগকে কর্ডেলিয়া বা হ্যামলেটের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উদার হৃদয়ে ঔদার্যজনিত যে-দুঃখ তাহাই ট্রাজেডির প্রকৃত উপজীব্য।

অন্যান্য দিক্ দিয়াও নাটকটির অনেক উন্নতি দেখা যায়। ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর প্রশংসার্হ, তবে পঞ্চম অংকটিকে পুঞ্জীভূত ঘটনার চাপে অযথা

ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে; ইহার কিয়দংশ চতুর্থ অংকে সন্নিবেশ করিলে নাটকের গঠন-সামঞ্জস্য আরও উন্নতি লাভ করিত। গ্রাম্য লোকের চরিত্র 'বিসর্জনে'ই অধিকতর নিপুণতার সহিত অংকিত করা হইয়াছে, কেননা ধর্মমোহ তাহাদের চরিত্রের একটা প্রধান অংগ; 'রাজা ও রাণী'র গ্রাম্য-লোকদের সেরূপ কিছু বিশেষত্ব নাই। সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি দেখা যায় ভাষার দিক দিয়া—ভাষার মধ্যে কবিত্ব এবং নাটকোপযোগিতা উভয় গুণই একসংগে রক্ষিত হইয়াছে। 'বিসর্জনে'র আতিশয্য ও অনুচিত দৈর্ঘ্য নাটকের প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। যদিও ইহাতে খুব উচ্চ অংগের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় নাই, যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পর্শের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার মানব-হৃদয়ের গভীর অন্ধকার তলদেশে আকস্মিক আলোক-রেখাপাত করেন, তাহা বিরল, তথাপি কবিত্বপূর্ণ সুগঠিত নাটকের মধ্যে ইহার স্থান উচ্চে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

(৪)

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে 'অচলায়তনে' সাংকেতিকতার প্রথম সূত্রপাত। ইহাতে তিনি চিরপ্রথাগত নাটকের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া সাংকেতিকতার গহন পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন। পুর্ব নাটকের সহিত ইহাদের বিষয়গত প্রভেদ যে খুব বেশী তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মপ্রবণ মন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই উদ্দেশ্যের অনুসরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান হইতে ইহার প্রকৃত রূপটির পৃথকীকরণই তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু এখন হইতে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তাঁহার কবিতায় যেমন, নাটকেও তেমনি একটা নূতন পন্থা প্রবর্তনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এখন তিনি ধর্মের মর্মবাণী তত্ত্বকথায় প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ের একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি, একটি সূক্ষ্ম, অপরূপ স্পর্শের মত দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। রঘুপতি ও রাজা গোবিন্দমাণিক্য, ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ধর্মের আদর্শ ও স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পরের মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এখন হইতে লেখক যুক্তিতর্কের পথ বর্জন করিয়া ঠাকুরদাদার মত সরল, আনন্দময় বৃদ্ধ, অমলের মত স্বচ্ছ, অনাবিল-দৃষ্টি বালক, সুরংগমার মত হীন অথচ ভগবৎ-কৃপায় ধন্যা নারী প্রভৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়া ভগবানের রহস্যময়, অথচ নিঃসন্দেহ আবির্ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের নিকট ভগবান

অনধিগম্য, অপ্রাপনীয় নহেন ; উপনিষদের 'যতো বাচঃ নিবর্তন্তে' ইহার প্রতি প্রযোক্তব্য নহে। ইনি ইহাদের একান্ত আত্মীয়, অত্যন্ত নিকট ; ইহার স্পর্শ বসন্ত-পবন-হিল্লোলের মত ইহাদের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয় ; চারিদিকের আকাশ-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইহার আভাস ও ইংগিতে পূর্ণ ; ইহার আবির্ভাব তিরোভাব ইহাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে নিজ নিঃশব্দ পদসঞ্চারের ছাপ রাখিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সন্দেহ-সংকুল, অবিশ্বাসী যুগের মধ্যে ব্রজলীলার পুনরভিনয় ঘটাইয়াছেন—অথচ বর্তমান চিন্তাধারার সহিত ইহার কোন অসামঞ্জস্য নাই। এখানে পৌরাণিক যুগের অতি-প্রাকৃত বা ভগবানের অত্যন্ত স্থূলদেহ ধারণ আমাদের বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করে না। বিজ্ঞান আমাদের সনাতন মন্দিরগুলি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ও পুরাতন বিগ্রহগুলি চূর্ণ করিয়াছে সত্য ; কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাস ইহাদের সহিত সহমরণে যায় নাই। ভগবান তাঁহার পুরাতন আশ্রয়চ্যুত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন ও নূতন উপায়ে ভক্তহৃদয়ের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পূজার উপাসক ও এই নূতন মন্ত্রকে বাণী দিয়াছেন—ভগবানের সহিত মানব-মনের মিলনের এই অবিনশ্বর আকাংখাকে, আনন্দ-উপলব্ধি ও ব্যাকুল প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া, নাটকীয় রূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকের মধ্যে ভগবানের স্বরূপটি, নীরস তত্ত্বকথায় নহে, সরস লীলামাধুর্যে, মানব-মনের সহিত বিচিত্র, চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাতে, যতই সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে, ততই নাটক হিসাবে তাহাদের সার্থকতা ও উৎকর্ষ ; এবং দুই দিক দিয়াই তাহাদের নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

'অচলায়তনে'র রূপক খুব সুস্পষ্ট নহে ; বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের তলে ইহা চাপা পড়িয়াছে। কবি ভগবানের স্বরূপটি ফোটান'র পরিবর্তে, যে-জীর্ণ প্রাণহীন আচার-সংস্কারের বোঝা ভগবানকে অধিকাংশ চিত্ত হইতে আড়াল করিয়াছে, তাহাদের বর্ণনাতেই অধিক জোর দিয়াছেন। ব্যংগ-বিদ্রূপ যে সাহিত্যিক অস্ত্রশালার একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু নাটকের ভিত্তি খুঁড়িবার কাজে ইহার যে কতটা উপযোগিতা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। যে-সমস্ত যুক্তিহীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিদ্রূপের স্থল হইয়াছে, তাহারা নিজ বার্ধক্যের ভারে ও যুগধর্মের স্বাভাবিক প্রভাবে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে ও কবিতায়, উপন্যাসে

ও তত্ত্বালোচনায় চারিদিক হইতে তাহাদের উপর যে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে অমর না হইলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য। এরূপ অবস্থায় আবার নাটকের পৃষ্ঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধক্ষেত্র রচনা অনেকটা বৃথা শক্তি-ব্যয় বলিয়াই মনে হয়। সে যাহা হউক, এই ব্যংগ-বিদ্রূপের প্রাধান্য নাটকখানির উৎকর্ষের হানি করিয়াছে। অনেক অংশ caricature বা অতিরঞ্জিত ব্যংগ-চিত্র বলিয়াই ঠেকে ; আর যোদ্ধবেশমণ্ডিত দাদাঠাকুরকে ভগবানের সম্পূর্ণ প্রতীক্ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের মন সায় দেয় না। অনার্য অন্ত্যজ জাতির নেতৃত্ব ও প্রীতি-সাহচর্য ঐশী লীলার একটা দিক হইতে পারে ; এবং অচলায়তনের বল্মীকাচ্ছন্ন প্রাচীর ধ্বংসও তাঁহার অন্যতম যোগ্য কীর্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু ইহারা কি ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহৈশ্বর্যময় চরিত্রের উপযুক্ত নিদর্শন? দাদাঠাকুরের সরল খেলাধূলার মধ্যে অগ্নিগর্ভ মেঘের ন্যায় কোন গোপন মহিমার বিদ্যুৎ-বিকাশ দেখা যায় না। কেবল আচার্য অদীনপুণ্যের দ্বিধাজড়িত চিত্তের মধ্যে দীর্ঘ অপরিচয়ের জন্য বিস্মৃত-প্রায়, আদি ধর্ম-গুরুর আগমনের যে ক্ষীণ, শংকিত পূর্ব্বাভাস রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠে, তাহাই ভগবৎ-প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলিয়া আমরা অনুভব করি ; কিন্তু এই অভিব্যক্তিটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই।

'ডাকঘরে'র রূপকটি একটু জটিল। অমলের কৌতূহল ও সরল বিশ্বাস শৈশবের সাধারণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক সুস্থমনা শিশুর মধ্যেই অমলের ন্যায় সুদূর, অপরিচিত জগতের প্রতি একটা প্রবল, মোহময় আকর্ষণ আছে—নীল-মায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। আবার শৈশবকালে ভগবানের সহিত আমাদের এমন একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরংগ যোগ থাকে, যাহাতে ভগবানের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধাত্মক বিচিত্র বাণী আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সোজা পৌছিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে সেই যোগসূত্র অনেকটা শিথিল ও ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই বিচিত্র সৌন্দর্যময়ী পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড ভগবানের ডাকঘর। এখান হইতে দিকে দিকে অসংখ্য চিঠি প্রেরিত হইতেছে, অধিকাংশই আমাদের স্থূল, অনুভূতিহীন হৃদয় হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কতিপয় মাত্র ভাগ্যবান্ সেই চিঠি খুলিয়া পড়িয়া তাহার বাণীটি হৃদয়ংগম করিবার অধিকারী হইতেছে। অমল তাহার শিশু-হৃদয়ের সমস্ত সরলতার সহিত বিশ্বাস করিতেছে যে, ভগবান তাহার নামে

চিঠি পাঠাইবেন, এবং এই বিশ্বাস নিজ গভীর আন্তরিকতায় নিজ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ইহাই হইল রূপকের মোটামুটি ব্যাখ্যা; কিন্তু ইহার অন্তরালে আরও একটি গভীরতর সাংকেতিক অর্থের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব যেন অনুভব করা যায়। অমলের রোগটা কি, যাহা লইয়া পৃথিবীর কবিরাজ ও রাজ-কবিরাজের ব্যবস্থার এত গভীর অনৈক্য হইয়াছে? এই রোগ বোধহয় মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকার—that disease called life. সংসার এই রোগ-প্রতিকারের যে-ব্যবস্থা করে তাহার মূল-নীতি হইতেছে জীবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ, গভীর অনুভূতির পথগুলি বন্ধ করা, যাহাতে অসীমের রাজ্য হইতে আমাদের রুদ্ধদ্বার জীবনযাত্রার পথে একটিও আলোক-রেখা প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন। যে চঞ্চল হাওয়া আমাদিগকে সাধারণ জীবন-যাত্রার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে অনন্তের পথে উধাও করিবার চেষ্টা করে, আমাদের সমস্ত সাংসারিক জ্ঞান ও বিষয়-বুদ্ধি সে মাদক হাওয়াকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহে। রাজকবিরাজ মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে আসিয়া, এই সমস্ত বাধাবন্ধনকে খুলিয়া দেন; এবং এই জীবন-ব্যাধির চরম চিকিৎসা ও আরোগ্য হইতেছে মৃত্যু—যে আমাদের ভগবানের সহিত পরিচয়ের রুদ্ধদ্বারগুলিকে আবার খুলিয়া দেয় ও জগতের সহিত আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার সাধন করে। সুতরাং 'ডাকঘর' নাটকটি কেবল শিশু-চিত্তের নয়, মানবজীবনেরই রূপক।

কিন্তু নাটক হিসাবে যে সুরটি সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহা বালক অমলের অদম্য কৌতূহল, অপরিচিতের সংগে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ ও অধীরতা। তাহার রোগক্লিষ্ট মনে এই আগ্রহটি অত্যন্ত করুণ, অসহায় সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। এই সুরের মধ্যে কোন নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাই বলিয়া ইহা গীতি-কবিতার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অমলের রোগ কি তাহা না বুঝিলে ক্ষতি নাই—এমনকি চিকিৎসকদের ব্যবস্থার অর্থ-বোধও অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু শিশুচিত্তের ব্যাকুল, করুণ পিপাসা সমস্ত নাটকটিকে প্লাবিত করিয়া পাঠকের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। এখানে নাটক নিজ বিশেষত্ব হারাইয়া গীতি-কাব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে। কিন্তু তবুও মনে হয় যে, ব্যাকুলতার সুরটি নাটকের কথোপকথনের মধ্য দিয়া যেরূপ ফুটিয়াছে গীতি-কবিতায় সেরূপ ফুটিতে পারিত না।

'ঋণ-শোধ' বা 'শারদোৎসব' বালক-মনের আনন্দোচ্ছল আত্মবিহ্বল ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া শরতের দিগন্ত-বিস্তৃত আনন্দরসের সংগে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টা। এই মত্ত আনন্দ-প্লাবনের নিকট নাটকের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভাগীরথী-তরংগে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই-একটি ক্ষীণ বিদ্রোহের সুর মাথা তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহারাও এই দুর্বার আনন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। লক্ষেশ্বরের সমস্ত অর্থতৃষ্ণা ও সতর্কতার মর্ম ভেদ করিয়া এই আনন্দ একটা অতৃপ্ত বেদনার কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। বালক উপনন্দের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উপর শরতের এক ঝলক সোনালি রৌদ্র পড়িয়া তাহার অন্তস্তল পর্যন্ত আনন্দের রংএ রাঙাইয়া দিয়াছে। ঠাকুরদাদা, কবিশেখর, সম্রাট বিজয়াদিত্য সকলেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আহ্বানে শরৎ-প্রকৃতির আনন্দ-নির্ঝর হইতে আপন আপন মন ভরিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে কি পুলক-প্লাবন, কি গানের ফোয়ারা, কি আলো-ঝলমল নীল আকাশ! প্রকৃতির যে অদৃশ্য শক্তি হইতে শেফালির শুভ্র হাসি দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হয়, পদ্মের অম্লান-শ্রী শ্বেতছত্রের মত বিস্তারিত হয়, নির্ঝর আনন্দ-নৃত্যে ছুটিতে থাকে, সেই গূঢ় প্রাণরসের কিয়দংশ কবির মনে সঞ্চারিত হইয়া এই নাটকে অপূর্ব শোভা-সম্পদে বিকশিত হইয়াছে—নাটকের এক-একটি গান যেন তাহার এক-একটি পাপড়ি! এই আনন্দ-প্লাবনের আত্মবিস্মৃতিতে নাটক তাহার বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে—শেলির Prometheus Unbound-এর চতুর্থ অংকের ন্যায় ইহা একটি rhapsodyতে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টি-রহস্যের একটা দিক কবির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আনন্দ-কুঠরির চাবিটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। 'শারদোৎসব' নাটক নহে, কিন্তু বহির্জগতের আনন্দ মনের গূঢ় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অন্তর-জগতে চোয়াইয়া লওয়ার মধ্যে যদি কোন নাটকীয় গুণ থাকে, তবে সে-গুণের ইহা পূর্ণমাত্রায় অধিকারী।

'শারদোৎসবে'র মধ্যে কোন বিশেষ রূপক নাই। যে-হিসাবে মানব-জীবন অনন্ত জীবনের ইংগিত করে, বা প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের রূপের কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, সেই হিসাবে 'শারদোৎসবে'র শরৎ-শ্রীর মধ্যে আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করা যায়। শরতের সমস্ত আলো, হাসি, গান যে এক অফুরন্ত আনন্দধারার উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহারই সংকেত মিলে বলিয়া নাটকখানিকে সাংকেতিক বলা যাইতে পারে।

সাংকেতিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান 'রাজা' বা রবীন্দ্রনাথের নূতন নামকরণানুসারে 'অরূপ-রতন' নাটকেরই প্রাপ্য; অন্য কোন নাটকেই সাংকেতিকতার রহস্য এত তীব্র, ব্যাপক ও অর্থপূর্ণভাবে প্রকটিত হয় নাই। ভগবানের ভীম-কান্ত রূপ আর কোথাও এরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত, এরূপ রহস্যময় আভাস-ইংগিতের মধ্য দিয়া, যাথার্থ্যের এরূপ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় নাই; এই সাংকেতিকতা প্রতি ছত্র, প্রতি দৃশ্য হইতে একটা অদৃশ্যপুষ্পের গন্ধসারের মত উত্থিত হইতেছে। ভগবানের সহিত মানুষের বোঝাপড়ার যতগুলি বিভিন্ন স্তর আছে, সমস্তগুলিই এই নাটকে আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তি ও সুসংগতির সহিত নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাণী সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে রাজার সাক্ষাৎ পান—ভগবানের সহিত ভক্তের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় না। এক রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হইতেই ভগবান নিজ আবির্ভাবের আভাস দেন—সুরংগমা ও ঠাকুরদাদার মত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা নিজ সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও স্বচ্ছ অনুভব-শক্তির বলে এই আভাস উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রকৃতির যে অসংখ্য বিচিত্র রূপ আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত মানব-মনের একটা ব্যাকুল আগ্রহ আছে—এই মূর্তি একদিকে মানুষকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে ইহার ভয়াবহ রহস্য তাহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার করে। রাণীর মনে এই দুইটি ভাবের সংঘাতটির প্রতি অতি সুন্দরভাবে ইংগিত করা হইয়াছে।

ভগবানের আর একটি গুণ অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে—তাঁহার grand impersonality, তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্ববিলোপ। ভগবান চিরকাল আত্মগোপন করিয়া সকলকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন—কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার অস্তিত্ব, সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ জাগে—সময় সময় রাজ্যকে সম্পূর্ণ অরাজক বলিয়া ভ্রম হয়। তারপর তাঁহার অদর্শনের সুযোগ লইয়া অনেকে ভণ্ড ভগবানের বেশে বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয়কে প্রতারিত করে। আবার সম্রাটের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ নিজেদের অধিরাজত্ব তারস্বরে ঘোষণা করিতে ত্রুটি করে না। অপরিণত-বুদ্ধি অনধিকারী ভগবানের নগ্নরূপ দেখিতে গিয়া তাঁহার 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালং' রূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় পিছাইয়া আসে। অভিমান-মেঘ ভক্তিপ্রবণ চিত্তকে আবৃত করিয়া মিলনের পথে দুর্লংঘ্য ব্যবধান রচনা করে। এইরূপে ভগবানের গৌরবময় মূর্তিকে অন্তরাল

করিবার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র একটা ঘোরতর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু ক্ষীণ কুহেলিকার মধ্য দিয়া সূর্যের জ্যোতির ন্যায় ভগবানের ভাস্বর-রূপ সমস্ত সংশয়-জালের পিছনে আপনাকে অনিবার্য তেজে প্রকটিত করে। ঈশ্বরের এই লোকোত্তর, সংশয়-নিরসনকারা, ভাস্বর মহিমা, যাহা মানুষের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার ও বিশৃংখলা-বিদ্রোহের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দীপ্ততেজে বিচ্ছুরিত হয়—তাহাই সাংকেতিকতার আশ্চর্য, নিপুণ প্রয়োগে এই নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপকের দিক্ দিয়া ভগবানের যে-মূর্তি ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে তাহা আমাদের কল্পনা ও ভক্তির উচ্চতম দাবী মিটাইতে সক্ষম। সাংকেতিকতার দিক্ দিয়া ইহার প্রত্যেক ইংগিতটি গোপন অর্থের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; সাধারণ কথার স্বচ্ছ ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া ভগবানের রহস্যমণ্ডিত মহিমার প্রতি অংগুলি সংকেত করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত বাদ দিয়া কেবল নাটক হিসাবেও ইহার স্থান খুব উচ্চে। রাণীর সমস্ত চিত্তক্ষোভ—তাঁহার রাজাকে আলোকে দেখিবার আকুলতা, অদম্য আগ্রহ, চিনিতে অক্ষমতা ও তজ্জনিত লজ্জা, রাজার ভয়ানক মূর্তি দেখিবার পর বিমুখতা ও বিতৃষ্ণা, স্বয়ংবরপ্রার্থী রাজগণ কর্তৃক নিপীড়ন ও অবমাননা, রাজার প্রতি ঘোরতর অভিমান, এবং সর্বশেষে অভিমান-গলানো, সর্বত্যাগী, শান্তিময় প্রেম—এ সমস্তই নাটকোচিত উজ্জ্বল বর্ণে ও প্রবল আবেগের সহিত অংকিত হইয়াছে। নাটকের কোন পাত্র-পাত্রীকেই রূপকের ছায়া বলিয়া মনে হয় না—সকলেই সজীব, রক্তমাংসের মানুষ। এমন কি রাজার মুখে যে-সমস্ত কথা আরোপিত হইয়াছে তাহাও ঐশীমহিমার অনুপযুক্ত মনে হয় না। রাজগণ, নাগরিকগণ, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সকলেই আপন আপন চরিত্রানুরূপ কার্য করিয়া ও কথা বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলেরই বাক্য ও কার্য এক নিগূঢ় শক্তি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহাদের সাধারণ অর্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইয়াছে। ভগবান মানুষকে লইয়া যে-খেলা খেলেন, নাট্যকারও তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রগুলি লইয়া প্রায় তদনুরূপ খেলাই খেলিয়াছেন—জোর করিয়া গতি ফেরান নাই, দূর হইতে অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, নাটকের স্বাধীন গতি নষ্ট না করিয়া তাহার মধ্যে ঐশীশক্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন। সাংকেতিক নাটকের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কৃতিত্ব আর কি হইতে পারে?

(৫)

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিকতা পূর্ব-সীমা ছাড়াইয়া এক নূতন রাজ্যে, আধুনিক সমস্যার ছায়া-সংকুল প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব-নাটকগুলিতে অতীত যুগের প্রতিবেশ-চিহ্ন বিদ্যমান। কিন্তু পরবর্তী নাটকগুলিতে—'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে—আধুনিক যুগের সমস্যার নিঃসন্দিগ্ধ ছায়াপাত হইয়াছে। এই সমসাময়িক যুগের সমস্যার ছাপ তাহাদের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, তাহাদের রহস্যময় সংকেতগুলির প্রতি একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল জাগাইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে যে-সব প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, তাহাদের বাস্তব-অংশ হইতে নিষ্কাশিত মর্মকথা অতীতের ক্ষীণ আবরণের মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি অংগুলি-সংকেত করিতেছে। অবশ্য এই সমসাময়িক সমস্যা-সংকুলতার ফলে নাটকীয় উৎকর্ষ বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহা বিবেচ্য বিষয়। অতীতের বস্তু-অংশ কালপ্রভাবে এতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার মূল গতিধারাটি অবান্তর বর্জনের দ্বারা এতই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাহাকে একটি বিশেষ রূপ দেওয়া ও তাহার মধ্যে রূপকের রঙীন আলোকপাত করা কবি-কল্পনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। তা ছাড়া, যদি অতীতের একটা সম্পূর্ণ যুগকে এরূপ রূপ-বৈশিষ্ট্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে এমন একটি খণ্ডাংশ নির্বাচন করা যায়, যাহার উপর কল্পনাগত ঐক্যের ছাপ মারা কঠিন নহে। ক্ষীণকায় অতীত হইতে কবি এমন একটি অধ্যায় বাছিয়া লইতে পারেন যাহা তাঁহার উদ্দেশ্যের উপযোগী হইবে, যাহা নিজ বস্তু-বাহুল্যের দ্বারা তাঁহার কল্পনার স্বচ্ছ-লীলার পথে অন্তরায় হইবে না। কিন্তু বর্তমানকে কবি এত সহজে বরখাস্ত করিতে পারেন না—তাহার ইচ্ছানুরূপ বর্জন ও পরিবর্তন নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে। 'মুক্তধারা'য় বিজেতা-বিজিত জাতির সম্পর্ক বা 'রক্তকরবী'তে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সমস্যা একটা প্রবল, জীবন্ত শক্তি—ইহাদের বিরাট দৈত্যদেহকে রূপকের বোতলে প্রবেশ করাইতে যে-পরিমাণ ইন্দ্রজাল-শক্তির প্রয়োজন তাহা নৈসর্গিক জগতে মেলা কঠিন। সুতরাং কবির রূপক-প্রবণতা বর্তমানের বস্তুতন্ত্রতায় পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে, এবং এই বিরাট বস্তুপিণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কবি যে রূপকের জাল বয়ন করিয়াছেন তাহা খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে। সেইজন্য রূপকের আধ্যাত্মিকতা ও সাংকেতিকতা ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রবল নহে।

'মুক্তধারা'য় আধুনিক রাজনীতির নির্মম ক্রূরতা, প্রচণ্ড, অনুকম্পাহীন শক্তি রূপক-সাহায্যে সূচিত হইয়াছে। উত্তরকূটের অধিবাসীরা বিজেতৃজাতির সমস্ত দম্ভ, অহংকার, মদোদ্ধত জাত্যভিমান ও অটল, দ্বিধালেশহীন আত্মপ্রত্যয় অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যুধ্যমান জাতিদের ন্যায়—My nation, right or wrong—ইহাই তাহাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। প্রাচীন ইহুদী হইতে আধুনিক জার্মান পর্যন্ত সমস্ত বিজয়ী জাতির ন্যায় ইহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, ইহারা দৈবানুগৃহীত জাতি, দুর্বলতর জাতির উপর নিজ শিক্ষা-দীক্ষা, নিজ সভ্যতা ও আধিপত্য বিস্তার করা উহাদের বিধি-নিয়োজিত পবিত্র ব্রত। সেইজন্য উত্তরকূটের যুদ্ধরাজ যখন শিবতরাইএর মংগলার্থ গিরিসংকটের পথ খুলিয়া দিলেন, তখন তাহা উহাদের পক্ষে অমার্জনীয় স্বদেশদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইল। মুক্তধারা যন্ত্রসাহায্যে বাঁধিয়া শিবতরাইএর তৃষ্ণার জল বন্ধ করা উহাদের নিকট আন্তর্জাতিক সমরের একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বৈধ অস্ত্র—প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধে বিষবাষ্প প্রয়োগের ন্যায়। সেইরূপ যন্ত্ররাজ বিভূতিকে জয়মাল্য অর্পণ যন্ত্রশক্তির দানবতার অন্ধ-স্তাবকতা, নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার ও বিলোপ। অম্বার অবহেলিত, উপেক্ষিত মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন এই দানবশক্তির নৃশংস হৃদয়হীনতার, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যের মাপকাঠি। এই সমস্তই আধুনিক সমস্যার অংগ বলিয়া সহজেই চেনা যায়। আবার শিবতরাইএর তরফে যে-সমস্ত প্রচেষ্টা বা আন্দোলন দেখা যায়, তাহা আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের নিজের দেশের সমসাময়িক অবস্থার সহিত বিজড়িত। লেখকের অস্বীকাব সত্ত্বেও ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাহার প্রচারিত বাণীর মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অহিংস অসহযোগ অত্যন্ত অনিবাযভাবে উঁকি মারে। আবার শিবতরাইএর জনসাধারণের পক্ষে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অন্ধ, বিচারহীন অনুসরণ ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মহাত্মার বাণীর নিকট দেশবাসীর স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কাহিনীই সূচিত করে। অতি-আধুনিক ও অতি-পরিচিতের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই 'মুক্তধারার' ইংগিতগুলিকে এমন সহজ-বোধ্য ও নিকট করিয়া তুলিয়া নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়াইয়াছে।

কিন্তু নাটকটিকে সমগ্রভাবে দেখিলে ইহাকে পরিকল্পিত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানরূপে গ্রহণ করা যায় না। দিগন্তবিস্তৃত অমানিশার

অন্ধকারের প্রান্তে ক্ষীণ খদ্যোতালোকের পাড় বুনিয়া দেওয়ার মত ইহা অতলস্পর্শ গহ্বরেব মধ্যে একটুমাত্র কল্পনাবিকাশের ন্যায় দেখায়। রাজকুমার অভিজিৎ যে-মন্ত্রবলে যন্ত্রদানবের ঈর্ষ্যা ব্যর্থ করিয়া মুক্তধারার রুদ্ধ জলপ্রবাহ খুলিয়া দিলেন, সে-মন্ত্রের রহস্য ঝরণার জল-কল্লোলের মধ্যে নীরব হইয়া গিয়াছে, মানব-মন তাহার সূত্র ধরিতে পারিয়াছে কি-না সন্দেহ। অবশ্য নাট্যকারের কর্তব্য কেবল ইংগিত করা; পূর্ণ সমাধান দিতে তিনি বাধ্য নহেন। তথাপি 'শারদোৎসবে' ও 'রাজা'তে এই ইংগিত আমাদের সমস্ত মনকে যেমন নাড়া দিয়া যায়, ফললাভের সম্ভাবনায় যেমন উদ্বুদ্ধ করে, 'মুক্তধারা'য় সেরূপ কোন ফল ফলে না। শঙ্কর-স্তব ও যন্ত্র-রাক্ষসেব দাম্ভিক, গগনস্পর্ধী শির—এই দুইটিই নাটকের মধ্যে সাংকেতিকতার মুখ্য নিদর্শন। কিন্তু শঙ্কর-স্তোত্র নাটকে যেমন, আমাদেব মনের মধ্যে সেরূপ প্রবলভাবে ধ্বনিত হয় না; এবং বিভূতিব যন্ত্রের চূড়াটা অস্তসূর্যের রক্ত-মদিরা পানে লাল হইয়া উত্তরকূটের আকাশ-পথে যেমন ধূমকেতুর মত জ্বলিতে থাকে, আমাদের কল্পনাকাশে সেরূপ দীপ্ত, ভয়ংকর রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে না।

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে উপরের সমালোচনা আরও অধিকমাত্রায় প্রযোজ্য। বরং 'মুক্তধারা'র যে-বিষয় তাহা বৃহৎ একটা আদর্শবাদের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, সাংকেতিকতার চকিত আলোকে তাহার পাতাগুলি আদ্যোপান্ত পড়া যাইতে পারে। কিন্তু 'রক্তকরবী'র প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত আদর্শবাদ ও সাংকেতিকতাকে হারাইয়া নিজ বিশাল দেহ বিস্তার করিতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে রূপকের বৈদ্যুতী বরং সঞ্চার করা যায়, কিন্তু কলকারখানার লৌহযন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতাকে কোন্ হাপরে গলাইয়া তাহার ভিতর অতীন্দ্রিয় জগতের আলোকপাত সম্ভব? এ অতৃপ্ত বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষার উপর কোন্ কুণ্ডের শান্তিজল নিক্ষেপ করা চলিবে? রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট বস্তুপুঞ্জসঞ্চয়, জীবনীশক্তির এই শোচনীয় অপব্যবহারের পরিধিতে দুইটি নৈতিক শক্তির অবতারণা করিয়াছেন—এক, নন্দিনীর রক্তকরবী জীবনের অদম্য প্রাণশক্তি ও আনন্দ-মাদকতার প্রতীক, এবং দ্বিতীয়, লৌহজালের অন্তরালস্থিত যন্ত্রসভ্যতার রাজা, যাহার একদিকে অসীমশক্তি, অপরদিকে অসীম অতৃপ্তি ও প্রাণভরা হাহাকার। এই দুইটি শক্তি তাহাদের সমস্ত প্রকাশক দ্যুতি লইয়া যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহার কঠিন লৌহবর্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যন্ত্রসভ্যতার স্বরূপ প্রকাশিত

হইয়াছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, খণ্ডদৃশ্যের দ্বারা, কিন্তু এগুলিকে আমরা যথেষ্ট বা চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার মর্ম্মস্থানে যে-শক্তি, যাহাকে যক্ষপুরীর লৌহজালাবগুণ্ঠিত রাজার রূপক-সাহায্যে দেখান হইয়াছে, তাহার পরিচয়টিও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সুদর্শনার অন্ধকার ঘরের রাজা ও এই ভূগর্ভস্থ অন্ধকারে আত্মগোপনশীল লৌহজালে-ঘেরা রাজার মধ্যে স্পষ্টতার দিক দিয়া কত প্রভেদ। একটি চিত্র প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির স্থির আলোকে প্রোদ্ভাসিত, অপরটি কল্পনার চঞ্চল, অনিশ্চিত আলোকে ঈষদ্দৃষ্ট মাত্র। নন্দিনী ও রাজার মধ্যে অনেক বাক্যবিনিময় হইয়াছে; তাহাতে আমরা বুঝি যে, এই বিরাট শক্তির কেন্দ্রস্থলে এক গোপন, অলক্ষিত দুর্বলতার বীজ নিহিত আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নন্দিনীর রক্তকরবীর যে আভা কাহারও কাহারও মধ্যে চিরসুপ্ত প্রাণহিল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা রাজার লৌহময় বক্ষের নীচে, মাত্র একটা অশান্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি রাজার মনোভাবটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোলে নাই। যক্ষরাজ এই চঞ্চল বিদ্যুল্লতার দিকে ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু তাহার পায়ে কিরূপে বেড়ী পরাইবে, কি বাঁধনে তাহার অস্থির গতিকে চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চল করিয়া দিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। নন্দিনীও এই বিশাল, অজেয় শক্তির অবিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু না পারিয়াছে তাহাকে রক্তকরবীর রঙীন আভায় রাঙাইয়া তুলিতে, না পারিয়াছে তাহার লৌহমুষ্টির তলে আত্মসমর্পণ করিতে। সুতরাং এই বহ্নি-পতংগের খেলাটির পরিণাম ফল অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

এই অনিশ্চয় নন্দিনী ও রঞ্জনের সম্পর্কের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। রঞ্জনের প্রভাব নাটক-মধ্যে আরও গূঢ় ও অশরীরী, সে নন্দিনী অপেক্ষা আরও অস্থির, চঞ্চল, অবাস্তব। তাহার আগমন-বার্তার বৈদ্যুতী নন্দিনীর প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তাহার অন্য কোন পরিচয় আমরা পাই না। নাটকের মধ্যে আমরা জীবিত রঞ্জনের সাক্ষাৎ পাই না, তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাই। সুতরাং রঞ্জনের প্রভাব ও ক্রিয়ার ধারণা আমাদের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট হয় না। মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, সে নন্দিনীর প্রভাবকে সম্পূর্ণ (supplement) করে—নন্দিনী তাহার রক্তকরবীর সমস্ত জলন্ত সৌন্দর্য

সেই বায়ুপ্রবাহ হইতে আহরণ করিয়াছে। কিন্তু একদিকে তাহার এই অত্যন্ত অশরীরী, অতীন্দ্রিয় স্পর্শ অপরদিকে তাহার মৃতদেহ—এই দুইএর মধ্যে একটা বিষম অসংগতি রহিয়া গিয়াছে, যাহা আমরা কল্পনা-সাহায্যে পূরণ করিতে পারি না। এই কল্পনা-গত অনৈক্য আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে নিরন্তর পীড়িত করিতে থাকে।

নাটকের অন্যান্য দৃশ্যগুলি বাস্তবানুগামী, কিন্তু রূপক তাহাদের বিশেষ রূপান্তর সাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কুলিদের জীবনযাত্রা ও মনোভাব, সর্দারের অনুক্ষণ খবরদারী ও অত্যাচার, অসাধু, ভণ্ড ধর্ম কর্তৃক এই অত্যাচারের সমর্থন ইত্যাদি সমস্তগুলিই যন্ত্র-রাজ্যের সাধারণ ও পরিচিত দৃশ্য; কিন্তু এই ধূমধূলি-ধূসর দৃশ্যগুলির ভিতর রূপকের আলোক নিতান্ত হীনপ্রভ ও নির্বাপিত-প্রায় দেখায় এবং বিষয়ের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। ফলতঃ রক্তকরবীর আভা যেমন যক্ষরাজের লৌহবর্ম ভেদ করিতে পারে নাই, তেমনি কবি-প্রতিভার সাংকেতিকতা এই অতিকায়, অতি-বাস্তব শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশ্য নন্দিনীর রক্তকরবী যক্ষরাজের প্রাণে একটি গূঢ় ব্যর্থতার বীজ বপন করিয়াছে, এক প্রবল আত্মঘাতী বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে; সেইরূপ যদি কোন দূর ভবিষ্যতে এই অন্তর্ক্ষুব্ধ, রুদ্ধ হাহাকারপূর্ণ যন্ত্রসভ্যতা শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ও রাক্ষসের ন্যায় নিজের অস্ত্র নিজেই ছিঁড়িয়া খায়, তবে কবি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির দাবী করিতে পারিবেন, কিন্তু সে-দাবী তাঁহার কবিত্বের খাতায় লেখা থাকিবে কি না সন্দেহ।

(৬)

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নাটক 'নটীর পূজা' তাহার অন্যান্য নাটক হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহাতে রূপকের কোন স্পর্শ নাই; এবং ইহার ঘটনা বুদ্ধ-বিষয়ক। গদ্য-নাটকে বুদ্ধের মহিমময়, ভক্তি-প্লাবিত যুগে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পদক্ষেপ। বাস্তবিক বৌদ্ধযুগে ধর্মবিপ্লব, বিপরীত ধর্মের টানে পারিবারিক অশান্তি ও অকৌশল, নব বৌদ্ধধর্মের সহিত পুরাতন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সংঘর্ষ, নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী উপাদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নটীর পূজা'য় এই জলন্ত ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মবিরোধের একটা স্বল্প-পরিসর চিত্র দিয়াছেন। এই বিপ্লব সর্বাপেক্ষা ফুটিয়াছে রাণী লোকেশ্বরীর চরিত্রে;

মুখে বুদ্ধকে অস্বীকার করিলেও অন্তরে তাহার বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগ অনপনেয় আগ্নেয় অক্ষরে মুদ্রিত আছে। একদিকে রাজোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত নহে বলিয়া সে বৌদ্ধ-ধর্মকে ধিক্কার দিতেছে; আবার পুত্রকে তাহার মাতৃবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তাহার আরও গভীর অভিমান; মহারাজ অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-ধর্মদ্বেষে ও বৌদ্ধ-উৎপীড়নে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি; কিন্তু অন্তরে তাহার ভক্তি অক্ষয় হইয়া আছে—প্রকৃত পরীক্ষার সময় তাহার অন্তরের রুদ্ধ মনোভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। রাণীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ নিপুণভাবে অংকিত হইয়াছে। রাজকুমারীদের আভিজাত্যাভিমান ও ধর্মনিষ্ঠার মধ্যে বিরোধটিও বেশ নাটকোচিত হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্মুখীনতার জন্য বাহ্য-উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি নাটকের বাহিরে রাখিয়াছেন। বিম্বিসারের হত্যা, জনসাধারণের চাঞ্চল্য, অজাতশত্রুর বৌদ্ধধর্ম পুনর্গ্রহণ ইত্যাদি দৃশ্য, যাহা অন্য নাট্যকার কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইতেন—তাহা রবীন্দ্রনাথ একেবারে বর্জন করিয়াছেন; তাহার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র নাটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যটিতেও নাটকীয় পরিণতির অপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্য অধিক লক্ষিত হয়। মোটের উপর, রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা পুরাতন সুরে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে এখনও যথেষ্ট জীবনী-শক্তি অবশিষ্ট আছে, পাঠকের মনে এই ধারণা উৎপাদিত হয়।

(৭)

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির এক এক করিয়া বিশ্লেষণ শেষ হইল। এখন নাটকগুলির দুই-একটি সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। এই নাটকগুলির পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, প্রায় সমস্ত নাটকের বিষয়গত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মূলগত সুরটি এক। প্রায় সমস্ত নাটকেই একই প্রকারের ঘটনা ও চরিত্রের পুনরুক্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাদার চরিত্রটি সমস্ত নাটকেরই একটা অপরিহার্য অংগ—সর্বত্রই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দেন ও প্রায় একরকম খেলাই খেলেন। একজন স্বচ্ছ-দৃষ্টি, সরল-হৃদয়, আনন্দময় পুরুষ, যিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার আনন্দ-উৎসের মুখে পাথর না চাপাইয়া তাহার

স্রোতোবেগ আরও বর্ধিত করিয়া দিয়াছে. যিনি বালকদের সমপ্রাণ বন্ধু, নায়ক ও ক্রীড়া-সহচর—এই আদর্শেই কবি ঠাকুরদাদার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল 'অচলায়তনে' কবি তাঁহার আরও পদোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহাকে আদি ধর্ম-গুরু স্বয়ং শ্রীভগবানের সংগে একাসনে বসাইয়াছেন। এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, নাটকের দিক দিয়া প্রশংসার্হ না হইলেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অবিচলিত ঐক্যের সুন্দর পরিচয়-স্থল। বাহিরের জগতে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকিলেও কবির মনে একই প্রকার খেলা পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে—বাহিরের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই অন্তরলীলার ছায়াপাত হইয়াছে, কবির চক্ষু তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছে। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—তাঁহার গানের এই প্রসিদ্ধ চরণখানি অশ্রান্ত সুরে তাঁহার নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভাবই তাঁহার নাটকে বাহ্য বৈচিত্র্যের অভাবের কারণ। সাধারণ নাটকের যে-লক্ষণ তাহার অনেকগুলি তাঁহার নাটকে মিলে না—কিন্তু ইহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অসীমের সুর তাঁহার যেরূপ মধুর, ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বাজিয়াছে, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের আর একটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। নাটকীয় চরিত্র-নির্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধাপটি তাঁহার নাটকে অব্যাহতভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রাজ-সভার প্রতিবেশ তাঁহার সমস্ত নাটকেই দেখিতে পাই। সেই চির পরিচিত রাজা, অমাত্য, বিদূষক, সেনাপতি রংগমঞ্চে আবির্ভূত হন। সেই প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা—রাজার সর্বময় কর্তৃত্বমূলক সমাজ-শৃংখল—সর্বত্র লক্ষিত হয়। এমন কি, অতি-আধুনিক সমস্যা ও বিশ্লেষণে সেই প্রাচীন প্রথার অবতারণা হইয়াছে। 'রক্তকরবী'তে এই প্রাচীনের অবিচ্ছিন্ন মহিমা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কেননা একমাত্র যক্ষরাজ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত চরিত্র কতকটা যান্ত্রিক-যুগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। কবি এই প্রাচীনত্বের ছদ্মবেশের কেন এতটা পক্ষপাতী তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। হয়ত এই প্রাচীন প্রতিবেশ রচনার দ্বারা তিনি আধুনিক সমাজের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি নিজের আত্যন্তিক বিমুখতা জ্ঞাপন করিতে চাহেন। ভ্রাতৃবিরোধ বা সামাজিক দলাদলি যে নাটকের উপজীব্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথের তাহার প্রতি কিছুমাত্র প্রবণতা নাই; সুদূর হিন্দু-সভ্যতার যুগে তাঁহার নাটকগুলিকে

সন্নিবেশ করিয়া বর্ত্তমানের সমস্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও স্বার্থ-সংঘর্ষ হইতে তিনি যেন আপনাকে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বোধহয়, এই কাল-নির্বাচনের সর্বপ্রধান কারণ এই যে, তাঁহার মনে ভগবানের যে লীলারহস্য, অসীমের যে আনাগোনা ভাস্বর হইয়া আছে, তাহা প্রাচীন কালের রাজসভার প্রতিবেশেই স্ফুটতর হইয়া উঠে। তিনি যে রাজরাজের মহিমা প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছেন, প্রাচীনকালের সর্বময় কর্তা রাজাদের সম্পর্কেই তাঁহার সে পরিচয় ফুটে ভাল। একদিকে অপ্রতিহত-প্রভাব, অসীম বলমদোদ্ধত নৃপতিরা তাঁহার অদৃশ্য শক্তির নিকট মাথা হেঁট করিয়া নিজেদের গর্ব-অভিমান সমস্ত বিসর্জন দিয়াছে, অন্য দিকে, কোন কোন ধন্য রাজা ভগবদ্দত্ত রাজ-সম্পদের সংগে সংগে তাঁহার যে পরম দান—ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—তাহাও লাভ করিয়া মনুষ্যমধ্যে দেব-পদবাচ্য হইয়াছে। সেইজন্য রাজ-রাজড়ার সংগেই তাঁহার বেশী কারবার—আধুনিক গণতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হাত-পা-বাঁধা রাজা নয়, সত্যকার রাজা, যাহার ভাল মন্দ দুই দিকেই শক্তি অপরিমিত। এইরূপ বাধা-বন্ধহীন অতি-মানবদের হৃদয়ই ভগবানের প্রিয় সিংহাসন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকই একবাক্যে সেই সাক্ষ্য দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা

১

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পষ্টতম নিদর্শন—ইহার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অম্লান দীপ্তি ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অপ্রতিহত অগ্রগতি। বাস্তবিকই তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনের সমাপ্তিসূচক রচনাগুলির মধ্যেও নব নব প্রকাশ-ভংগী ও প্রেরণা আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে। এই বিষয়ে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সহিত তুলনায়ও শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন্, ব্রাউনিং—তাঁহাদের শেষ জীবনের রচনায় একটা ম্লানিমা, অভ্যস্তের বৈশিষ্ট্য-হীন পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। তাঁহাদের শেষ কাব্যের উপর বার্ধক্যের বলিরেখা প্রসারিত হইয়াছে—ভাবের শীর্ণতা, রসের দৈন্য ও কল্পনার জড়তার চিহ্ন তাহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা শেষ পর্যন্ত তাহার সতেজ নবীনতা ও সাবলীল স্ফূর্তি হারায় নাই। অবশ্য উৎকর্ষের তারতম্য-ভেদ আছে—ষাট বৎসরের কাব্য-সাধনার মধ্যে প্রতিভার জোয়ার-ভাঁটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মোটের উপর যে বিশেষত্ব আমাদিগকে চমৎকৃত করে, তাহা হইতেছে কবির চিত্তের সরসতা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নূতনকে আবাহন ও বরণ করিয়া লইতে সংকুচিত হন নাই—নূতন নূতন সংশয়-মূলক পরীক্ষার দুর্গম পথ তাঁহাকে দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত করিয়াছে। যে-পথে চরম সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে, সেই পথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারের প্রলোভন তিনি হেলায় ত্যাগ করিয়াছেন। কবিত্বের মূল উৎস কোথায় তাহার আবিষ্কারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি নানা বিরল-পদ-চিহ্ন নির্জন বনপথে তাঁহার কল্পনাকে অভিসার-যাত্রায় পাঠাইয়াছেন। ইহার ফল হয়ত সব সময় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই। তথাপি এই যে পরীক্ষা-মূলক মনোবৃত্তি, এই যে দুঃসাধ্য-বরণের প্রচেষ্টা, নব উন্মেষের তৃপ্তিহীন অভীপ্সা তাহা কবিজীবনেও এত বিরল যে ইহা আমাদের সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক্ করে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের গদ্য-কবিতার কাব্যসংগ্রহগুলি বিশেষভাবে

তাঁহার এই মানস-প্রবণতার উদাহরণ। 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ-সপ্তক' (১৯৩৩) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—এই তিনখানি গ্রন্থেই তাঁহার গদ্য-কবিতার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা সমন্বয়-সাধন, গদ্যের শিথিল, অযত্ন-বিন্যস্ত রূপের মধ্যে পদ্য-সুরভির সঞ্চার—কবির আকস্মিক খেয়াল নহে; দীর্ঘ দিনের পরীক্ষার পরিণতি। কাব্যের ছন্দোবদ্ধ, দৃঢ়পিনদ্ধ রূপের মধ্যে চিন্তাধারার ছন্দানুগামী একটা সহজ, সরল প্রবাহ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি কিছুদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলেন। চিরপ্রথাগত ছন্দের অপরিবর্তনীয় রেখা-বিন্যাসের পরিবর্তে ঝরণার লীলা-চপল, স্বচ্ছন্দ-গতি, অনিয়মিত হ্রস্ব-দীর্ঘের সমাবেশে বিচিত্র ভাব-প্রবাহের প্রত্যেকটি বাঁকের সহিত সমান্তরাল এক নূতন স্বাধীনতা তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিতেছিল। 'বলাকা'য় প্রথম এই ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্তন—কবির চিন্তার মৌলিকতা ও প্রসার যেন ইহার মধ্যে তাহার অপরিহার্য কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানেও কবি ছন্দগঠনকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলেন নাই—অন্তঃমিল ও ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ (rhythm) অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া'র (১৯২৯) ছন্দ-কৌলীন্য তাহার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;—অনিয়মিত ছন্দাংশের সহিত সাবেক প্রথায় সম্পূর্ণাংগ ছন্দ নিজ নিজ সুর মিলাইয়াছে। তার পরে 'পুনশ্চ'-তে (১৯৩২) এই নবরীতি যথারীতি ঘোষণার সহিত কাব্য-সিংহাসনে উন্নীত হইয়াছে। ইহাতে কি বিষয়-নির্বাচন, কি ছন্দ-বিন্যাস—উভয় দিক দিয়াই পুরাতন ধারার সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এখন কবি ছন্দ-গুঞ্জনের অস্পষ্ট মোহাবেশ হইতে নিজেকে সবলে মুক্ত করিয়াছেন; ছন্দের কণ্ঠরোধের পর তাহার অশরীরী প্রেতাত্মাকেও তাঁহার কাব্যাংগনে প্রবেশাধিকার দেন নাই। এইরূপে তিনি সংগীতের আবেশ-মুক্ত নিজ বক্তব্য-বিষয়ের গৌরবের উপর নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান, নিরাভরণ পৌরুষের প্রতীক্ এক অভিনব শ্রেণীর কবিতাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশের পূর্বে কবি নিজ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম 'পুনশ্চ'-এর ভূমিকায় তিনি তাঁহার এই নূতন আদর্শ সম্বন্ধে নিজ-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ·····বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি-না" ইহাই তাঁহার পরীক্ষাধীন বিষয়। তা ছাড়া,

"পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাকে দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরণ স্বাভাবিক" করাও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের একটা অপরিহার্য অংগ। তাঁহার 'পুনশ্চ' ও 'শেষ-সপ্তক'-এ কয়েকটি কবিতাতেও তিনি এই নূতন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'পুনশ্চ'-এর প্রথম কবিতা 'কোপাই'-এ তিনি কোপাই নদীর "জলে-স্থলে, তরলে-শ্যামলে" গ্রন্থিবদ্ধ গতিচ্ছন্দে, তাঁহার নব-প্রবর্তিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিষ্কার করিয়াছেন। "ভাষার গান" ও "ভাষার গৃহস্থালী" এখানে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সান্নিধ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই নব-রীতির বিশেষ দুরূহতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। মোহাবেশের বিনা সাহায্যে হৃদয় জয় করা কঠোর সাধনা ও ছন্দগত সূক্ষ্ম স্বভাব-বোধের উপর নির্ভর করে।

"একে অধিকার যে করবে
তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।"

"নূতন কাল" কবিতাতে যে বাহিরের প্রেরণায় তিনি এই নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার ইংগিত মিলে—ভাবী কালের ইচ্ছা ও রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অন্তঃপুরবাসিনী কাব্য-সুন্দরীকে তিনি পথিক-বধূর ধূলি-ধূসর বেশ পরাইয়াছেন। "শেষ সপ্তক"-এর ২০, ২৪, ও ২৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি এই নূতন কাব্যাদর্শের প্রসংগ উত্থাপন করিয়াছেন। নবযুগের কবি "কঠিন-চিত্ত, উদাসীনের" গান গাহিবেন; কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপটি যেন একটি কারুকার্যখচিত পেয়ালার মত; ইহা ভাংগিয়া ফেলিলে সাধারণ মৃত্তিকা-পাত্রেও রস-পরিবেশনের কোন বাধা হইবে না। নিয়মিত ছন্দ টবের গাছ—"অভিজাত্যের সুশাসনে" সংযত তাহার হৃদয়াবেগ; ছন্দহীন কাব্য মৃত্তিকা-রোপিত, যথেচ্ছবিস্তৃত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে ভরপুর আরণ্যক তরু। এইরূপ নানা যুক্তি-তর্ক-উপমার সাহায্যে কবি তাঁহার নূতন পরীক্ষামূলক সৃষ্টির সমর্থন ও উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(২)

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয় ও আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা ঠিক নূতন ব্যাপার নহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০০ খৃঃ অঃ) ইংরেজ মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই প্রশ্নের উত্থাপন করেন ও কবিতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গদ্যরীতি প্রবর্তনের প্রয়াসী হন। এই সূত্রে যে আলোচনার উদ্ভব হয় তাহাতে গদ্যের নিত্য-ব্যবহার্য ভাষা কি পরিমাণে কবিতায় প্রয়োগ করা সম্ভব ও কবিতায় ছন্দ অবশ্য-প্রয়োজনীয় কি না ইত্যাদি প্রশ্নের খুব সূক্ষ্ম ও জটিল বিচার হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনার ফলে মূলত যে সমস্ত সাহিত্যিক সত্য প্রায় সর্ব্ব-স্বীকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। (১) গদ্যের ভাষা ও কথোপকথনের স্বাভাবিক রীতি ও শব্দ-বিন্যাস পর্যায় (idiom and order of words) কবি-কল্পনার দ্বারা অভিষিক্ত হইলে কবিতায় স্থান পাইতে পারে ; আবাব বিষয়োপযোগী ও কল্পনা-গৌরবের দ্বারা সমর্থিত হইলে কবিতার ভাষার রাজোচিত ঐশ্বর্যও ভাব-প্রকাশের সংগত উপায়। (২) ছন্দ কাব্যের কেবল বাহ্য সৌষ্ঠব ও আভরণ নহে। ইহার সহিত কবিতার একটা নিগূঢ়, মর্মগত ঐক্য আছে, ইহা কাব্যের আত্মার অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ। কবিতার যাদু এই ছন্দের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করে, ছন্দের সুর-ঝংকার,গতিচ্ছন্দ ও ধ্বনি-সাম্যের সহায়তায় ইহার চরম আবেদনটি মনের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হয়। ছন্দের আধারে সুরক্ষিত হইলে কাব্য-সৌরভ ঘনীভূত নির্যাসের স্থায়িত্ব লাভ করে ; ছন্দের রূপটি অস্পষ্ট ও অনিরূপিত হইলে ইহা বায়ু-তরংগে বিক্ষিপ্ত পুষ্প-গন্ধের ন্যায় জমাট বাঁধিবার অবসর পায় না। সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত সর্ব্বাংগসুন্দরী রূপলক্ষীর ন্যায় কবিতা ভাব-ছন্দ-সুষমার অপরূপ ঐক্যে কবিচিত্তে প্রতিভাসিত হইয়া ওঠে। ছন্দ ভাবের সহিত একটা পরবর্তী যোজনা মাত্র নহে, ইহার সহজাত রূপ ও আকৃতি। ছন্দের অংগ-জ্যোতি-বেষ্টিত হইয়াই কাব্যসুন্দরী মানস-লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, গদ্য-পদ্যের এই প্রকৃতি-বিশ্লেষণের ফলে উভয়ের সীমা-রেখা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বধারণা গুরুতররূপে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান যুগে উহাদের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। পূর্বে উহাদের মধ্যে মৌলিক, চিরন্তন প্রভেদের যে পাষাণ-প্রাচীর মাথা তুলিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে একটা অপসরণ-ক্ষম গাছপালার

ভংগুর বেড়াই উহাদের পারস্পরিক সীমা নির্দেশ করিতেছে। একটু সামান্য প্রেরণাতেই এই সীমা উল্লংঘন করিয়া প্রতিবেশীর রাজ্যে পদক্ষেপ করা যায়। সময় সময় দুঃসাহসী গদ্য কবিতার উন্মাদনা ও সুর-ঝংকার আত্মসাৎ করিবার জন্য বেড়ার অপর দিকে হস্ত প্রসারিত করে। সে যেমন কাব্য-বীণার উঁচু সুরে নিজের একতারাটি বাঁধিয়া লয়, অমনি অলক্ষিতভাবে অসম ছন্দের একটা নৃত্য-হিল্লোল তাহার প্রতি অংগে সঞ্চারিত হয়; তাহার স্বভাব-শান্ত পদক্ষেপে একটা দূরশ্রুত নূপুব-নিক্কণের অনুরূপ ধ্বনি বাজিয়া ওঠে। আবার অপর দিকে কবিতাও দীর্ঘ আকাশ-বিহারে ক্লান্ত-পক্ষ বিহংগের ন্যায় গদ্যের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিয়া হ্রস্ব, অনিয়মিত তালের খঞ্জন-নৃত্যের অনুকরণ করে।

আকাশ-বিহারিণীর এই পক্ষ-সংকোচের নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে। ক্লান্তি, কৌতূহল, বৈচিত্র্য-স্পৃহা প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি প্রবৃত্তি কবি-মনকে প্রভাবিত করিয়া তাহাকে এই গদ্য-পথের পথিক করে। কিন্তু ইহা ব্যতীত তিনটি আদর্শগত প্রেরণা মুখ্যত কবিতার গদ্যাভিমুখিতার হেতুরূপে গণ্য হইতে পারে। (১) ভাবের দোলার গতিবেগের উপরই ছন্দের পক্ষ-বিস্তারের মাত্রা নির্ভর করে! যেখানে কবি-চিত্ত মৃদু-মন্দ ভাব-কম্পনে দোলায়িত, যেখানে কল্পনা অর্ধ-জাগ্রত-ভাবে শিথিল মুষ্টিতে তাহার বিষয়কে ধারণ করে, যেখানে কাব্যরসধারা সংহতি হারাইয়া কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিন্দুরূপে ক্ষরিত হয় সেখানে ছন্দও তাহার কাব্যসুলভ নৃত্যভংগী সংযত করিয়া বালুকা-প্রান্তশায়ী। শীর্ণগতি নদীর ন্যায় গদ্যের উত্তেজনাহীন পদক্ষেপ অবলম্বন করে। (২) পক্ষান্তরে যেখানে আবেগ অতিশয় তীব্র ও মর্মভেদী, সেখানে ভাবের দুঃসহ উত্তাপই ছন্দ ও ভাষার লীলায়িত বিস্তারকে সংকুচিত করিয়া তাহাদের মধ্যে গদ্যের নিরাভরণ তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টবাদিত্বের সঞ্চার করে। উদাহরণস্বরূপ ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি কবিতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়—

A slumber did my spirit seal
I had no human fears ;
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছন্দ একেবারে বর্জিত হয় নাই; ইহা কথ্যরীতির সহজ ধারা অংগীভূত করিয়া তাহার সাহায্যেই তীব্রতম মনোবেদনাকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। (৩) কবির গণতান্ত্রিক বিবেক

অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়া তাঁহার মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে তাঁহার কাব্যচর্চা স্থলভ কল্পনা-বিলাস মাত্র, পৃথিবীর বেদনার সহিত ইহার নাড়ীর কোন যোগ নাই। স্থতরাং কবিতার সমস্ত কারুকার্যখচিত বৈচিত্র্য পরিহার করিয়া তিনি কথ্য ভাষার অলংকারবর্জিত রিক্ততাকে বরণ করেন ও এই উপায়ে জনসাধারণের চিত্তের সহিত নিজের নিবিড় সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হন। কাব্য-ধর্মী গদ্যের উদাহরণ পাই ডি-কোয়েনসির রচনায় ও গদ্যধর্মী কাব্যের প্রধান উদাহরণ আমেরিকান কবি হুইটম্যানের Leaves of Grass-এ। ইহা ছাড়া মোটামুটি আবেগ-প্রধান গদ্য-রচনায় খণ্ডিত ছন্দের একটা ঝংকার ও ধ্বনি-প্রবাহ শোনা যায়। পক্ষান্তরে, বিতর্কমূলক কাব্য রচনাতে, যেমন ব্রাউনিং-এর কবিতা ও ড্রাইডেন, পোপের ব্যংগাত্মক কাব্যে কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দরীতির অনুবর্তন প্রাধান্য লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাগুলিতে পূর্বোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টি স্থপরিস্ফুট তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার ন্যায় ছন্দ-যাদুকর যে ছন্দের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন না, ইহা ধারণাতীত। তথাপি নূতন পরীক্ষার কৌতূহল তাঁহার সমস্ত কবি-জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া প্রবল হইয়াছিল। কোন কোন সম্রাট যেমন তাঁহার অতি বিশ্বস্ত অমাত্যের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হইয়া তাহার সহায়তা ছাড়াই রাজ্যশাসনে প্রয়াসী হন, তেমনি আমাদের ছন্দ-সম্রাটও বোধহয় অনুরূপকারণে ছন্দ-নিরপেক্ষ হইয়া নিজ সহজ শক্তি পরীক্ষা করিতে উৎস্থক হইয়াছিলেন! কবিতার প্রাণের গোপন রহস্য কি ছন্দের সোনার কৌটার মধ্যে, কি কবির নিজ অনুভূতিতে, ইহাই নিঃশেষে পরীক্ষা করিবার জন্যই তিনি উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আত্মশক্তিতে অতি-প্রত্যয় হেতু মহাকবিরা এরূপ বিপৎসংকুল পথে মাঝে মধ্যে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে হইয়াছিল যে, কবিকল্পনার ব্যতিরেকে কেবল রিক্ত বিবৃতির দ্বারা পাঠকের চিত্তে ভাবোদ্রেক করা সম্ভব। সেই জন্য তিনি তাঁহার Simon Lee-তে আশা করিয়াছেন যে, তাঁহার গল্পের পাদ-পূরণ পাঠকই করিয়া লইবে। তাঁহার এ আশা পূর্ণ হয় নাই—কবির প্রচ্ছন্ন ইংগিত অধিকাংশ পাঠকের বোধ-শক্তির অতীত। ইহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনের অনেক কাব্য, বিশেষত 'নবজাতক'-এ গণতান্ত্রিক কবির আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, পরাধীন,

জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত, হৃত-সর্ব্বস্ব জাতির সমস্ত হৃদয়-বেদনা, সমস্ত অপরিস্ফুট আশা-আকাংক্ষা ও করুণ দিবা-স্বপ্ন তিনি নিজ কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। ব্যাকুল উন্মুখতার সহিত তিনি এই নব কবির অরুণোদয়ের প্রতীক্ষমাণ ছিলেন, যিনি সত্য সত্যই "মূঢ়, মূক কণ্ঠে" ভাষা দিতে পারিবেন, যিনি সহস্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বাগ্‌দেবীর চরণে মন্ত্র-অর্ঘ্য প্রদান করিবেন তাঁহার গদ্য-কবিতা হয়ত এই অনাগত কবির জন্য পথ-নির্দেশক ইংগিত-এই কল্পনা নিতান্ত অসংগত নাও হইতে পারে।

(৩)

এবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্লেষণ করিয়া উপরের সাধারণ মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণের চেষ্টা হইতে পারে। (১) রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গদ্য-কবিতায় সুরের লঘুতা ও কল্পনার অর্ধ-সক্রিয়, স্তিমিতভাব পরিস্ফুট। বিশেষত আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতাগুলি এই লক্ষণাক্রান্ত। কতকগুলি কবিতা মনের একটি ক্ষণিক আবেগ ও আকস্মিক খেয়ালকে ছন্দ-বন্ধনে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় লেখকের কল্পনা খুব উঁচুসুরে বাঁধা—ইহার cosmic range বা বিশ্বব্যাপী প্রসার দার্শনিকতার উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত কবিতাতে কবি বিশ্বপ্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির অমোঘ-নিয়ম-শৃংখলে বদ্ধ কক্ষাবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—সৌরজগতের বিশাল পটভূমিকার উপর তাঁহার কল্পনার আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাতে লেখকের সমগ্র কাব্যের চিরন্তন সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে—প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলা ও গতির মধ্যে তিনি তাঁহার সত্তাকে ডুবাইয়াছেন—মানব-জীবনের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা ও আসক্তি-লিপ্ত মোহাবেশকে চির-চঞ্চল বিশ্ব-জীবন-প্রবাহের নির্ঝর-ধারায় স্নান করাইয়া তিনি পুত ও নির্মল করিয়াছেন। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে কতকগুলিতে কোন একটা দিন কবির বিশেষ দৃষ্টি-ভংগীতে রূপান্তরিত, ও অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্যের শৃংখলমুক্ত হইয়া অসীমের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। ২৫শে বৈশাখে রচিত কতকগুলি কবিতাতে কবি নিজ জীবনকে বিভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন—ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, ও সমস্ত খণ্ডিত প্রচেষ্টা ও অসম্পূর্ণ প্রবণতার মধ্য দিয়া ইহার অখণ্ড মূর্তিটি, ইহার ধ্যানরূপটি ফুটাইতে চাহিয়াছেন। (৪) কয়েকটি প্রেম

কবিতাও এই শিথিল, ছন্দ-বন্ধনহীন রূপে প্রেমের চিরন্তন রহস্যটি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। (৫) কয়েকটি কবিতায় সাধারণভাবে আর্ট ও জীবন-সমস্যার উপর কবির প্রগাঢ় চিন্তাশীলতাই কবিতার প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত সারসংকলন হইতে আমরা গদ্য-কবিতাতেও কবির বিষয়-বৈচিত্র্য ও কল্পনার বহুমুখীনতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

এই শ্রেণী-বিভাগ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলি ছাড়া বাকী সমস্তগুলিই বিষয় ও ভাবপ্রেরণায় সনাতন ছন্দোবদ্ধ কবিতার অনুরূপ। আখ্যায়িকা ও ক্ষণিক, লঘু-মনোভাবাত্মক কবিতাগুলি সম্বন্ধেই নূতন গদ্যরীতি প্রয়োগের সার্থকতা আছে; কাজেই এই রীতির সাফল্য ইহাদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে বিবেচ্য। 'পুনশ্চ'-তে 'অপরাধী', 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'শেষ চিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে' ও 'প্রথম পূজা'; 'শেষ সপ্তক'-এ 'রঘু ডাকাত', 'নেহাল সিং-এর আত্মদান' ও 'শ্যামলী'তে 'কণি', 'দুর্বোধ', 'অমৃত' ও 'বঞ্চিত'—এই গুলি মূলত ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরস-মেশানো গল্প-বিবৃতি। 'শ্যামলী'তে 'বিদায়-বরণ' ও 'হারানো মন' মেঘখণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মুহূর্তের ভাব-ঝলকের প্রতিচ্ছবি।

আখ্যায়িকা কবিতাগুলির আকর্ষণ বহুবিধ। 'অপরাধী'তে তিনুর দুষ্টুমির মধ্যে যে একটি স্নেহযোগ্য, ভারমুক্ত মনের ছাপ আছে, তাহার মিথ্যা-ভাষণে যে চিত্তাকর্ষক সরসতার পরিচয় মিলে তাহাই কবিতাটির মূল সুর। ইহার রস ঠিক কাব্যমূলক নহে, চরিত্রসৃষ্টি-মূলক। 'ছেলেটা' কবিতায় আর একটি দুষ্ট বালকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার দুষ্টুমির মধ্যে দুঃসাহসিকতা, নূতন অভিজ্ঞতা আহরণের কৌতূহল, প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রবণতার মিশ্রণ আছে। এই বালক কবিতায় রস পায় না, কিন্তু ইহার জন্য কবিতাই দায়ী, কেন না, সাধারণ কবিতায় প্রাণিজগতের কৌতূহলোদ্দীপক রহস্যকথা স্থান লাভ করে নাই। 'বালক'-এ আর একটি দুষ্ট বালক তাহার দৌরাত্ম্যের অবাধ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনহীন আনন্দের চরিতার্থতার দ্বারা গ্রামের সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরই স্বত্বাধিকার-মূলক আইনের অপরিচিত এক নূতন দাবীর সৃষ্টি করিয়াছে। অকস্মাৎ এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কবি নিজ বাল্যজীবনের বহিঃ-প্রতিরুদ্ধ মানস-চঞ্চলতার প্রগাঢ়, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি ভরিয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে কাব্যোৎকর্ষের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। 'শেষ সপ্তক'-এ ৩২ ও ৩৩

সংখ্যক কবিতা যথাক্রমে রঘু ডাকাতের পরোপকারপ্রণোদিত ডাকাতি ও নেহাল সিংহ নামক শিখ বালকের আত্মোৎসর্গের কাহিনী। এই গল্পগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত চড়া সুরের ভাব উন্নততর ছন্দ-কৌশলের দাবী করে; গদ্য-ছন্দের শিথিল, এলায়িত ভংগীর মধ্যে ইহাদের তীব্রতর ভাবপ্রবাহ যেন বাঁকে বাঁকে খণ্ডিত ও প্রতিহত হয়। বিশেষত নেহাল সিংহের মৃত্যুবরণ কবির 'কথা ও কাহিনীর' দৃপ্ত-পৌরুষব্যঞ্জক, উদাত্ত-ছন্দোবদ্ধ অনুরূপ কাহিনীগুলির কথা অনিবার্যভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই তুলনায় গদ্য-কবিতার অনুপযোগিতা তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে।

'শেষ চিঠি', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া' ও 'সাধারণ মেয়ে' (পুনশ্চ); 'কণি' ও 'অমৃত' (শ্যামলী) প্রেম-কাহিনী। ইহাদের মধ্যে ভাবাবেগ ও কবিত্বের স্পর্শ তীব্রতর হওয়াই প্রত্যাশিত। কিন্তু তথাপি অনাবশ্যক তথ্যপুঞ্জের ভারে ইহাদের রসধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। 'শেষ চিঠি'র অন্তর্নিহিত করুণ রসটি অবান্তরের বাধায় ফুটিতে পারে নাই। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' ছিন্ন তথ্যের বাহুল্যে প্রায় অন্বর্থনামা হইয়া উঠিয়াছে। 'ক্যামেলিয়া'তেও অতি-বিস্তৃত ঘটনার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কবিতা গলদঘর্ম হইয়াছে—সংঘটনের স্রোতো-তাড়িত হইয়া কোথাও জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই। 'সাধারণ মেয়ে'তে ঔপন্যাসিকের প্রতি নায়িকার আবেদনের নূতনত্ব কিছু বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে, যদিও কবিতাটিতে কাব্যরসের তাদৃশ স্ফুরণ নাই; 'শ্যামলী'র 'কণি' ও 'অমৃত' এই দুইটি কবিতাতে গল্পের আকর্ষণের সংগে কাব্যরসের মোটামুটি সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতাগুলির সম্বন্ধে এইবার সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভংগী ও নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন, অক্ষয় সম্পদ। তিনি গদ্য, পদ্য ও গদ্য-কবিতা যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার মৌলিক কবিত্বশক্তি স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও অর্ধ-স্বচ্ছ সমস্তবিধ আবরণের মধ্য দিয়াই ভাস্বর। সুতরাং গদ্য-কবিতার মধ্যেও উচ্চাংগের কাব্য-গুণোপেত পংক্তি, বর্ণনা ও ভাবের নিদর্শন অনায়াসে মিলে। তথাপি ইহাদের আংগিক রূপের (technique) অনিবার্যতা সম্বন্ধে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না। অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে ইহাদিগকে বিন্যস্ত না করিয়া ছদ্মবেশ-বর্জিত গদ্যের রূপে ইহাদের কি ক্ষতি হইত বুঝা যায় না। পংক্তিগুলির বিচ্ছেদ-রেখা কোন

ছন্দবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; মনে হয় যেন নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক পতন ও বিরামই ইহাদের দৈর্ঘ্য নিরূপিত করিয়াছে। ইহারা কোনরূপ ছন্দের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহদ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় নাই—প্রতি পংক্তি নিজ সুনির্দিষ্ট অর্থ লইয়া নিঃসঙ্গ, এককভাবে দণ্ডায়মান। অবশ্য অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে গেলে কিছুকাল পরে ছন্দের একটা অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে জাগিয়া ওঠে—কিন্তু সেটা হয়ত অভ্যাস-প্রণোদিত আত্ম-প্রতারণা। চোখের দৃষ্টি হয়ত অজ্ঞাতসারে কানকে প্রভাবিত করে—চক্ষু-মরীচিকা শ্রুতি-বিভ্রম জন্মায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে আমরা রস একপ্রকারের পাই তাহা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু এই রস খাঁটি কবিতার রসের মত গাঢ় ও আবেশময় নহে। ইহা আমাদের চিত্তকে একটা গভীর, ছিদ্রহীন অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন করে না; মনের চারিদিকে একটা অবান্তর-বর্জিত, সুর ও ভাবের ইন্দ্রজাল-রচিত সৌন্দর্য-পরিবেশ গড়িয়া তোলে না। আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া এই কবিতার রস উপভোগ করি না; বাস্তব জগতের সমস্ত বিক্ষেপের সহিত জড়াইয়া আলস্য-জৃম্ভনের সহিত আস্বাদন করি মাত্র। কবি লিখিতে লিখিতে যে হাই তুলিয়াছেন, তাহার ছোঁয়াচ অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

ছন্দের বাঁধ-ভাংগার আর একটি ফল দাঁড়াইয়াছে যে, অনাবশ্যকের আবর্জনা-স্তূপকে ঠেকাইয়া রাখার কোন উপায়ান্তর আবিষ্কৃত হয় নাই। ছন্দের কঠোর সংযম চিন্তা ও ভাব-ধারার মধ্যে ঐক্য-সংহতির সৃষ্টি করে—কবিতাকে বাহুল্য-বর্জিত সৌন্দর্য ও গঠন-লালিত্যে রূপায়িত করিয়া তোলে। গদ্য-কবিতাতে গদ্যোচিত তথ্যপ্রধান মনোভাব লেখককে অতি-পল্লবিত মুখরতা ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা-বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে। কাব্যনদী সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত না হইয়া নানা অগভীর শাখা-পথে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার কলধ্বনি ও গতিবেগ হারাইয়াছে। তর্ক, উদাহরণ, জীবনচরিতের অতিরিক্ত তথ্য-সন্নিবেশ, অসংহত, বিচ্ছিন্ন চিন্তা ইত্যাদি গদ্যরীতির অসংকুচিত প্রয়োগ কবিতার মধ্যে একটা বিসদৃশ অসংগতির ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতার অতিবিস্তৃত ও সীমা-রেখাহীন প্রাংগণে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অপ্রাসংগিক, পথিক চিন্তা ও কল্পনার দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহাদের সমবেত কণ্ঠের কোলাহলে যে একটা অস্পষ্ট সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্তি দিতে পারে না। গদ্য-মনোভাবের

প্রাধান্যের প্রমাণ স্বরূপ 'অপরাধী' কবিতায় অবিবেচনার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত, পণ্ডিতের আসনে কালীর ভূষা লাগাইবার অপরাধে অভিযুক্ত বালকের প্রতি হেডমাষ্টারের কঠোর শাস্তিদানের গল্পটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাখা-প্রবৃত্তি আর যাহারই নিদর্শন হউক, কাব্য-মনোবৃত্তির নহে। কালীর দাগ যে কেবল পণ্ডিতের পরিচ্ছদেই লাগিয়াছে তাহা নহে, কাব্য-সরস্বতীর অমল শ্বেত বসনও এই কলংক-চিহ্নে অংকিত হইয়াছে।

কবির পক্ষ হইতে তাঁহার অনুসৃত রীতির সমর্থনে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথম, কবিতার সংগে ছন্দের মিলন এত দীর্ঘকালব্যাপী যে আমরা উহাকে প্রায় নিত্য-সম্বন্ধের পর্যায়েই ফেলিতে অভ্যস্ত। ইহার ব্যতিক্রম আমাদের স্বাধীন সৌন্দর্য-বোধ অপেক্ষা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারকেই অধিক পীড়া দেয়। সুতরাং অপরিচিতের প্রতি সংকোচই পাঠকের অতৃপ্তির প্রধান হেতু। যেমন অনেকে চিনির মিষ্টত্বের লোভেই চা-এর প্রতি আকৃষ্ট হন, তেমনি অনেক পাঠকের কাব্যানুরাগ মুখ্যত ছন্দ-ঝংকারের জন্যই! এরূপ ক্ষেত্রে ছন্দমোহ হইতে মুক্তি তাহাদের প্রকৃত কাব্যরুচির পরীক্ষা। সুতরাং কবি অতিরিক্ত শর্করা-প্রীতির প্রতিষেধক স্বরূপই ছন্দহীন কবিতা পাঠক-সমাজকে উপহার দিয়াছেন। ইহার উত্তর অবশ্য গদ্য-কবিতার আকর্ষণী শক্তির উপরই নির্ভর করে—ছন্দ-ঝংকারের পরিবর্তে কবি যাহা দিতেছেন তাহা পাঠকের নিকট তুল্যরূপ উপভোগ্য কি না। এই সম্পর্কে আরও প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ছন্দের ধ্বনি-প্রবাহ (rhythm) যদি কবিতার পক্ষে অত্যাবশ্যক না হয়, তবে ছন্দের পংক্তি-বিভাগের অনুকরণ করার যুক্তিযুক্ততা কোথায়? চোখের দাবী মিটাইবার ব্যপদেশে কানকে ফাঁকি দিবার এই কৌশল কেন? রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ত খাঁটি গদ্যের ধ্বনি-লেশহীন কাঠিন্যকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম। তাঁহার 'বনবীথি' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় তাঁহার কল্পনাধারা গদ্য ও পদ্য এই উভয়বিধ বাহনকেই অবলম্বন করিয়াছে—এবং ইহাদের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য-নিরূপণে আমাদের বিচারবুদ্ধি রীতিমত সংশয়-পীড়িত হয়। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তেও গদ্যের বিশিষ্ট-আকারহীন পাত্র কবিতারসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নিছক কাব্যরস—পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ছন্দের সংগে এই লুকোচুরি খেলার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

কবির স্বপক্ষে যে দ্বিতীয় যুক্তি অবতারণা করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে এই নূতন ধরণের কবিতা উৎকর্ষে চির-প্রথাগত ছন্দ-কবিতার সমকক্ষ হইবে। তিনি গদ্যের মধ্য দিয়া স্বল্পতম (minimum) কাব্যরস সরবরাহ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইহার বেশী দাবী করা অনুচিত। অবশ্য এই নূতন কবিতা সম্বন্ধে কবি যেখানে যেখানে নিজ মতের আভাস দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও তিনি ইহার আপেক্ষিক অপকর্ষ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহার অভিনবত্বের উপরই জোর দিয়াছেন ও এই অভিনবত্ব যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের হেতু ও তীব্রতর জীবন-স্পন্দনের নিদর্শন তাহা আভাসে ইংগিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গদ্যরূপের ভিতর দিয়া ভাবী যুগের কবির নির্বিকার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইবে। প্রত্যাশিত ছন্দ-রূপের অভাবের জন্য পাঠকের যে ক্ষোভ তাহা কারুকার্যখচিত পেয়ালার পরিবর্তে মৃৎপাত্রে মিষ্ট-রস-পরিবেশনের জন্য—তাহাতে রসের কোন তারতম্য হয় না। ছন্দোহীন কবিতার মধ্যে আরণ্যক তরুর উচ্ছ্বসিত, সংযম-বন্ধন-হীন প্রাণ-সম্পদের সারূপ্য। তারপর এই জাতীয় কবিতায় বহিঃছন্দের অভাব পুরণ করিতে হইবে বক্তব্য বিষয়ের স্বাভাবিক ছন্দের উত্থান-পতনের নিয়ন্ত্রণ-কৌশলে—অলক্ষ্য, সহজ ছন্দের অন্তঃপ্রবাহই বিভিন্ন পংক্তিগুলিকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও ঋজু করিয়া রাখিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতাগুলির মধ্যে কবি-প্রত্যাশিত এই নূতন আদর্শ রূপ ধরিয়া ওঠে নাই। সাধারণ কবিতার সহিত গদ্য-কবিতার পার্থক্য প্রাণরসের অতি-প্রাচুর্যে নহে, ইহার শীর্ণতর ধারায়, অবান্তরের জঞ্জাল-স্তূপ ঠেলিয়া ইহার বালুকারুদ্ধ, স্রোতোহীন গতি-চেষ্টায়। অন্তঃছন্দের নিগূঢ় গতিও শ্রুতিগোচর হইয়া ওঠে না। আখ্যায়িকা-জাতীয় একটিমাত্র কবিতায় 'পুনশ্চ'-এর 'প্রথম পুজা'য় ভূমিকম্পের করাল ভয়াবহ বিপর্যয়টি এই গদ্য-ছন্দে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার কারণ এই যে, ইহার ছন্দ-বিধ্বংসী তাণ্ডব নৃত্যছন্দের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির মধ্যে ফুটিয়া ওঠে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য লোকের কথ্য-ভাষা তাঁহার কবিতার ধমনীতে নূতন ওজস্বিতা ও নব-রক্ত-সঞ্চার করিবে। কিন্তু প্রধানত ইহা তাঁহার কবিতার পায়ে বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ও স্থূল, দ্বিধাজড়িত প্রকাশ-ভংগীর শৃংখলা জড়াইয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাও তাঁহার আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই—ইহা বলা যাইতে পারে।

(৪)

আর এক শ্রেণীর কবিতা বিশেষভাবেই গদ্য-কবিতার রূপ ও অনুপ্রেরণার উপযোগী বলিয়া মনে হয়। মনের ক্ষণিক, অগভীর উচ্ছ্বাস, চল্‌তি মুহূর্তগুলি অর্ধসক্রিয় কল্পনার উপর যে স্বল্প-স্থায়ী ছায়া-তুলিকা বুলাইয়া যায়,—এইগুলিই গদ্য-কবিতার আল্‌গা বুননির মধ্যে সার্থকরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। 'পুনশ্চ'-এর অধিকাংশ কবিতাই এই জাতীয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে উত্তেজিত, প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য-সংহতি নাই; ভাবের অনুষংগের মধ্যে একটা শিথিল আকস্মিকতা, একটা অনিয়ন্ত্রিত, অযত্ন-বিন্যস্ত পারম্পর্য আছে। কবি যেন অলস-মন্থর গতিতে, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করিয়াছেন—তাঁহার চোখের সামনে উপস্থিত বস্তুপুঞ্জের বিশৃংখলার মধ্যে কোনমতে একটা পদচারণার সংকীর্ণ পথ করিয়া লইয়াছেন। 'পুকুরধারে' ও 'সুন্দর' কবিতা দুইটিতে তিনি স্মৃতির গহন অরণ্যে পথ হারাইয়াছেন—বর্তমানের 'নোঙর-ছেঁড়া' দুটি দিন তাঁহাকে অতীতে অনুরূপ অনুভূতির কথা মনে পড়াইয়া দিয়াছে। এই যে বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সাদৃশ্য-বোধ ইহা নিছক কল্পনার খেলা মাত্র, মানস-প্রজাপতির পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে স্বচ্ছন্দ-বিহার। 'স্মৃতি' কবিতাটিতে কোন একটি পশ্চিমের শহরের নিরুদ্বেগ, শান্ত জীবনযাত্রার চিত্র নিতান্ত অকারণেই কবির মনের মধ্যে আনাগোনা করে—ইহা যে তাঁহাকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন নাই। 'বাসা'তে ময়ূরাক্ষী নদীর কবিত্বপুর্ণ নাম কবির মনে এইরূপ একটা সৌন্দর্যে, শান্তিতে ঘেরা কাল্পনিক নীড়-রচনার ইচ্ছা জাগাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার কাম্য প্রতিবাসী-দম্পতি যেন এই কাব্যাবেষ্টনের সংগে খাঁপ খায় নাই। "দেখা"তে এক বর্ষাদিনের পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের দুইটি বিভিন্ন রূপ ছন্দব্যতিরেকেও প্রশংসনীয় কবিত্ব-শক্তির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার শেষের দিকের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহাদের চিত্র-সৌন্দর্যই কবির একমাত্র লক্ষ্য—ইহাদের পিছনে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে'র মত কোন প্রচণ্ড, দুর্বার উল্লাস শক্তি-যোজনা করে নাই। এই দুইটি দৃশ্য মাত্র কবির 'দেখার টুকরো', 'ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে' বিস্মৃতি-প্রবাহ হইতে সংরক্ষিত 'দুটি একটি কুঁড়েমির দিনের' বর্ণালিম্পন—ইহারা অখণ্ড, অমর কাব্যানুভূতির গৌরব দাবী করে না। 'ফাঁক' কবিতায় কবি

বার্ধক্যে কাজ-ভোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন—যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যের বিস্মৃতির ফাঁক দিয়াই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবজীবনের লীলা-চপল ও ব্যথা-করুণ মুহূর্তগুলি তাঁহার মনে প্রবেশলাভ করে। 'একজন লোকে' একজন পথিকের পরিচয়হীন, অন্তরে—বাহিরে অজ্ঞাত ইতিহাসের অস্তিত্ব কবির মনে একটা ভাবলেশহীন চিন্তার ছায়া প্রক্ষেপ করিয়াছে।

এই শ্রেণীর কবিতার দুইটি উৎকৃষ্টতম উদাহরণ 'শ্যামলী'তে অন্তর্ভুক্ত 'হারানো মন' ও 'বিদায়-বরণ'। প্রথমটিতে মনের একরূপ আত্মবিস্মৃত ও কুয়াসাচ্ছন্ন, ঝাপসা আত্মচেতনার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মীভূত অবস্থার চমৎকার বর্ণনা আছে। 'বিদায়বরণে' বর্ষাপ্রভাতে যে সমস্ত ফিকে রং-এর অর্ধস্পষ্ট ভাবনার আবছায়া ভাষার মধ্যে ধরা না দিয়া চিত্তাকাশে লঘুপদে সঞ্চরণ করে, তাহাদের সমগ্রতাকে একটি অবগুণ্ঠিতা, অভিমানিনী নারী-মূর্তিতে কল্পনা করা হইয়াছে।

'যত কিছু ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপ-হারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটা-পরা অভিমানিনী।'

এই দুইটি কবিতার বিষয় ও কল্পনার ভাব-গত ঐক্যের জন্য ছন্দের অভাব বরণীয় না হইলেও সহনীয় হইয়াছে।

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে এইবার সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে অলস, উদাস মানস-অবস্থার কাব্য-বর্ণনা বুঝিবা কল্পনার শৈথিল্য বা নিষ্ক্রিয়ত্বের সূচনা করে। কীটসের Ode on Indolence মোটেই শিথিল, অলস কল্পনার সৃষ্টি নয়। যেমন কোন দক্ষ চিত্রকর যখন দিগন্তে ধূসর কুহেলিকার ছবি আঁকেন, তখন ইহার আপাতদৃশ্য বর্ণ-বিরলতা প্রকৃতপক্ষে রেখা ও রং-এর খুব সূক্ষ্ম, নিপুণ সমাবেশ, সেইরূপ মনের স্তিমিত, গোধূলি-অন্ধকারের বর্ণনাও খুব সতেজ, নির্বাচন-কুশলী, পটভূমির আলো-ছায়া-বিন্যাসে সুদক্ষ কল্পনা—মায়ার উপর নির্ভর করে। 'ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমি'তে যে কুঁড়েমির ছবি আঁকা হয় তাহা আর্টের দিক দিয়া খুব উচ্চস্তরের নয়। কবি তাঁহার সমস্ত কাব্য-জীবন ধরিয়াই

কাজ-ভোলানো গান গাহিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই কাজ তিনি ভোলাইয়াছেন প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশের উর্ধ্বে আনন্দের নিবিড়তর অনুভূতির দ্বারা। যেখানে এই আনন্দ ফুটিয়া ওঠে নাই, সেখানে লৌকিক কর্তব্যের বিস্মৃতি লেখকের উপদেশের মত শোনাইয়াছে; তাহা পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করে নাই। 'একজন লোকে' কবি একজন পথিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে অন্তরংগ পরিচয় পান নাই, এই তথ্য আমাদের জানাইয়াছেন। কিন্তু এই কবিতাতে কবির যে দৃষ্টিভংগী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মোটেই কাব্যোচিত নহে। কবি-কল্পনা এই সমস্ত লৌকিক পরিচয়-নিরপেক্ষ; বরং অপরিচয়ের ব্যবধান তাহার পক্ষে একটা ব্যাকুল আগ্রহ ও করুণ, ব্যগ্র জিজ্ঞাসার হেতু হয়। যে সুন্দরী জল ভরিতে গিয়া তাহার কংকণ-ঝংকারের মধুর ইংগিতে কবিকে উন্মনা করিয়াছিল বা যাহার নীরব, গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক হাসি তাঁহার নিরুদ্দেশ-যাত্রার তরণীকে অস্ত-সূর্যের রক্তচ্ছটার অভিমুখে চালাইয়াছিল, সেই কল্পনাজগতবিহারিণীদের সম্পর্কে তিনি কোন নাম-গোত্রাত্মক পরিচয়ের প্রতীক্ষা করেন নাই। তাহাদের সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-স্পর্শ এক মুহূর্তেই তাঁহার কল্পনাকে ভাস্বর করিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণকালে যে নিঃসংগ, শস্যচ্ছেদননিরত বালিকার মধুর গান শুনিয়াছিলেন বা যে দুইটি বালিকা একদিন এক হ্রদের ধারে "তুমি কি পশ্চিমের দিকে যাইতেছ?" —এই সহজ, সরল প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাকে সূর্যাস্তরাগরঞ্জিত মেঘলোকের মধ্য দিয়া অনন্ত যাত্রার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল, তাহার সংগে লৌকিক অপরিচয় ত তাঁহার কল্পনাকে প্রতিহত করে নাই। কেবল তথ্য বা নেতিমূলক (negative) চিন্তাধারা দর্শন-বিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কবির জগতে তাহাদের কোন মূল্য নাই। আসল কথা, কবি-প্রতিভার যে রঞ্জন-রশ্মি বাহ্য-পরিচয়ের অস্থিমাংস ভেদ করিয়া একেবারে প্রাণশক্তির উৎসদেশে পৌঁছে, তাহা এই সমস্ত কবিতায় আবৃত রহিয়াছে। এখানে আমরা কাব্যের অপরিণত কাঁচা-মাল যে পরিমানে পাই, তাহাদের চরম পরিণতি ও রূপান্তরসাধন সে পরিমাণে পাই না। এই কবিতাগুলি কাব্য-জগতের নীহারিকা-মণ্ডলী—একরূপ অস্পষ্ট, আলো-আঁধারে-মেশা রশ্মি বিকীরণ করে; তারকার অখণ্ড, উজ্জ্বল জ্যোতি তাহাদের অনধিগম্য।

এই প্রসংগে লক্ষণীয় যে, 'পুনশ্চ'-এর শেষ তিনটি কবিতায়—'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন'—একটা ছন্দ-প্রবাহ অনুভব করা যায় এবং প্রধানত

এই জন্যই তাহাদের মধ্যে একটা ভাব-গত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাব-ব্যঞ্জনা একটি কেন্দ্রস্থ রসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—অনাবশ্যকের প্রক্ষেপ তাহাদিগকে অযথা ভারাক্রান্ত করে নাই। ছন্দ যে শক্তিশালী কল্পনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি—তা সে যতই ক্ষীণ ও দুর্নিরীক্ষ্য হউক—এই সত্য এই কবিতা তিনটিকে 'পুনশ্চ'-এর অন্যান্য কবিতার সহিত তুলিত করিলেই বোঝা যাইবে।

(৫)

অপর এক শ্রেণীর কবিতা উচ্চাংগের দার্শনিক চিন্তা ও অনুভূতির আধার। এইগুলিতে কবির কল্পনা বিশ্বপ্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য ও মানব-সত্তার দুর্জ্ঞেয়তা প্রভৃতি দুরূহ আলোচনায় নিবিষ্ট হইয়াছে। 'পুনশ্চ'-এ 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি খুব উচ্চস্তরের কল্পনার নিদর্শন। আদর্শের অভিযানে চলমান মানব-জাতির শোভাযাত্রা, তাহাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাসের ঘূর্ণীবায়ু ঠেলিয়া দুঃসাধ্য অগ্রগতি, নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাহাকে হত্যা, এই হত্যার অপ্রত্যাশিত তীব্র প্রতিক্রিয়া, শেষে নানা বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এক শুভপ্রভাতে এই আদর্শের অবতার এক নব-জাত শিশুর সম্মুখে যাত্রা-শেষ—এই সমস্তই ইতালীয় মহাকবি ডান্টের মহিমান্বিত, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নরকে সমভাবে প্রসারশীল কল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। এই বিরাট, দ্রুত-সঞ্চারী গতিশীলতার অনুসরণে ছন্দের কথা আমাদের মনে থাকে না—ইহার একটা নিজস্ব অন্তর্নিহিত তাল ছন্দের হিসাবনিকাসের পদক্ষেপ-রীতি অতিক্রম করিয়া আমাদের বক্ষে স্পন্দিত হইতে থাকে। এই কবিতাটি কবির গদ্যরীতি-প্রয়োগের অসামান্য সাফল্যের নিদর্শন। 'শেষ-সপ্তক'-এর অধিকাংশ কবিতাই দার্শনিক-ভাবাপন্ন। ৫, ৯, ১২, ২২, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যক ও "শ্যামলী"তে 'আমি' নামক কবিতাতে মানব-সত্তার দুরবগাহতার বিস্মিত উপলব্ধি কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। প্রতিদিনের অনুভূতিরসে পুষ্ট ও বর্ধিত মানব-সত্তা তাহার অখণ্ড সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হয় না, যদিও এই সমগ্রতার উপলব্ধি কবি-প্রাণের নিগূঢ় আকাংক্ষা। আমাদের মানস মানচিত্র জলে স্থলে, বাষ্পে সূর্যালোকে, সূচনায় সমাপ্তিতে, ব্যঞ্জনায় পূর্ণপ্রকাশে বিচিত্র ও রহস্যময়—তাহার কারণ শিল্পীর যে-ধ্যান অপ্রকাশের যবনিকার অন্তরালেই সক্রিয়, তাহা এখনও নিজ সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে নাই। মানুষের লৌকিক পরিচয় তাহার একটা ছদ্মবেশ,

ভালবাসার বসন্ত-পবনে তাহা অপসারিত হইয়া যে মূর্তি আবিষ্কৃত হয়, তাহা স্বয়ং-স্বতন্ত্র ও অসাধারণ; আমাদের জীবনের অম্লান, প্রকৃতির চির-চঞ্চল গতির সংগে এক ছন্দে বাঁধা তারুণ্যের সংগে অনাদি কালের জন্মান্তর হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ, বহুজীবনের আসক্তি-লোলুপতায় জীর্ণ, বহু-ভ্রমণে শ্রান্ত একটা বার্ধক্য, সহযাত্রিতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; এই সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিলেই আমাদের সত্তার মুক্ত, উজ্জ্বল স্বরূপটি চেনা যায়। হঠাৎ এক নিমেষের অসামান্য স্পর্শে অস্তিত্বের সহজাত অমরতা-বোধ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতির সহিত স্ফুরিত হয়। বস্তুজগতের রং ও রূপ ব্যক্তিত্বের আত্ম-চেতনার মধ্যেই প্রতিফলিত—'মানুষের অহংকার-পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প' জগৎ হইতে ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য ও হৃদয়াবেগ মুছিয়া গিয়া নীরস অস্তিত্বের শুষ্ক কংকাল প্রকটিত হইবে এবং ভগবানকে পুনরায় আমিত্ব-বোধ জাগাইতে সাধনা করিতে হইবে।

প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলা ও গতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-লাভের প্রধান উপায়। এই প্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি কবির সমস্ত বয়সের কাব্যেই অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। "শেষ সপ্তক"-এর ৪, ৮, ২৩, ২৬, ২৯, ৪৪, ও ৪৬ সংখ্যক কবিতা ও "শ্যামলীতে" 'অকালঘুম', 'প্রাণের রস' ও 'শ্যামলী' নামক কবিতাতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। যৌবনের মায়া-মোহের লুপ্তাবশেষ, অস্তসূর্যের বিচিত্র-বর্ণরঞ্জিত বাষ্প-ঘনিমার মত, আমাদের মানসাকাশকে আবিল ও অস্পষ্ট করিয়া তোলে—এই অলস আবেশ-জড়িমার মরীচিকা হইতে বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগকে 'শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতা'র মধ্যে আহ্বান করে—কবি অস্তিত্বের এই সহজ, সনাতন ধারার সহিত নিজ প্রাণের প্রবাহ মিশাইয়া দিয়া সমস্ত দ্বন্দ্ব-সমস্যার অতীত এক শান্তি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে চাহেন। অতীত যুগের শিল্পীরা শিল্পসাধনায় নিজ নাম স্বাক্ষর করেন নাই—সৃষ্টির আনন্দ তাঁহাদের খ্যাতির লোলুপতাকে অন্তরালবর্তী করিয়াছিল। সেইরূপ কবির গানগুলিও বহিঃপ্রকৃতির আত্ম-বিস্মৃত প্রাণহিল্লোলের মত চলতি মুহূর্তের অঞ্জলিভরা দান—ইহারা পাতার কম্পন, হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলকের মত প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ আনন্দের প্রতিচ্ছবি। এই নামের আকাংক্ষারহিত সৃজনানন্দে কবি ভগবানের সহধর্মী। এক শরৎ প্রভাতে সৃষ্টির নবীনত্ব প্রাত্যহিক, অভ্যস্ত তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়া কবির চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যেমন করিয়া

সহমরণোন্মত বধূ মৃত্যুর আকস্মিকতার পিছনে 'চিরজীবনের অম্লান স্বরূপকে' প্রত্যক্ষ করে। আর একদিন এক অতীত দিবস তাহার সমস্ত আকস্মিক বিক্ষেপ ও অনাবশ্যক বস্তু-সঞ্চয়ের ভার-মুক্ত হইয়া এক অভিনব রসমূর্তিতে, রূপ ও ব্যঞ্জনার অপরূপ সামঞ্জস্যে কবির পশ্চাৎ-দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক বনস্পতি—যে তাহার 'শাখাব্যূহের জটিলতা' অতিক্রম করিয়া তাহার শিরোদেশকে নিঃশব্দ আকাশের আলোক-প্লাবিত শান্তির মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়াছে—কবির ভাষাকে প্রাঞ্জল, নিঃসন্দিগ্ধ ঋজুতা দিয়াছে ও দক্ষিণ বাতাসের মধ্যবর্তিতায় যে ভালবাসার মন্ত্র নবকিসলয়ের মর্মে ধ্বনিত হয় সে মন্ত্রকে তাঁহার নিবিড়তম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের সাধারণ জীবনে যে দিন-পরম্পরা প্রয়োজনের হাইড্রলিক চাপে পিণ্ডীভূত, একাকার হইয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য হারায়, কবির বিশিষ্ট দৃষ্টি তাহাদিগকে এই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্রপেষণ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিটি দিনের উপর এক নূতন গৌরব ও সৌন্দর্য আরোপ করিতে চাহে। কবিও এই অফুরন্ত বৈচিত্র্যস্রোতে নিত্য স্নান করিয়া প্রত্যেক দিন নিজের নূতন নামকরণ করিবেন—আজকের দিনের নাম খাট্‌বে না কালকের দিনে। 'শেষ-সপ্তক'-এর ৪৪ সংখ্যক ও 'শ্যামলী'র শেষ কবিতাটি শ্যামলী কুটীরের পরিকল্পনা ও তাহার কার্যে পরিণতির বিষয়ে লিখিত। নিখিল বিশ্ব-জগতের সংগে নিগূঢ় আত্মীয়তা-বোধ কবির একটা মৌলিক, অনায়াস-লব্ধ অনুভূতি। ইহা তাঁহার কল্পনাকে ঊর্ধ্বাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষাবর্তন ও ভূগর্ভে প্রাণ-স্পন্দনের রহস্যময় প্রথম অংকুরোদ্ভেদ—এই উভয়ের সহিতই এক আশ্চর্য ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে—বিশ্বের বিচিত্র, বিপুল প্রাণ-যাত্রার সংগে ইহার গতিচ্ছন্দকে মিলাইয়াছে। বার্ধক্যের শেষ সীমায় কবি তাঁহার কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযান সংযত করিয়া তাঁহার এই মৃত্তিকাপ্রীতিকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন; মাটির ঘরের মধ্যে, এক স্নেহশীতল, সনাতন বিশ্ববিধানের সহিত সামঞ্জস্যশীল, ক্ষমা ও বিস্মৃতির ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ, ও বাংলাদেশের প্রকৃতি ও নারী-জাতির শ্যামল মাধুর্যের প্রতীক আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটি কবিতায় আবেগের আন্তরিকতা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ভাবগত ঐক্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছে।

কয়েকটি কবিতার মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও বিশ্ব-প্রসারী কল্পনার (cosmic range of imagination) পরিচয় মিলে। 'পুনশ্চ'-এ 'কীটের সংসারে'

কবিতায় প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে কাব্য-রসে অ-রূপান্তরিত কিছু কৌতূহল ব্যক্ত হইয়াছে। মৃত্যুর প্রতি কবির চিরন্তন আকর্ষণ 'পুনশ্চ'-এ 'মৃত্যু' নামক ও 'শেষ-সপ্তক'-এ ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিন্তার রসহীন সমষ্টি মাত্র; অপর দুইটিতে মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর অর্থপূর্ণ মন্তব্য উপযোগী কল্পনার সহায়তায় নিবিড়, রস-ঘন রূপ পাইয়াছে। এই গতিশীল সংসারের গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায় মৃত্যু, অন্যথা পরিবর্তনহীন বর্তমানের পাষাণভার অসহনীয় হইত; মৃত্যুর তিমির-তোরণ দিয়াই, প্রতিদিন রাত্রির অবসানে যেরূপ, সেইরূপ কল্পান্তেও, প্রথম-জাত অমৃতের বিজয়-প্রত্যাবর্তন। একটি দিনরাত্রি, স্বল্পস্থায়ী মানব-জীবন ও অনমুমেয়, বিশাল কল্প-যুগ— এই তিন ক্রম-বর্ধমান পরিধির মধ্যে মৃত্যুর অনুরূপ প্রক্রিয়া ও অভিন্ন ফল কবি চমৎকারভাবে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছেন। সময় সময় দুই-একটি ছত্রের মধ্যে কবিতার সনাতন দীপ্তি এই কারুকার্যহীন, হেলায় রচিত আধারের মধ্য দিয়াও বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে—
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে —শেষ সপ্তক, '৩৯'

মহাকালের বিরাট পটভূমিকায়, এক এক সভ্যতার উদ্ভব ও বিলয়, সৌরজগতে নূতন নূতন গ্রহের আবির্ভাব ও তিমির-তলে অবগাহন—অতি নগণ্য, উপেক্ষণীয় ব্যাপার—'বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘ ও ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতই' ইহাদের অস্তিত্বকাল মহাকালের ধ্যান-ধৃত অক্ষমালার এক একটি বীজমাত্র। এই চিরাবর্তিত পরিবর্তনের মধ্যে মহাকাল যে অক্ষুব্ধ শান্তিতে বিরাজমান, কবি তাহারই প্রার্থী। আবার মহাকালের এই বিশাল বিচরণ-ক্ষেত্রের সহিত তুলনায় মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমৃতভরা, আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি অমরতার বেশী দাবী করিতে পারে।

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে (তারা ?) থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়। —শেষ সপ্তক, '২১'

শুকতারার দ্বৈত-জীবন—একটি গ্রহ-জগতের হৃদয়-সম্পর্কহীন, বিশাল মরুভূমিতে, আর একটি মানব-জীবনের সুখ-দুঃখভরা, শ্যাম-সরস ক্ষুদ্র স্নেহ-নীড়ে—কবির কল্পনাকে স্পর্শ করিয়াছে ও এই দুই-এর মধ্যে, তাহার জ্যোতিষ্ক-জীবন অপেক্ষা দ্বিতীয়-পরিচয়টি যে আমাদের নিকট বেশী সত্য তাহা কবি ঘোষণা করিয়াছেন।

এই দার্শনিকতা-প্রধান কবিতাগুলি বিষয়-গৌরবের জন্যই অনেক পরিমাণে অপ্রাসংগিকতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কল্পনার শিখাও অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির ও প্রোজ্জ্বল। যেমন কোন কোন সৌধে বৃহদাকার পাথরগুলি নিজ নিজ গুরুভারেব জন্যই কোন বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকেও পরস্পরকে স্বস্থানে ধরিয়া রাখে, তেমনই এই কবিতাসমূহের ভাব-গরিমা ছন্দ-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও ইহাদিগকে একটা গঠন-গত ঐক্য ও দৃঢ়বদ্ধ সংহতি দিয়াছে। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ইহাদের মধ্যে কল্পনাশক্তির অপ্রাচুর্য নাই। তথাপি মনে হয় যেন ছন্দের অভাবের জন্য ইহারা চরম প্রকাশ-সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কবি অঞ্জলি ভরিয়া যে স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়াছেন, আধারের শিথিলতার জন্য যেন অংগুলির ফাঁক দিয়া তাহার কতক অংশের অপচয় ঘটিয়াছে। কবিতাগুলির সমাপ্তির মধ্যে চরম পরিণতির (climax) সুরটি বাজিয়া ওঠে না। ছন্দ-প্রবাহের মধ্য দিয়া যে একটি ক্রমবর্ধমান বিপুল গতিবেগ আহরিত হয়, আবেগ-কম্পন পর্দায় পর্দায় উচ্চতর সুরে আরোহণ করিতে থাকে, এখানে তাহার অভাবের জন্য একটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। বিভিন্ন পংক্তিগুলি স্ব-স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চল গাম্ভীর্যে দাঁড়াইয়া থাকে, ধ্বনি-তরংগের অনিবার্য স্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া, তাহাদের ছোট ছোট সুরগুলিকে সংহত করিয়া বিরাট ঐক্যতানের মহাসমুদ্রে লুপ্ত করিয়া দেয় না। কাব্য-জগতে ছন্দের প্রধান অবদান—স্মরণীয়তা। 'শেষ-সপ্তক'-এর কবিতাগুলি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে ; কিন্তু যে সহজ আনন্দ ছন্দরূপে মূর্ত হইয়া কবির রচনাকে আমাদের মনে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয় তাহার আস্বাদন এখানে মিলে না। ছন্দের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হইলে এই বিচ্ছিন্ন হীরকখণ্ডগুলি মহাকালের বক্ষে মণিহারের ন্যায় চিরদিন ধরিয়া দোদুল্যমান হইত এই আক্ষেপবোধ আমাদের রসোপভোগের আনন্দকে কিঞ্চিৎ ম্লান করিয়া দেয়।

(৬)

গদ্য-কবিতার মধ্যে প্রেম-কবিতারও যথেষ্ট প্রাচুর্য আছে। 'শেষ-সপ্তক'-এর ১, ২, ৩ ও ৩১ সংখ্যক ও 'শ্যামলী'র 'দ্বৈত', 'শেষ পহরে', 'বাঁশীওয়ালা' ও 'মিলভাঙ্গা' নামক কবিতাগুলিকে এই পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। আখ্যায়িকা কবিতার মধ্যে অনেকগুলিতে যদিও প্রেমের স্পর্শ আছে, তথাপি মোটের উপর ঘটনা-বিবৃতিই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবেগ-প্রধান প্রেম-কবিতাতে ছন্দ-ঝংকারের বিশেষ সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। প্রেমের আবেশ জমাইতে হইলে সুরের সাহায্য অত্যাবশ্যক। ইহা ব্যতীত এই জাতীয় কবিতাতে যে তীব্র হৃদয়াবেগ বর্তমান, তাহা গদ্য-কবিতার অতি-পল্লবিত মুখরতাকে সংযত করে। তথাপি আধুনিক প্রেম-কবিতায় হৃদয়াবেগ অপেক্ষা সমস্যা-সংকুলতাকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়ার রীতি অনুসৃত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে ডন ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাউনিং এই জাতীয় কবিতার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাতে প্রেমের চিরন্তন রহস্য-লীলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকাশগুলি তাহাদের সহজ, ঢেউ-খেলানো গতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। এখানে কল্পনার খুব উচ্চ সুরের তারে ঝংকার নাই; প্রেমের শান্ত, মৃদু কম্পনগুলি মনের উপর যে বিচিত্র রেখা অংকন করিয়াছে সেইগুলিকেই অনুচ্ছ্বসিত ভাব-সংযমের সহিত প্রকাশ করার চেষ্টা হইয়াছে। যে প্রেমের দান আমরা দিনের পর দিন হেলাভরে, উপেক্ষার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি, অকস্মাৎ একদিন সুকঠিন মৃত্যু-বিচ্ছেদের অভিঘাতে তাহার অস্বীকৃত মহিমা দীপ্ত হইয়া ওঠে। প্রেমের হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগ মুখে মুহূর্তের জন্য অমৃত স্পর্শ মাখাইয়া দেয়; জোয়ারের অতর্কিতভাবে উৎক্ষিপ্ত দুর্লভ রত্নের ন্যায় সমস্ত জীবনে তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটে না। বসন্তারম্ভে বিকশিত একটি অরুণ কিশলয় সেই অকথিত প্রেমের বাণী, যাহা অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষায় নীরব রহিয়া গিয়াছে। আবার শুভ মুহূর্তে উচ্চারিত একটি প্রেম-নিবেদনে পরিচয় যেরূপ সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়, সমস্ত জীবনের কার্যকলাপে তাহা হয় না—এই একটি মুহূর্ত জীবন-মৃত্যুর বহু-বিস্তৃত পটভূমিকায় অবিনশ্বর উজ্জ্বলতায় আঁকা থাকিবে। প্রেম বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যে অসম্পূর্ণ আভাস-ইংগিত, যে অর্ধাবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব-পরিচয় থাকে তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে—প্রেমিক-যুগল নিজ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি ও আকাংখার আকুলতা দিয়া পরস্পরকে পূর্ণ বিকশিত করে। তাহার

পূর্বের অবস্থা কুহেলি-মণ্ডিত, বিশ্ব-জাগরণের পরিচয়-সূত্রের সহিত অসংলগ্ন উষার মত :

"উষা যখন আপ্‌না-ভোলা
যখন সে পায়নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখন-পত্রে।"

—'শ্যামলী', 'দ্বৈত'

'মিল ভাঙ্গা'তে আদর্শ-পার্থক্যের জন্য বিচ্ছিন্ন প্রেমিক-যুগলের মধ্যে পূর্বানুরাগের করুণ স্মৃতি যে ক্ষণিক মিলনের আভাস আনে তাহা একের মনে ক্ষুব্ধ আবেগ জাগাইয়াছে। 'শেষ সপ্তক'-এর ৩১ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। প্রিয়ার মৃত্যুর পর শোকোদ্‌ভ্রান্তচিত্ত পুরুষ নিজ বৈঠকখানা পাড়ার ক্লাবে পরিণত করিয়াছে—ইতর তর্ক-বিতর্ক, সুলভ আমোদ ও আবিল কোলাহলের দ্বারা নিজ শোকের উপর বিস্মৃতি-প্রলেপ দিবার জন্য। একদিন কোনও সাময়িক উত্তেজনা ক্লাবের সভ্যবৃন্দকে বাহিরে টানিয়াছিল—ক্লাবের অধিবেশন বন্ধ ছিল। সেই নির্জনতার রন্ধ্র-পথ দিয়া মৃত প্রিয়ার অশরীরী উপস্থিতি, করুণ অনুযোগ ও নীরব ভর্ৎসনার সহিত আদর্শভ্রষ্ট প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। এই ব্যথিত অনুশোচনার সুরটি ম্লান সুরভির মত সমস্ত কবিতাটিকে পূর্ণ করিয়াছে—ছন্দোহীন পংক্তিগুলি এক একটি বিষণ্ণ-মন্থর দীর্ঘশ্বাসের মতই শোনাইয়াছে। মোটের উপর ছন্দোহীন গদ্যে গ্রথিত এই প্রেম-কবিতাগুলি প্রেমের উন্মাদনা নহে, ইহার অবসাদাত্মক, নীচু সুরের কয়েকটি ভাব সুন্দররূপে ফুটাইয়াছে।

(৭)

অন্যান্য কতকগুলি কবিতা বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সবগুলির মধ্যেই প্রগাঢ়, মৌলিক চিন্তাশীলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। 'পুনশ্চ'-এ 'পত্র', 'বিচ্ছেদ' ও 'শেষ সপ্তক'-এ ১৫, ১৬, ও ৩৮ সংখ্যক কবিতা আর্ট সম্বন্ধে গভীর মন্তব্যে পূর্ণ। কবিতার সংগে অবকাশের সম্বন্ধ তারার সংগে আকাশের পটভূমিকার ন্যায়। ছাপার বই-এ সংগৃহীত কবিতাবলী আকাশের নীল বক্ষ হইতে বিচ্যুত, পিণ্ডীকৃত নক্ষত্র-সমূহের ন্যায় অস্বাভাবিক ও অশোভন। শূন্যতার আবেষ্টনের মধ্যেই কবিতার মাধুর্য ঘনীভূত হইয়া ওঠে। ছবি ও কবিতার পরস্পর সম্পর্ক ও সৌন্দর্যের সংগে সুদূরতার নিত্য সম্বন্ধ

কয়েকটি লিপি-কবিতার বিষয়-বস্তু। 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদ' ও 'শেষ সপ্তক'-এর ৩৮ সংখ্যক কবিতায় মেঘদূতের বদ্ধ, সংকীর্ণ, আসক্তি-লিপ্ত প্রেম বিরহের মধ্য দিয়া কিরূপে মুক্তি, প্রসার ও সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছে ও স্থাণু হইতে গতিশীলে, ব্যক্তিগত বেদনা হইতে বিশ্বব্যাপী অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া কাব্যের অনন্ত সৌন্দর্যলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে।

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 'শেষ সপ্তক'-এর ৪৩ সংখ্যক কবিতা কবির জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত। জন্মদিনের প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনই কবিকে তাঁহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের অখণ্ড সমগ্রতা উপলব্ধি করিবার অবসর দিয়াছে। বিভিন্ন বর্ষের জন্মদিন-কবিতাগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে কবির কাব্য-জীবনের একটা সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বর্ষে বর্ষে তিনি জীবনকে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন, তাহার নিকট কোন নূতন সৃষ্টি ও আদর্শের প্রত্যাশা করিয়াছেন. আসন্ন মৃত্যুর কৃষ্ণ পটভূমিকায় ইহার খণ্ডিত পর্যায়গুলি কি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া সুস্পষ্টতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—এই অন্তরংগ ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নামের আশ্রয়ে যে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিগুলি আপন আপন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়লীলা শেষ করিয়া এখন একজন পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধের জীবনেতিহাস উদ্ঘাটনের জন্য রংগমঞ্চ খালি রাখিয়া গিয়াছে, এই কবিতায় তাহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থক পরিচয় চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবির শেষ জীবনের যে ছবি তাঁহার গুণানুরাগী ভক্ত-বৃন্দের "শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ও ক্ষমায় প্রতিফলিত", তাঁহার এই মানসী মূর্তিকেই তিনি "নিজ শেষ বেলাকার সত্য পরিচয়" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মোটের উপর দেখা যায় যে, তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ বিকাশের যুগে তিনি আত্ম-সমাহিত, নিজ কল্পনার ধ্যানেই বিভোর—তাঁহার পরিচয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্রৌঢ় বয়স হইতে বাহিরের উৎসাহ-উদ্দীপনা, বন্ধুর সান্ত্বনা ও ভক্তের সেবা তাঁহার মানসী মূর্তি গঠনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই পরিবর্তন-ধারা কম-বেশী প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রচনার পূর্ণ জোয়ার কতকটা মন্দীভূত হইলে একদিকে লৌকিক ও সামাজিক কর্তব্য, অন্য দিকে নিজ প্রতিভার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কবির অন্তর্জীবনকে অনেকটা বহির্মুখী করে। কবির নির্জন মানসলোক বহুপদচিহ্নাংকিত হয়—বহির্জগতের স্তুতি-নিন্দা-বিচার

ও প্রীতি তাঁহার জীবনের গতিকে কিছু পরিবর্তিত কক্ষপথে সঞ্চালিত করে। প্রৌঢ় বয়সের কবি এক নূতন রূপ ও মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শেষ বয়সের ইতিহাস, যতটা তাঁহার নিজ কবিতায় নহে, তাহার চেয়ে বেশী, ক্র্যাব রবিনসনের দিন-লিপির মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'শ্যামলী'র অন্তর্ভুক্ত 'তেঁতুলের ফুল'। রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্প-কবিতা'র সংগ্রহ খুব বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। দেশী-বিলাতী, খ্যাত-অখ্যাত নানাবিধ ফুল তাঁহার কাব্য-মালিকায় স্থান পাইয়াছে। 'পূরবী' ও 'মহুয়ায়' এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতা আছে। এই পুষ্প-প্রীতি বিষয়ে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সংগে তুলনীয়। তিনিও ইংরেজ কবির ন্যায় অনেক উপেক্ষিত, ব্রীড়া-সংকুচিত কুসুম-সুন্দরীকে প্রথম লক্ষ্য করিয়া আবিষ্কারকের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তিনিও এক এক জাতীয় ফুলের মধ্যে একটা বিশেষ প্রকারের ভাব ব্যঞ্জনার সন্ধান করিয়াছেন এবং এই ভাব-মধ্যকোষের চারিদিকে তাহার বর্ণ-গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য বৈশিষ্ট্যের পাপড়িগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মোটের উপর পুষ্প-কবিতায় ইংরেজ কবির সহিত তুলনায় তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চিন্তা অনেকটা সংকীর্ণ নীতিকথার খাতেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রসার অধিকতর ব্যাপক ও তাঁহার ভাব-ধারা আরও প্রচুরতর স্রোতে উচ্ছ্বসিত। 'তেঁতুলের ফুলে' তেঁতুল গাছের রুক্ষ, বিপুলায়তন দেহে পেলব-সুকুমার পুষ্প-সুষমার অতর্কিত আবির্ভাবে কবির মন বিস্ময়ানন্দের চমক অনুভব করিয়াছে। বিশেষতঃ যে তেঁতুল গাছটি কবির শৈশবের স্বপ্ন-কল্পনা ও তাঁহার পারিবারিক জীবন-ধারার সদা-চঞ্চল পরিবর্তন-স্রোতের মধ্যে চিরস্থায়িত্বের প্রতীকের মতই অটল মহিমায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার অংগে যৌবন-চাঞ্চল্যের অপ্রত্যাশিত বিকাশ তাঁহার বিস্ময়কে গাঢ়তর করিয়াছে। পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনের মন্থর, বিলম্বিত উপভোগ গদ্য-কবিতার পল্লবিত বিস্তারের মধ্যে সুন্দর উপযোগিতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(৮)

১৩৪৬ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ নিজ গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম রসবোধের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার যুক্তি-তর্কের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধে আগেই বিচার করা হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি দুইটি নূতন যুক্তি ও কয়েকটি উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন। (১) গদ্য-কাব্যে 'কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতি আপনা-আপনি উদ্ভব হয়··· গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি-মাধুর্য, অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না।' (২) কবি অনুভব করেন যে তাঁহার গদ্য- কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। অনলংকৃত গদ্য-রীতির মধ্যে যে উচ্চতম কাব্যোৎকর্ষে পৌছান যায়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের গল্প, বাইবেলের অনুবাদ, যজুর্বেদের উদাত্ত গদ্য-মন্ত্র ও গীতাঞ্জলির ইংরেজী গদ্য-অনুবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে 'কোমলে কঠিনে' মিলিয়া যে এক নূতন, সংযত রীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া সিদ্ধি পর্যন্ত পৌছায় নাই। যদি বিশুদ্ধ কাব্যোচিত সুকুমার সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশ করা যায়, তবে প্রকাশ-ভংগীর অভিনবত্ব আপেক্ষিক অপকর্ষেরই হেতু হয়। কাব্য-মনোভাবের সহিত গদ্য-মনোভাবের যদি যথার্থ সংমিশ্রণ হইয়া থাকে, তবেই গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত প্রকাশ-রীতির উপযোগিতা বিচার্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই গদ্য-মনোভাব কোন উপাদানে গঠিত, তাহা তাঁহার গদ্য-কবিতা হইতে বুঝা যায় না। সাধারণতঃ রসিকতা (humour or wit), তীক্ষ্ণ বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ ও আলোচনা এবং বাস্তব-রসের অতি-প্রাচুর্য কবিদের পক্ষে গদ্য-মনোভাবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হয়। ইংরেজী কবিদের মধ্যে চসার, ডন ও ব্রাউনিংর এই গদ্য-প্রধান মনোভাব ছিল বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইঁহারা কেহই কবিতার ছন্দোময়ী মূর্তিকে উপেক্ষা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে তীক্ষ্ণ মনন-শক্তির ও দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই মনন-শক্তি ও দর্শনপ্রবণতা প্রচুরভাবে কাব্যরসে অভিষিক্ত। এই কবিতাগুলির মধ্যে রসিকতা ও বাস্তব-রসের একান্ত অভাব। কাজেই ইহাদের মধ্যে গদ্য-পদ্যের একটা সার্থক সমন্বয় না হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা কাব্য-ক্ষেত্রে গদ্যের অনধিকার-প্রবেশের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই যৌথ কারবারে গদ্য আইনসংগত অংশীদারের মর্যাদা পায় নাই—ইহাদের সম্বন্ধ অনেকটা দুধ ও জলের সম্বন্ধের ন্যায়; মিশ্রণে পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু আস্বাদের মিষ্টত্ব কমিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তিও আমাদের সন্দেহ-নিরসনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কবি যখন বলেন যে গদ্য-কবিতায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অন্য কোনও রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার সমস্ত অতীত রচনা এক বাক্যে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করে। এবিষয়ে তাঁহার শক্তিও অনুমান-সাপেক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ, অখণ্ডনীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত বিষয়, চিন্তা ও অনুভূতি তিনি এই গদ্য-কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই আরও অপরূপ-সৌন্দর্য-মণ্ডিত হইয়া তাঁহার পূর্বতন ও পরবর্তী কবিতায় ছন্দোময় বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটি গদ্য-কবিতা ছাড়া (ইহাদের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) আর কোথাও প্রকাশ-ভংগীর অনন্যসাধারণতা (uniqueness) সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি না। যদি ডান ও বাঁ হাতে লিখিতে প্রায় তুল্যরূপে দক্ষ কোন ব্যক্তি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন যে তাঁহার বাঁ হাতের লেখাটি তিনি আর কোন উপায়ে লিখিতে পারিতেন না, তবে তাঁহার উক্তি আক্ষরিকভাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার পিছনে বাস্তবের সহিত একটা প্রকাণ্ড অনৈক্য বর্তমান। গদ্য-কবিতাগুলির সমস্ত অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ ও কবির দৃঢ়পক্ষ-সমর্থন সত্ত্বেও ইহারা যে বাম হস্তের রচনা, আমাদের এই ধারণা বিচলিত হয় না।

কবির উদ্ধৃত উদাহরণগুলিও বর্তমান আলোচনায় ঠিক প্রযোজ্য নহে। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই গদ্যের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ (rhythm) রক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহে বিষয় গাম্ভীর্যের সহিত ধ্বনি-তরংগ-মিশ্রিত হইয়া কাব্যছন্দের অনুরূপ আবেদনের সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতে গদ্য-পদ্যের ব্যবধান বিশেষ মূলগত নহে – কাজেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোন উপাখ্যান বা মন্ত্র নিজ অন্তর্নিহিত বিষয়-গৌরবে ও ভাবানুষংগে কাব্যছন্দে বাঁধা না পড়িয়াও কাব্যাতীত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। বাইবেলের সমগ্র ধর্মানুশাসনও বিষয়ের বিরাট ব্যাপকতাকে গাঁথিয়া তুলিতে পারে, কবিতার অশেষ ছন্দো-বৈচিত্র্যের মধ্যেও এতটা বিষয়োপযোগী নমনীয়তা (adaptability) নাই—কাজেই ইহার গদ্যরূপ অনিবার্য। কিন্তু ইহার তুচ্ছতম আখ্যায়িকার মধ্যেও গম্ভীর মৃদংগনাদের মত একটা সংগীত-ধারা প্রবাহিত—ইহার rhythm এক মুহূর্তের জন্যও অস্বীকার করা যায় না। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের মধ্যেও এই গতিচ্ছন্দ বর্তমান; বিশেষতঃ গীতি-কবিতার অবয়ব-সংক্ষেপ ইহাদের রসের গাঢ়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছন্দ-কবিতার

প্রাণ—ইহার নিগূঢ় বক্ষোস্পন্দন। ইহাকে ভাংগিয়া চুরিয়া ইহার গতিচ্ছন্দের মধ্যে তরংগায়িত বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে; ইহার উচ্চধ্বনিকে যথাসম্ভব মৃদু করিয়া ইহাকে ক্ষীণতম, কষ্টে শ্রুতিগোচর স্পন্দনে পরিণত করা যাইতে পারে; প্রবল ভাবাবেগে মুহূর্তের জন্য বিলুপ্তও করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন না কোন রূপে কাব্যে ইহার উপস্থিতি অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিও যে ছন্দো-বর্জনের এই পরীক্ষায় অতি বিরল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহাই ইহার ব্যাপক অনুসরণ-বিষয়ে অনুপযোগিতার চূড়ান্ত প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা

১

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্যায়ের রচনাগুলি—'প্রান্তিক' (জানুয়ারি, ১৯৩৮), 'আকাশ-প্রদীপ' (এপ্রিল, ১৯৩৯), 'নব-জাতক' (এপ্রিল, ১৯৪০), 'সানাই' (জুন, ১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (জানুয়ারি, ১৯৪১), 'আরোগ্য' (মার্চ্চ, ১৯৪১), জন্মদিনে (এপ্রিল, ১৯৪১) ও 'শেষলেখা' (আগষ্ট, ১৯৪১)—এই কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রকাশিত কবিতা-সমূহ ঠিক কালানুক্রমিক পর্যায়ে বিন্যস্ত হয় নাই—অনেক পুরাতন রচনা পরবর্তীকালে মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ কবির জীবনের শেষ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য় —রচনার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই ; সমস্ত রচনায় প্রায় একই ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থগুলি সমগ্রভাবে আলোচনা করিলে উহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সূচনা ও পূর্বারব্ধ স্থরের পরিণতি অনুভূত হয়। 'পূরবী'তে কবির কাব্যে যে আসন্ন বিদায়ের ম্লান গোধুলিচ্ছটা সংক্রামিত হইয়াছে, মহাপ্রস্থানের যে ভূমিকা রচিত হইয়াছে, তাহাই পরবর্তী রচনাসমূহের মূল স্থর নির্দেশ করে। আর গন্থ-কবিতায় তিনি যে নূতন পরীক্ষা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, আবেগের স্থর না চড়াইয়া, ছন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ও ঝংকারের সাহায্য না লইয়া, গভীর হৃদয়ানুভূতির সহজ, নিরাভরণ অভিব্যক্তি দ্বারা তিনি যে চিরাচরিত কাব্যরীতির আমূল সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তাঁহার সমস্ত পরবর্তী-রচনায় অল্পাধিক পরিমাণে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বলাকা'তে সর্বপ্রথম তিনি ক্রমপ্রসারশীল ভাবোচ্ছ্বাসের অনুবর্তনের নিগূঢ় প্রয়োজনে, নিয়মিত ছন্দবিন্যাসের বন্ধন অস্বীকার করেন ; পরবর্তী কাব্যসমূহে এই অনিয়মিত, মাত্রামুক্ত ছন্দের সাহায্যে তিনি জীবনের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত নীচু স্থরের বিক্ষিপ্ত আবেগ ও ভাব-রোমন্থনের স্থষ্ঠু প্রকাশ-ভংগী সৃষ্টি করিয়াছেন। গন্থ-কবিতায় একেবারে ছন্দ বর্জন করিয়া কেবল ভাবের অন্তর্নিহিত আবেদনের উপর নির্ভরশীল হইয়া তিনি দুঃসাহসিকতার চরম পরীক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। শেষজীবনের কবিতাগুলিতে তিনি আবার

ছন্দবর্জনের আতিশয্য পরিহার করিয়া মধ্যপথ অনুসরণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘবর্ষব্যাপী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার পরিণত ফল তাঁহার শেষ রচনাগুলির আংগিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'নবজাতকের' দুই একটি কবিতাতে নূতন সুরের ইংগিত মিলে, কিন্তু এই অভিনবত্বের প্রত্যাশা পরবর্তী রচনায় পরিণতি লাভ করে নাই। এই সমস্ত কবিতার অন্তরলোকের প্রেরণা আসিয়াছে 'পূরবী'র পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনায় উন্মনা, বিদায়-ব্যথার অশ্রু-আভাসে করুণ, চরম প্রস্তুতির প্রশান্তিতে স্থির মনোভাব হইতে; ইহাদের বহিরংগ নির্ণীত হইয়াছে 'বলাকা' হইতে 'পুনশ্চ' ও 'শ্যামলী' পর্যন্ত প্রসারিত ছন্দো-পরীক্ষার ফল-বিচারের দ্বারা।

অশীতিবর্ষে সমাসন্ন কবির এই রচনাগুলি আরও একটি কারণে পাঠকের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করে। কবিরা চির-তারুণ্যের প্রতীক ও চির-সুন্দরের উপাসক হইলেও জরার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। বার্ধক্যের সংগে সংগে তাঁহাদের কল্পনার সরসতা শুষ্ক হয়, ও তাঁহারা সচরাচর মৌলিক বিকাশ ছাড়িয়া অতীত সুরেরই পুনরাবৃত্তি করেন। যে সমস্ত ইংরেজ কবি—যথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দীর্ঘজীবী ছিলেন তাঁহাদের শেষ বয়সের কবিতায় শুষ্ক, বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির প্রভাব লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁহার শেষ কবিতাগুলির মধ্যেও কল্পনার সাবলীল স্ফূর্তি, প্রতিভার বিস্ময়কর মৌলিকতা, স্বচ্ছ ও গভীর-সুর-প্রসারী দৃষ্টিভংগী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বার্ধক্যের পরিণত অভিজ্ঞতা-প্রসূত জীবনদর্শন অক্ষুণ্ণ, অম্লান সৌন্দর্যবোধের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগকে অপরূপ অর্থগভীরতা-মণ্ডিত করিয়াছে। কাজেই এই কবিতা-গুলি, তাহাদের সহজ কাব্যোৎকর্ষ ছাড়াও, দুঃসাধ্যসাধনের যে অতিরিক্ত মর্যাদা আছে, তাহা লাভ করিয়াছে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, দার্শনিক দিব্যদৃষ্টির আশ্চর্য স্বচ্ছতা ও প্রসার; দ্বিতীয়, কাব্য-সাধনার উপর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক রোগের অনুভূতির প্রভাব। এই দুইটি গুণই ইহাদের অনন্যসাধারণ আবেদনের হেতু। দার্শনিকতা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় নূতন আবির্ভাব নহে—তাঁহার মধ্যবয়স হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রচনাই ইহার রহস্যবোধে নিবিড়, ইহার সাংকেতিকতার কম্পমান আলোকে চঞ্চল। তিনি আমাদের এই জড়ধর্মী, অভ্যাসের

অনুবর্তনে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবদ্ধ, অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন জীবন-যাত্রার মধ্যে প্রাণশক্তির বিচিত্র, সদা-জাগ্রত লীলা, অসীমের বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় ক্ষণিক আভাস-ইংগিত ও মুহুর্মুহু স্পর্শ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অগণিত রন্ধ্রপথে ভাব-বিনিময় ও নিবিড় একাত্মতাবোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে দার্শনিক অনুভূতির যত সহজ ও সর্বসঞ্চারী প্রসার, পৃথিবীর অন্য কোনও কবির রচনায় তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। যে সমস্ত কবির কাব্যে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য, যাঁহারা কবিতার মধ্য দিয়া দার্শনিক সমস্যার বিচার ও আলোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার কবিতা হইতে হয়ত জীবনসম্বন্ধে একটা বিশেষ মতবাদ সংকলন করা যায়, কিন্তু ইহা তাঁহার কাব্যে গৌণ, মুখ্য নহে। তিনি কবিতার মধ্য দিয়া দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর আসল স্বরূপকে—ইহার বহিরাবরণ-ভেদকারী দিব্যানুভূতি, জীবনকে অপার্থিব জ্যোতিতে রঞ্জিত ও অপ্রত্যাশিত অর্থগূঢ়তায় মহিমান্বিত করার সহজ প্রবণতা, অসীমের প্রতি আকুতি, অপ্রাপণীয়ের অনুসরণের ব্যাকুলতাকে—সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি দিয়াছেন; মানবমনের ধারণাতীত রহস্যবোধকে রূপের জালে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিকতা তত্ত্ব-প্রতিপাদন নহে, নূতন সত্য ও অনুভূতির চমকপ্রদ আবিষ্কার। বস্তুতঃ দার্শনিক কবির আদর্শ অতিশয় দুরধিগম্য। চিন্তার মৌলিকতা, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যঞ্জনার সহিত কাব্য-সৌন্দর্য ও সার্থক রূপায়নের সমন্বয়-সাধন খুব কম কবিরই সাধ্যায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ যে এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে দার্শনিক-ভাবপ্রবণ কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে।

দার্শনিক অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থায়ী উপাদান হইলেও 'প্রান্তিক' হইতে যে পর্যায়ের আরম্ভ তাহার মধ্যে এই সুরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিন দার্শনিক মনোভাবের প্রধান উপজীব্য ছিল এক পলাতক, মুহুর্মুহু আবির্ভাব-বিলয়শীল সত্তার অনুসরণ; ইহার মধ্যে লুকোচুরি খেলার লীলা, ধাঁধালাগানো অনুভূতির বিদ্যুচ্চমক, পুলকিত বিস্ময় ও ক্ষণিক বিষাদের দোলা, পূর্ণ-উপলব্ধির পরিবর্তে আভাস-ইংগিতের আলো-ছায়ার কম্পন—এক কথায় কৌতূহলী তরুণ কবিচিত্তের উপর রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল-রচনা—ইহাদেরই প্রাধান্য ছিল। ইহাদের মধ্যে গভীর সত্যের যে ব্যঞ্জনা তাহা যেন ক্রীড়াচ্ছলে, লঘু চপল গতিভংগীতে, নৃত্যচ্ছন্দে কবির অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে।

জীবনের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ লইয়া কবি একদিন যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যের শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস শুভ্রতা যেন কল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত ও পরিবর্তনশীল ভাবের আন্দোলনে আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব-হিসাবে 'প্রান্তিকে' যে সত্য আলোচিত হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী কবিতার আলোচনার সহিত অভিন্ন। কিন্তু আলোচনার ভংগী সম্পূর্ণ পৃথক্। যে সত্যকে কবি এতদিন ক্রীড়াচ্ছলে আবাহন করিয়াছেন, লীলা-সংগিনীরূপে-কল্পনা করিয়া যাহার সংগে প্রীতি-স্নিগ্ধ, পরিহাস-মধুর সম্পর্ক রচনা করিয়াছেন, বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরাল হইতে যাহার হাতছানি তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া উন্মনা করিয়াছে, জীবনের সীমান্তরেখায় দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে তিনি নূতন মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। লঘু, তরল সুরের পরিবর্তে উদাত্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বিস্মিত কৌতূহলের পরিবর্তে স্থির, নিঃসংশয় উপলব্ধি, অনুযোগ-ক্ষোভ-গুঞ্জনের পরিবর্তে নিরাসক্ত, প্রসন্ন অভিনন্দন—পরিবর্তনের ধারা সূচিত করে। এ যেন শুভ্র, অখণ্ড তুষার-আবরণের নীচে তরংগ-চাঞ্চল্যের সমাধি; কম্পিত, বিচ্ছিন্ন আলোক-রশ্মিসমূহের অচঞ্চল কেন্দ্রসংহতি। 'প্রান্তিকের' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মৃত্যুর প্রতি এই মনোভাব খাঁটি ক্লাসিকাল রীতির প্রশান্ত, অনাবিল মহিমায় সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে রোমান্টিক মনের সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সহিত ক্লাসিকাল রচনার স্বচ্ছ, প্রসাদগুণ-সমৃদ্ধ প্রকাশভংগীর, অপরদিকে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সহিত কাব্যসৌন্দর্যের সম্পূর্ণ সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

'প্রান্তিকে' মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যে মতবাদ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, উপনিষদ ও গীতার সত্যদ্রষ্টাঋষিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি! মৃত্যু যে জীবনের খণ্ডিত পরিচয়কে সম্পূর্ণ করে, আত্মার আদিম বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধারের দ্বারা জীবন-প্রক্ষিপ্ত ক্লেদ-গ্লানি মুছিয়া লয়, বিশ্বজগৎ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত ইহার প্রচ্ছন্ন আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, রংগালয়ের অভিনেতার ছদ্মবেশ-ত্যাগের ন্যায় জীবনের নানাবর্ণরঞ্জিত আবরণীকে পরিহার করাইয়া ইহাকে একাকীত্বের নিঃসংগ মহিমার শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে—এই সমস্ত ভারতীয় দর্শনের চিরপরিচিত সত্যকে কবি নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছেন ও অপরূপ কবি-কল্পনার সাহায্যে ইহাদিগকে কাব্যসৌন্দর্যে অভিষিক্ত করিয়া অরূপকে রূপের ইন্দ্রজালে বন্দী

করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষির জয়গীতি, নব আবিষ্কারের উদাত্ত ঘোষণা সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রতিবেশে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নহে, ব্যাখ্যাতার বুদ্ধি-প্রধান আলোচনা নহে, উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, রক্তধারার গোপনপ্রবাহে সঞ্চারিত, অধ্যাত্ম-চেতনার নব উন্মেষ।

জীবনের বিচিত্র, অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সঞ্চয় হইতে বিদায়-গ্রহণের বেদনা কবি তাঁহার এই স্বতঃস্ফূর্ত, সংশয়লেশহীন বিশ্বাসের সাহায্যে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবকে কবি প্রশান্ত স্বীকৃতির সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন—পূর্ব কবিতার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, অপরিতৃপ্ত কৌতূহল, পরিচিতকে বিসর্জন দিয়া অপরিচিতের দিকে নিরুদ্দেশ-যাত্রার উৎকণ্ঠিত উত্তেজনা, বিশ্ববিধানের রুদ্ধদ্বারে আবেগ-কম্পিত করাঘাত, সাগর-সংগমের অতিসন্নিহিত নদীস্রোতের ন্যায়, তাহাদের সমস্ত কলকাকলী শান্ত নীরবতার মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছে। কবি নিরাসক্ত উদাসীনতার সহিত তাঁহার অন্তিম-চেতনালগ্ন ব্যক্তিজীবনের ক্রমবিলীয়মান সত্তার ছবি আঁকিয়াছেন। জীবনের অযাচিত দান, অজস্র ঐশ্বর্যের প্রতি প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; নিজ অস্তিত্বের অকুণ্ঠিত জয়ঘোষণা করিয়াছেন; খ্যাতি-লোলুপতা, পরমতের মানদণ্ডে নিজের মূল্য যাচাই করিবার দীনতা নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছেন; জীবনের রন্ধ্রপথে যে অসীমের স্পর্শ রহিয়া রহিয়া তাঁহার সত্যপরিচয়ের ইংগিত বহন করিয়াছিল, সেইগুলিকে ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথিয়াও জয়মাল্য রচনা করিয়া কণ্ঠে পরিয়াছেন ও জন্মমুহূর্তের আধ্যাত্মিক আভিজাত্য যেন তাঁহার মৃত্যুকালে অক্ষুণ্ণ থাকে এই প্রার্থনা জানাইয়া তিনি চিরবিদায়েব জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কবির ভাষা এই মহিমাময় অনুভূতি ও চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন; এই চেতনাপ্রান্তবাহী, ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ, দুর্গম পথে চলিতে ভাষার অসহযোগিতার জন্য একবারও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই। ত্রিংশবর্ষবয়স্ক ইংরেজ কবি শেলি তাঁহার কাব্যসমাপ্তির তোরণ-দেশে "জীবন কি?" এই অমীমাংসিত প্রশ্ন ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। অশীতিবর্ষ-দেশীয় প্রাচ্য কবির শেষ রচনায় এই দুঃসমাধেয় প্রশ্নের যে উত্তর মিলিয়াছে তাহার অপেক্ষা সন্তোষজনক মীমাংসা কোন মানব কবির লেখায় মিলিবার আশা করা যায় না।

(২)

দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত গ্রন্থগুলির—'আকাশ-প্রদীপ', 'নব-জাতক' ও 'সানাই' এর—মধ্যে 'প্রান্তিকে'র এই সুর-গাম্ভীর্য শোনা যায় না। কবির কল্পনার সহজ মহিমা ও লঘু, পরিহাস-তরল সুরটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন আরম্ভের সূচনা কিছু কিছু অনুভূত হয়, কিন্তু এই সূচনা পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এই অভিনব সুরের লক্ষণের মধ্যে (১) প্রাত্যহিক জীবনের বিচ্ছিন্ন-বস্তু-বহুল ভূমিকার মধ্যে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা ও অসীমের অনুভূতির সহজ প্রাতষ্ঠা, (২) আগামী যুগের জীবন ও কাব্যচ্ছন্দের পূর্বাভাস ও আধুনিক যুগের প্রয়োজনমূলক যান্ত্রিকতার কাব্যাভিষেক এবং (৩) অলস, শিথিল, কাব্যসাধনার নিবিড় ঐকান্তিকতার আদর্শ হইতে স্খলিত, কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহার ও পলাতক, ক্ষণস্থায়ী ভাবানুভূতি-সমূহের (moods) সার্থক রূপায়ন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য (১) ও (৩) শ্রেণীর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক নূতন আবির্ভাব বলা যায় না; তবে ইহাদের পৌনঃপুনিকতা ও এই সুর-আবাহনে কবির সিদ্ধহস্ততা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয় সুরটি 'নবজাতক', 'পক্ষীমানব', ও 'সাড়ে নটা'—এই তিনটি কবিতায় বিস্ময়কর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'নবজাতকে' আগামী যুগের মানবের মধ্যে যে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রত্যুদ্গমন ধ্বনিত হইয়াছে। 'পক্ষীমানবে' যে আকাশবিমান বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের মধ্যে বীভৎস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবি তাহাকে শাশ্বত সৌন্দর্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন—আকাশের অসীম শান্তি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্নিগ্ধ দীপ্তির সহিত তাহার আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আধুনিক ইংরেজ কবিদের রচনা ও দৃষ্টিভংগী হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! Spenderএর 'On an Aerodrome' কবিতাটি সচেষ্ট পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-সমষ্টির সন্নিবেশ মাত্র—শেষের দিকে সামান্য একটু ভাবোচ্ছ্বাস, একটু মৃদু প্রতিবাদ-প্রয়াস বস্তুপুঞ্জের দ্বারা অভিভূত হইয়া ব্যর্থপ্রায় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আলোচনাটিকে যে উচ্চ কবি-কল্পনা ও উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন, ইংরেজ কবির পদাতিক, তথ্যভারাবনত কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। 'সাড়ে নটা'য় কবি বেতারের বিদ্যুৎবাহিনী সংগীতধারাকে বাস্তব

তুচ্ছতার সংস্পর্শহীনা, আদর্শ-লোকবাসিনী অভিসারিকার ও মেঘদূতের যক্ষের বিরহগাথার সহিত তুলনা করিয়া প্রয়োজনমূলক আবিষ্কারকে সৌন্দর্যলোকে উঠাইয়াছেন, কাজের জিনিসকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন। আধুনিক বস্তুতন্ত্রতা কেমন করিয়া কবি-কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত হইতে পারে, কেমন করিয়া ইহা প্রয়োজনের যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বাঁধা পথ ছাড়িয়া সৌন্দর্যের লীলা-বিসর্পিত শোভাযাত্রায় স্থান গ্রহণ করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি তাহার চমৎকার প্রমাণ। আধুনিক ইংরেজ কবির মধ্যে কেহ কেহ—যেমন Louis Macniece ও Spender—ট্রেণের গতি সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহারা বস্তুলোক ছাড়াইয়া রূপের সংকেত-লোকে পৌঁছায় নাই। সার্ধ শতাব্দী পূর্বে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিজ্ঞানের সংগে কাব্যের আত্মীয়তা-স্থাপনের সম্ভাবনার প্রতি ইংগিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় যে এই সম্ভাবনা সার্থক হইয়াছে তাহা দাবী করা যায়।

প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি সুন্দর কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'আকাশ-প্রদীপে'—ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'নামকরণ' 'তর্ক'; 'নবজাতকে'—'এপারে-ওপারে', 'রাত্রি', 'অস্পষ্ট'; 'সানাই'এ—'সানাই'—এই সমস্ত কবিতা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে অবচেতন মনের অতি সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অনুভূতি, মোহাবেশের ক্ষণস্থায়ী, রঙীণ বুদ্‌বুদগুলি কল্পনার মায়াতন্তুনির্মিত জালে ধরা পড়িয়া শব্দ-ধ্বনিময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ('অস্পষ্ট, 'রাত্রি'—'নবজাতক')। কতকগুলিতে পূর্ব-স্মৃতি-রোমন্থনের শিথিল অবকাশপথে সঞ্চরণশীল, আপাত-দৃষ্টিতে অসংবদ্ধ টুকরা টুকরা খণ্ড-সৌন্দর্যের সমাবেশ এক গভীর, সার্বভৌম সত্যের ব্যঞ্জনায় অর্থগৌরব ও রূপসংহতি লাভ করিয়াছে—'আকাশ-প্রদীপের' 'ধ্বনি', 'বধু', 'জল', তর্ক' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 'নামকরণ' কবিতাটিতে একটা অকারণ খেয়ালের মাধ্যমে যে গভীর, সর্বব্যাপী সৌন্দর্যবোধ, নারীর রূপ-মহিমার যে অতলস্পর্শ, নিখিলপ্রসারী রহস্যগূঢ়তা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিরল। 'এপারে-ওপারে' ('নবজাতক') ও 'সানাই' ('সানাই') কবিতায় বাস্তব জীবনের বিশৃংখল, সৌন্দর্য-সুষমাহীন, পুঞ্জীভূত বস্তুস্তূপের চাপে ক্ষুব্ধ প্রতিবেশে অকস্মাৎ এক নিবিড় অনুভূতি বা অসীমের ব্যঞ্জনা, কালোর নিকষে সোনার আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়াছে—বিপরীত পটভূমিকায় ইহাদের আবেদন মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রথমোক্ত কবিতায় বাঙালীর সংসার-যাত্রার স্থূল কর্মপ্রচেষ্টা, ইতর আমোদ-প্রমোদ ও জীবনের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল গতিচ্ছন্দের ভিতর দিয়া যে সরল, সহজ প্রাণপ্রবাহ হিল্লোলিত হইয়া উঠে, কবি তাহার সহিত নিজের আত্ম-কেন্দ্রিক, প্রাণের গতিশীলতা হইতে বুদ্ধিবাদের উচ্চ শুষ্ক ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত জীবনের তুলনা করিয়া সামান্যের স্পর্শের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন—কবির এই মৃদু আকুতির স্পর্শে শ্রীহীনতাও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সানাই'এ বিবাহ-বাড়ীতে অশোভন লোলুপতা, ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা, নানাবিধ উপকরণ-বাহুল্য ও প্রতিবেশের কুশ্রীতার মধ্যে সানাইএর সুর অমর্ত্যলোকের এমন একটি ইংগিত ও ব্যঞ্জনা বহন করে, যাহার প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত অসংগতি, সমস্ত রূঢ় ছন্দোহীনতা এক অলক্ষ্য, অন্তর্গূঢ় সুষমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি কবিতার প্রথম দিকের অসংলগ্ন, অপরিমিত বস্তু-সমাবেশ পরিণতির মানদণ্ডে সার্থক কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছে—কবি কুৎসিতকে সৌন্দর্য-সৃষ্টির সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া কুৎসিতের কাব্য-প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আগুন জ্বালানোতেই কাষ্ঠস্তূপের সার্থক অস্তিত্বের সমর্থন। অবশ্য এই রকমের কবিতায় সর্বত্র যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা বলা যায় না। অনেক স্থলে ইন্ধনের অবিন্যস্ত প্রাচুর্যের জন্যই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয় নাই। কবি-কল্পনা আগুন জ্বালাইবার জন্য যে ফুৎকার দিয়াছে তাহা যথেষ্ট শক্তিশালী নহে; সময় সময় মনে হয় যে কবির এ বিষয়ে ইচ্ছারই অভাব। 'সানাই'এর 'বাসাবদল' কবিতাটির উদ্দেশ্য বোধহয় নিছক তথ্যবিবৃতি। ইহার পিছনে কোন কাব্য-সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস বা গভীর অনুভূতি-স্ফুরণ দেখা যায় না। "দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের ব্যাঙেজের মত"—এই উপমার মধ্যে যে ছবির আভাস তাহা Eliot এর 'Like a patient etherised upon a table'র সহিত সাদৃশ্য মনে পড়াইয়া দেয়; Eliotএর সমস্ত কবিতাটিতে ধূসর ক্লান্তির ও অর্থহীন, যান্ত্রিক জীবনযাত্রার শূন্যতা এক তীব্রভাবে পরিকল্পিত আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেকটি রেখা, প্রত্যেকটি উপমা ভাবসংহতির প্রয়োজনে সার্থক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খোঁড়া দিন কোন বিকৃত প্রতিবেশের অংগীভূত হয় নাই—ইহা কেবল খঞ্জ কল্পনার বাহন মাত্র। আর মনে হয় যে এই খঞ্জত্বের অভিনয় কবির সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত—তাঁহার

কল্পনার উচ্চৈশ্রবা কেবল খেয়ালের বশে পংগু সাজিয়াছে। "অনসূয়া" কবিতাটিতে প্রথম দিকের ক্লেদ ও আবর্জনার স্তূপীকরণের সহিত শেষ দিকের প্রেমের কল্পলোক-রচনার কোন সার্থক যোগ অনুভব করা যায় না—কবি যেন কেবল ডানার জোর দেখাইবার জন্য পচা নর্দামা হইতে অতীত যুগের স্মৃতি-সুরভিত ভাব-রাজ্যের স্বচ্ছনীল আকাশে উড্ডীন হইয়াছেন। এই কবিতাগুলিকে প্রতিভার দুঃসাহসিক পরীক্ষা বা অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অসাফল্যের নিদর্শনরূপে ধরা যাইতে পারে। 'আকাশ-প্রদীপে' 'ময়ূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম' গদ্যচ্ছন্দ বা ছন্দোহীনতায় প্রত্যাবর্তন। এই দুইটি কবিতাতে কবিত্বের প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যকণা ছন্দসংগীতের চাপে নিবিড়তা লাভ করে নাই। ইহাদের মধ্যে নীহারিকাপুঞ্জের অস্থির ঝলক তারকার সংহত রশ্মি, সম্পূর্ণমণ্ডল দীপ্তিতে পরিণত হয় নাই।

(৩)

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাই সংখ্যায় বেশী। 'আকাশ-প্রদীপে' 'শ্যামা', 'জানা-অজানা', 'পাখির ভোজ', 'যাত্রা, 'সময়-হারা', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ও 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা', 'পরিচয়', 'অপঘাত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাগুলিতে কল্পনার একটা চেষ্টাবিহীন শিথিলতা, অলস স্বচ্ছন্দ-বিহার, পরিমিতিহীন, যদৃচ্ছাগত ছন্দের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া সহজ-বিসর্পিত, এলায়িত ভংগীতে আপনাকে ছড়াইয়া দিবার প্রবণতা লক্ষ্য-গোচর হয়। কল্পনার অশ্ব যেন উচ্চতর, সার্থকতর রশ্মি-নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া আপনার খুসী মত কাব্যের রথকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বেচ্ছাবিহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ অনুশীলন ও সাধনার প্রভাবে তাঁহার মনের সহজ গতি সৌন্দর্য-সৃষ্টিরই অভিমুখী। তবে সৌন্দর্যের মানদণ্ড সব সময় সমান উন্নত হয় নাই। এই সমস্ত কবিতায় কবি সৌন্দর্যের শেষ বিন্দু নিংড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন নাই—তাহার পরিপূর্ণ পাত্র হইতে যেটুকু উপচাইয়া পড়িয়াছে, তাহার সুপক্ক পরিণতি হইতে যাহা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়াছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গদ্যের সুকঠিন বন্ধন-রেখায়, লঘু, চটুল প্রারম্ভের বিপরীতমুখী

ইংগিতে, বাস্তব প্রতিবেশের বাঁধ তুলিয়া তিনি কাব্য-সৌন্দর্যের পূর্ণ প্লাবনকে প্রতিরোধ করিয়াছেন। 'জানা-অজানায়' ঘরের পুরাতন আসবাব-পত্র ও বস্তু-সঞ্চয়ের পুংখানুপুংখ বর্ণনার ভিতর দিয়া অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মূল্য-নির্ধারণের তারতম্য, তাহাদের দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য বিশদীকৃত হইয়াছে—খড়ের গাদার মধ্যে একটু অগ্নিস্ফুলিংগের ইংগিত ঝলসিয়া উঠিয়াছে। 'যাত্রা' কবিতাতে ষ্টীমারের জীবন-ব্যবস্থার চটুল চাঞ্চল্য, ও তাহার ক্যাবিনের ধাঁধা-লাগানো অভিন্নত্ব ও অসংখ্যতার উপর অকস্মাৎ একটা স্বপ্ন-বিভ্রমের যবনিকা টানা হইয়াছে—প্রাণধারার বুদ্বুদরাশি, কৃত্রিম জীবনযাত্রার বিপুল আয়োজন ও যন্ত্র-স্পন্দন এক মুহূর্তে ভোজবাজীর ন্যায় বিলীন হইয়াছে। 'সময়-হারা'য় বর্তমান কর্তৃক উপেক্ষিত, ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট শিল্পী-জীবনের চরম প্রেতচ্ছায়াগ্রস্ত অবসাদ এক পোড়ো বাড়ী ও উৎসন্ন সংসারযাত্রার অতিপল্লবিত রূপকে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—শেষে এই জীর্ণ, আবর্জনাস্তূপে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস প্রতিবেশে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির চিরন্তন মূল্য সম্বন্ধে মহাকালের আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। ধ্বংসোন্মুখতার চিত্রে কল্পনার অবাধ, অপরিমিত বিস্তার, অসম্পৃক্ত বস্তুপুঞ্জের যদৃচ্ছ সমাবেশ ইহার অনিয়ন্ত্রিত শৈথিল্যের পরিচয়।

'ঢাকীরা ঢাক বাজায়' কবিতায় কবি একটি পুরাতন ছড়ার সুর অবলম্বন করিয়া ইহার কাল-বিধ্বস্ত, অন্তর্নিহিত করুণ আবেদনটি নূতন করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও বর্তমানের একটি অনুরূপ দুর্ঘটনাকে অতীতের এই অদেহী, গৃহহারা সুরের সহিত গাঁথিতে চাহিয়াছেন। 'বধূ' কবিতায় ঠাকুরমার ছড়া যেরূপভাবে কবির অনুভূতিকে উদ্দীপিত করিয়াছে, এখানে সেরূপ উদ্দীপনার অভাব। এখানে স্তিমিত সুরটিকে আশ্রয় করিয়া কবি অলস কল্পনার জাল বুনিয়াছেন, আধুনিক যুগে কলু-গিন্নীর তরুণী নাৎনীর অপহরণ পুরাতন গানের দিগন্তবিস্তৃত করুণ মায়ার ভাব-মণ্ডলের মধ্যে ধরা দেয় না। 'পাখির ভোজে' নিম্ন-সঞ্চারী কল্পনা পাখীর হর্ষ-হিল্লোলিত দেহভংগী, সহজ আত্মীয়তা ও অকস্মাৎ উদ্বেলিত, ক্ষণস্থায়ী হিংসার মধ্যে আদিম প্রাণের লীলা ও তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রমের পর পুনরায় স্বাভাবিক ছন্দের অনুবর্তনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বর্ণনা ও তাহার মধ্যে

উদ্ঘাটিত সত্য—এই উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'অসময়' আর একটি চমৎকার পাখী-কবিতা। 'সানাই' এ 'স্মৃতির ভূমিকা'তে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের একটি সুন্দর রেখাচিত্র অংকিত হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির ফ্রেমে অন্তর-জগতের আর কোন গূঢ়তর ছবি সন্নিবিষ্ট হয় নাই—স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভূমিকা কোন গল্প ফাঁদে নাই। 'অপঘাতে' একখানি অপরাহ্নের শান্তির আভাসস্নিগ্ধ, গ্রাম্য ছবির উপর আসিয়া পড়িয়াছে বৈপরীত্যের তীব্র পরিহাস, আকস্মিক দুর্দৈবের বিপর্যয়—তবে সে বোমা ফিন্‌ল্যাণ্ডে পড়ায় বাংলার জনপদ-জীবনের উপর তাহার অভিঘাত অনেকটা মৃদু চমকের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। 'পরিচয়ে' এক তরুণী, যাহার রোমান্টিক ভাবমুগ্ধতা সাংসারিকতার প্রখর উত্তাপে তখনও উবিয়া যায় নাই, দীর্ঘ-বিলম্বিত ছন্দে, অতি-বিস্তৃত বর্ণনা-বাহুল্যের সহিত অপরিচিত কবির প্রতি তাহার প্রেম-নিবেদন, পরিচয়ে মোহভংগ, অপরার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের গ্লানি ও সমস্ত বিকৃতি ও বেদনার মধ্য দিয়া প্রেমাস্পদের সত্য পরিচয়-লাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে—এই বর্ণনায় ঘাত-প্রতিঘাতের স্তরগুলি বা চরম পরিণতির বিবর্তন কোনটাই খুব স্পষ্ট ফোটে নাই।

ইহা ছাড়া 'সানাই'এ কতকগুলি গীতধর্মী ক্ষুদ্র কবিতা আছে—যথা 'নতুন রঙ', 'বিদায়', 'যাবার আগে', 'পূর্ণা', 'ছায়াছবি', 'দেওয়া-নেওয়া', 'আধো-জাগা', 'গানের জাল', 'মরিয়া' ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে মুহূর্তের পলাতক ভাব, কল্পনার ক্ষণিক খেয়াল, মনের রঙীণ বা উদাস মূর্ছনা গানের সুরে ও লঘু ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকায়' গভীরতর সুরের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ধরণের গীতি-কবিতার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। অনিয়মিত ছন্দের অতি-প্রসার ঠিক ছোট গানের স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনবদ্য ভাব-সংহতির অনুকূল নহে। যে হাত গভীর ঝংকারের উদ্বোধনে ব্রতী তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর মীড়-মূর্ছনা তুলিবার নিপুণতা হারায়। সুদূর-প্রসারী দার্শনিক চিন্তা খেয়ালী প্রেমের অর্ধস্ফুট কল-কাকলী ও ভাবের ক্ষণিকতাকে অভিভূত করে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন যাদুমন্ত্রের উপর যে অধিকার হারান নাই, এই সমস্ত ছোট কবিতার অনেকগুলিতে তাহার প্রমাণ মিলে। কোন কোন কবিতায় তুলিকার লঘু স্পর্শে, ব্যঞ্জনার সুনিপুণ

ইংগিতে, ছন্দের শিথিল মঞ্জীর-ধ্বনিতে এক-একটি পলাতক ভাব সার্থক রূপ লইয়াছে। কোন কোনটিতে বা চিন্তার ভার একটু বেশী গুরু বা সচেতন শিল্পপ্রয়াস একটু বেশী মাত্রায় প্রকট হইয়া গানের মাধুর্যের হানি করিয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবন পর্যন্ত গান গাহিবার কণ্ঠ ও মনোভাব হারান নাই। তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন অন্তিম জীবনেও হালকা গানের সুর রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ছন্দের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কবি মোটের উপর সর্বত্র সন্তোষজনক ফল পান নাই। কয়েকটি কবিতায় উদাস, শিথিল, অবাধ-প্রসারিত 'কল্পনা নিজ অন্তর্নিহিত পরিমিতি-বোধের সাহায্যে একটা সুনির্দিষ্টরূপে সংহত হইয়াছে—স্বেচ্ছাসঞ্চারী বাষ্পরাশি আঁকিয়া বাঁকিয়া এক সম্পূর্ণ ভাবমণ্ডল গঠন করিয়াছে। তথাপি মনে হয় অনেক স্থলে কবি এই ছন্দের প্রভাবে অতিপল্লবিত বিস্তার ও মুখর অতিভাষণের দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ 'সানাই'এর অনেকগুলি কবিতায় এই প্রবণতার উদাহরণ মিলে। যে স্মরণীয়, অর্থঘন সংক্ষিপ্তি শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ, যাহাতে একটি শব্দেরও পরিবর্তন বা স্থানান্তর-করণ সম্ভব নহে, যাহার সম্বন্ধে Coleridge বলিয়াছেন—"Poetry is the arrangement of the best words in the best order," যাহার অর্দ্ধব্যক্ত আবেদন পুষ্পসৌরভবিভোর ভ্রমরের ন্যায় মনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি তোলে—কাব্যের সেই উচ্চতম আদর্শ এই শ্রেণীর কবিতায় সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

৪

এইবার কবি-জীবনের শেষ বৎসরের রচনাগুলি—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা'র আলোচনা করিব। এই রচনাসমূহ একটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কবি কাব্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—গুরুতর পীড়ার আক্রমণ ও রোগমুক্তির কাব্য-কাহিনী—অভিব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন কবির রচনায় আমরা ঠিক এই বিষয়টি পাই না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ত সাময়িক অনিদ্রার প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক

স্থির প্রশান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কোলরিজের কবিতা আগাগোড়া অসুস্থ মনোবিকার ও আফিংএর নেশায় অর্ধ-অসাড় ও অবাস্তব রংএ রঞ্জিত কল্পনার চিহ্নাংকিত। শেলির অতি-উত্তেজিত কল্পনা ও অবাস্তব-প্রবণতা অনেকাংশে মানসিক অসুস্থতা হইতে উদ্ভূত। ব্রাউনিং অর্ধ উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ নর-নারীর চিন্তাধারার অসংলগ্নতা ও আচরণ-বিকৃতি নাটকীয় পদ্ধতিতে ফুটাইয়াছেন। ব্রাউনিং-জায়া মরণের বিলম্বিত আবির্ভাবের প্রতীক্ষাচ্ছায়া-তলে তাঁহার অপরূপ হৃদয়-মাধুর্যকে প্রেম-গাথার রন্ধ্র পথে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না—মানসিক অবসাদ, জীবনচ্ছন্দের অনিয়মিত গতিবেগ, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানস সংস্থিতির অসাধারণত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্য়ায়ের কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-মনের বিক্ষোভ, উত্তপ্ত, জ্বরাতুর স্পর্শ, বিকারের আবিল দৃষ্টি যেমন ভয়াবহভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার অন্য কোথাও তুলনা মিলে না। অবশ্য কবির শিল্পোৎকর্ষ এই রোগগ্রস্ত অবস্থার উপর জয়ী হইয়া ইহার বিকারের খণ্ডদৃশ্যগুলিকে অনবদ্য কাব্যরূপ দিয়াছে, কিন্তু সমস্ত সচেতন শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়া রোগ-যন্ত্রণার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাধি-জর্জর কল্পনার ক্ষীণতা ও বিকারগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এই অভিভূত অবস্থায় কবির দার্শনিকতা,—জীবনের সত্যরূপে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস, চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপরাজিত মানবাত্মার জয়গান, মৃত্যুর স্বরূপের প্রশান্ত উপলব্ধি—অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ গৌরবের পরিচয় দিয়াছে; একদিকে ব্যাধির অভিভব ও পীড়নের স্বীকার, অন্যদিকে ইহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার বিজয়-ঘোষণা—এই দুই সুরের সম্মিলন এই কবিতাগুলিকে এক অতুলনীয় গাম্ভীর্য ও মহিমা দিয়াছে। 'আরোগ্যের' কবিতাগুলিতে জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সহজ রূপটি সদ্যরোগমুক্ত কবির চক্ষুতে আবার প্রথম অনুভবের বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া অপরূপ, নবীন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতির এই উত্তেজিত বিস্ময়, সৌন্দর্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের এই সতেজ, নবীন উন্মেষ ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এক হর্ষোদ্বেলতার শিহরণ রাখিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলির ক্ষুদ্র আয়তন, উহাদের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা, রোগাভিভব-মুক্ত কল্পনার সীমাবদ্ধ সক্রিয়তার, ইহার পক্ষবিস্তারের

সংকুচিত পরিধির বহিঃনিদর্শন। পূর্ববর্তী পর্যায়ের অতিভাষণ-প্রবণতা এখানে সমস্ত বাহুল্য পরিহার করিয়া একটি অপরূপ কৃশতা ও স্বচ্ছদীপ্তি অর্জন করিয়াছে; এক একটি কবিতাতে যেন মন্ত্রের স্বল্পাক্ষরত্ব ও নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তি নিহিত হইয়াছে। মহাযাত্রার পূর্বে কবি যে শেষ অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে সহজ অথচ সুগভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি, বিশ্ব-সৌন্দর্যের নূতন উপলব্ধি, জীবনের নিকট বিদায়গ্রহণ ও মৃত্যুকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রশান্ত, মোহাবেশহীন মহিমা সরল, অনাড়ম্বর, অথচ আশ্চর্যরূপ দ্যুতিমান্ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

রোগযন্ত্রণার প্রভাব কয়েকটি কবিতায় সুস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৭ সংখ্যক ও ২৯ সংখ্যক কবিতায় রোগীর সঙ্গিহীন একাকীত্বের আশঙ্কা ভয়াবহ ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। স্নেহ-সেবার সুশীতল বেষ্টনীর মধ্যে রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনীশক্তি বিশ্বজগতের প্রাণলীলার সমর্থন পায়; কিন্তু নিঃসংগতার সম্ভাবনা তাগার কল্পনায় জগতের নির্মম, ঔদাসীন্যমাখা, ক্রূর মুখচ্ছবি অংকিত করে। এই ক্ষুদ্র কবিতা দুইটিতে ব্যাধি-জর্জর মনের মাত্রাহীনতা, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অতলস্পর্শ শংকা-আশ্বাসের উপলব্ধি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'রোগশয্যায়'এর ৫ সংখ্যক ও 'আরোগ্যের' ৭ সংখ্যক কবিতায় পীড়ার বেদনার তীব্র উপলব্ধির সংগে মানবাত্মার অপরাজেয় সহিষ্ণুতার জয়গানে দুই বিপরীত সুরের সার্থক সমন্বয় হইয়াছে। ৯ সংখ্যক কবিতায় রোগগ্রস্ত মনের রচনা-প্রয়াস আদিম অন্ধকারে প্রথম সৃষ্টির অপূর্ণ, বিকলাংগ পিণ্ডমূর্তির উপমায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কবির রূপায়ন-শক্তি কল্পনার অস্পষ্টতার উপর জয়ী হইয়াছে; অসুস্থতার ঘোরে অর্ধ-সচেতন মনে এলোমেলো, বিশৃংখল চিন্তা-কল্পনার ঠেলাঠেলি ও প্রকাশ-ব্যাকুলতা অসাধারণ তীব্রতার সহিত অনুভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১৪ সংখ্যক কবিতায় রোগীর ঘরের বদ্ধ, সংকীর্ণ জীবনযাত্রা স্রোতোবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈবালদল-গঠিত দ্বীপের সহিত উপমিত হইয়াছে। এই স্তিমিত, মৃদুস্পন্দিত আবহাওয়ায় ছোট-খাট সেবা-শুশ্রূষা-পরিচর্যাগুলি অপূর্ব মধুর-রস-সিঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—"দুঃখের পাত্রে সুধা-ভরা" কয়েকটা দিন সঞ্চিত হইয়াছে। ১৯ সংখ্যক কবিতাতে রোগীর অসহায় অবস্থা করুণ পরিহাসের স্নিগ্ধস্পর্শে জ্বালা ও উত্তাপ হারাইয়াছে। 'শেষ লেখা'র শেষ দুইটি কবিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তিমরশ্মি-বিচ্ছুরণ—মরণের দুর্ভেদ্য জটিলতার মধ্যে বিশ্বাসের পথ-রচনার দুঃসাধ্য, ক্লেশ-সংকুল

প্রচেষ্টার বাণী-রূপ। মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবের প্রাক্কালে, কল্পনার শ্বাসকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও, কবি ইহার অবাস্তব ছলনার, ইহার মুখোস-পরা বিভীষিকার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন; চরম অন্ধকারের নীরন্ধ্রপ্রায় ব্যাপ্তির মধ্যে আশ্বাসের আলোক-বর্তিকাটি শিথিল-কম্পিত হস্তে উর্ধ্বে ধরিয়াছেন। মৃত্যু-বিভীষিকা ছায়া-বাজির ন্যায় অবাস্তব। ইহা আঁধারের পটভূমিতে উৎকীর্ণ শিল্প রচনা; ইহার মধ্যে আছে সত্যের পরিবর্তে শিল্প-নৈপুণ্য। মৃত্যুর ছলনা, ইহার ছদ্ম-আশ্বাসের প্রতারণা সরল বিশ্বাসের সহজ মহিমার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়—মেঘের অন্তরাল হইতে ইহার মায়া-শর-নিক্ষেপ এই বর্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ দুইটি কবিতায় টেনিসনের কবিতার (Crossing the Bar) দ্বিধাহীন বিশ্বাসের ভাবাবেগ বা ব্রাউনিং এর কবিতার (Prospice) ন্যায় শত্রুকে বলহীন কল্পনা করিয়া তাহার উপর জয়লাভের সুলভ গৌরব-ঘোষণা নাই। ইহাদের মধ্যে মরণের মায়া-জাল-ভেদ, ইহার ছদ্মবেশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের সত্য গৌরব সহজ, আবেগহীন ভাষায়, তত্ত্ব-আবিষ্কারের নিরাসক্ততায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মরণ-সাহিত্যের মধ্যে ইহাদের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষয় থাকিবে।

এই মৃত্যু-রাহুগ্রস্ত রচনাগুলির মধ্যে 'প্রান্তিকে'র দার্শনিকতার সুর আবার নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। 'প্রান্তিকে'র উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর মৃত্যুর সম্মুখীনতায় হয়ত একটু করুণ হইয়াছে, কিন্তু স্থির বিশ্বাসের আলোক পূর্ববৎ অকম্পিত ও অম্লান রহিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ সত্য প্রমাণ করিতে ভাষার যে তীব্রতা ও কণ্ঠস্বরের যে অতিরিক্ত জোরের প্রয়োজন হয়, প্রত্যক্ষ সত্যের কথা বলিতে তাহার পরিবর্তে সহজ, আবেগহীন প্রকাশ-ভংগীই যথেষ্ট। শেষ গ্রন্থগুলিতে মৃত্যু-রহস্য ব্যক্ত করিতে গিয়া কবির ভাব ও ভাষায় অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশের মহিমান্বিত গাম্ভীর্য, মন্ত্রের গাঢ় সংহতি ও প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার সহায়তা-প্রার্থী ছিল, তাহা এখন সোজা, ঘরোয়া কথায়, চোখে-দেখা বিষয়ের অত্যুক্তিহীন বিবৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশলাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রোগশয্যায়'এর ২০ সংখ্যক কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য।

"রোগ দুঃখ রজনীর নিরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোক বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।

পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মত যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার ;
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র য়ত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্য সাগর—তীর্থ পথে।”

এখানে কবি উপনিষদের দার্শনিক পরিমণ্ডল ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহজ সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

'আরোগ্যে'র ৮ সংখ্যক কবিতায় অবসানের সুরটি কি প্রশান্ত প্রতীক্ষা, কি পরিতৃপ্ত সমাপ্তিবোধ, কি পূর্ণতার ব্যঞ্জনা বহন করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে!

“পথরেখা লীন হলো অস্তগিরি শিখর আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিনী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রা-পথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে,···নহে দূর, নহে বহু দূর।”

'আরোগ্যে'র ৩০ সংখ্যক ও 'জন্মদিনে'র ২৭ সংখ্যক কবিতায় সন্ধ্যার বহিঃরূপের সহিত অধ্যাত্ম গূঢ়ার্থতার কি আশ্চর্য সমন্বয় হইয়াছে! দিন যেমন আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতে নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করে, সেইরূপ জীবনের সত্যরূপ-উপলব্ধি মৃত্যু-যবনিকার ক্ষণিক

অন্তরালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সন্ধ্যার বৈরাগ্য, চরম আত্মোৎসর্গ, নবীন দিনের আবাহনের জন্য বিলুপ্তির অন্তরালে তপঃসাধনা—এক কথায় ইহার সমস্ত অধ্যাত্ম প্রতিবেশটি—তাহার ধূসর-ম্লান মুহূর্তটির কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে চরম কলা-কৌশলের সহিত ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের—প্রভাতের আলোক, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রাণলীলার সহিত মানবাত্মার আত্মীয়তা আবার নূতন করিয়া অনুভূত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই সেই অনুভূতির আনন্দময় অভিনন্দন। 'আরোগ্যের' ৯ সংখ্যক কবিতাটি এই দার্শনিক অনুভূতি-পরম্পরার একটি চরম পরিণতি সূচিত করে। ইহাতে আমরা কবির cosmic imagination—বিশ্ববিধানের রহস্যভেদকারী কল্পনার চূড়ান্ত উদাহরণ পাই। "শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে" নটরাজের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা, অপরিমেয়-কল্পব্যাপী সৃষ্টি-উৎসবের অবসানে স্রষ্টার রহস্যাবগুণ্ঠিত, দুরবগাহ মৌনতা, অফুরন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একের মধ্যে সংহরণের ধারণাতীত লীলা—এই পরিকল্পনাব বিরাট মহিমা কবি কত সহজে আয়ত্ত করিয়া কিরূপ অবলীলাক্রমে ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইতে হয়। অস্তাচল-চূড়ায় দাঁড়াইয়া রবি যে শেষ রশ্মি বিকীরণ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গমর্ত্যের সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচিত হইয়াছে ; তাহা মরণোত্তর রহস্যের মর্মভেদ করিয়া এপার-ওপারের পরিচয়-সূত্রটিকে অখণ্ড ও বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। রোগের আবিল আচ্ছন্নতার পিছনে কবির দিব্যদৃষ্টি অসাধারণ স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভেদী শক্তি লাভ করিয়াছে।

এই রোগের মধ্যবর্তিতায় কবি আরও কতকগুলি নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছেন। সগুরোগমুক্ত, পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনাবর্তনকে এক নূতন চোখে দেখে। ইংরেজ কবি গ্রে তাঁহার একটি কবিতায় বলিয়াছেন যে রোগশয্যা হইতে উত্থিত ব্যক্তি নববসন্তের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র দৃশ্য ও সংগীত-ধ্বনির মধ্যে স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পায়। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতায় ইংরেজ কবির এই সাধারণ উক্তি অপরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সহজ, সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি প্রত্যুদ্গমনের যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা ইহার সৌন্দর্যের নব উপলব্ধি হইতে প্রসূত। 'রোগশয্যায়' এর ৬ সংখ্যক কবিতায় চড়ুই পাখীর আনন্দ-স্ফূর্ত অংগভংগী ও গ্রাম্য ভাষায় গান অভিনন্দিত হইয়াছে—এই অতি তুচ্ছ, জীবনের ধূসর প্রাত্যহিকতার

গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে রোমান্সের ভাবাসংগ-বর্জিত পাখী যে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার নবলব্ধ দৃষ্টিভংগী, বোগের সমীকরণ-শক্তির প্রভাব। ইহার ১৭ সংখ্যক কবিতায় ও 'আরোগ্যের' ২২ সংখ্যক কবিতায় রোগীর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল মন কমলালেবুর উপহারের মধ্যে দাতার নাম-অনুমান-তৎপর কল্পনার ক্রীড়াশীল প্রজাপতিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রকৃতির স্নিগ্ধ দৌত্য অনুভব করিয়া রসনা-নিরপেক্ষ এক উচ্চতর তৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছে। এই নবোন্মেষিত তীক্ষ্ণ-চেতনা-সম্পন্ন কবি প্রভাতের আলোর প্রসন্ন স্পর্শ প্রতি রক্তধারায় অনুভব করিয়া ইহাকে অস্তিত্বের প্রতি সম্মানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ('রোগশয্যায়', ৩২)। পলাশের রক্তিম সৌন্দর্য যেন কবির অবলুপ্ত যৌবনের প্রতি সুন্দরের অকৃপণ অভ্যর্থনা, অজস্র-দানশীল প্রকৃতির পূর্ব-বন্ধন স্বীকার (আরোগ্য, ১)। 'জন্মদিনে' ৪ সংখ্যক কবিতায় একটু ক্ষুব্ধ অনুযোগের সুর শোনা যায়—তাহা প্রকৃতির কার্পণ্যে নহে, নিজের শক্তিহীনতায়। পলাশের রক্তাক্ষর-রচিত বার্ষিক নিমন্ত্রণলিপি কবির নিকট পৌছিয়াছে, কিন্তু কবি তাঁহার রুদ্ধদ্বার কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া এই নিমন্ত্রণ উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত। মানুষের পরিবর্তনে প্রকৃতির ঔদাসীন্যের চিন্তা এই কবিতায় একটু ছায়াপাত করিয়াছে ; তথাপি ইহাতে অপরিহার্যের ঈষৎ বিষণ্ন স্বীকৃতি আছে।

'রোগশয্যায়' এর ২৭ সংখ্যক কবিতা সহজের সৌন্দর্যানুভূতির শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। এই ক্ষুদ্র কবিতাটির মধ্যে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় ও দীর্ঘ অন্তরংগতার সূক্ষ্মদর্শিতা এক অপরূপ সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির জীবনস্পন্দনের সংগে কবির রোগাভিভব-মুক্ত জীবনের নিবিড় একাগ্রতা, কোন দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর মধবর্তিতায় নহে, প্রত্যক্ষ অনুভব-ক্রিয়ার সাহায্যে কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের ভিতর দিয়া নহে, চক্ষুকর্ণস্পর্শের সহজ অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গ্রহণশক্তির অনুশীলনে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়াছে। নবজাত শিশুর আদিম কৌতূহল যেন জন্মান্তরার্জিত অধ্যাত্মদৃষ্টির রহস্যোদ্ভেদকারী স্বচ্ছতায় মার্জিত হইয়া এই অপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া জীবনের চরম সত্যকে বিকশিত করিয়াছে।

"খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,

কৌতুহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক্ ? মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজি স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহার রূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে।"

উপনিষদের ঋষি যে দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে 'আনন্দাদেব সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে' এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টি, আবার বহু শতাব্দীর ব্যবধানে, এক বিংশ শতাব্দীর কবির বিচিত্র, বহুমুখী অভিজ্ঞতার স্বচ্ছধারায় অভিস্নাত হইয়া, মানবজীবনের চরম অভিপ্রায় ও অর্থকে নিখিল-প্রকৃতি-পরিব্যাপ্ত আনন্দ-শতদলের মর্মকোষ হইতে উৎসারিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।



রাজলক্ষ্মী ও কমললতা

১

ঢাকা জগন্নাথ হল হইতে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা' পত্রিকার একবিংশ বার্ষিকী সংখ্যাটি সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই সংখ্যা উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সম্ভারে পূর্ণ। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী লিখিত 'শ্রীকান্ত ও কমললতা' প্রবন্ধে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধবৈশিষ্ট্যটি উপভোগ্য মৌলিকতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। লেখক যে নূতন দৃষ্টি-ভংগীর সহিত বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি শরৎ-সাহিত্য-পাঠকের ধন্যবাদার্হ। এই প্রসংগে লেখক উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমার অভিমত উদ্ধার করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন ও আমার সহিত তাঁহার মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তি দেখাইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি এই বিষয়ে আমার পূর্বমতটি পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম বলিয়া লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ। সাহিত্য-বিচারে মতভেদ অপরিহার্য ও ভুলভ্রান্তি এড়ানও সহজসাধ্য নহে। ইহার সমস্যাগুলি এতই বিচিত্র ও বহুমুখী যে ইহাদের কোন কোন দিক্ তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকেরও বিচার-বুদ্ধির নিকট ধরা পড়ে না; তা ছাড়া রসবোধের মানদণ্ডের যে বৈষম্য তাহা ত' অনতিক্রম্য! লেখক এই সমস্যার যে উপেক্ষিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের আমূল বা আংশিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে কি না দেখা যাক।

রাজলক্ষ্মীর সংগে শ্রীকান্তের প্রেমে যে আদর্শ বিশুদ্ধির অভাব এ-সত্যটি বিশ্বরঞ্জন বাবু সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা সর্বথা স্বীকার্য। এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের নিজের সমর্থন যখন তিনি পাইয়াছেন, তখন ইহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে রাজলক্ষ্মীর প্রেমে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার আতিশয্য, একটা জোর-জবরদস্তির ভাব আছে। এই প্রেমের অত্যাচার সাধারণ লোকের পক্ষে প্রণয়ের একটা আকর্ষণ বলিয়াই গৃহীত হয়। আমারই কল্যাণের জন্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রণয়াস্পদের দ্বারা আমার ইচ্ছার অভিভব—সাধারণতঃ ইহা প্রেমের নিবিড়তা ও নিশ্ছিদ্রতার চিহ্ন বলিয়াই

আদরণীয়। কিন্তু তথাপি শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রবল ইচ্ছাশক্তির এই ক্রিয়াকে ঠিক প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত স্বীকৃতির সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহার অন্তরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তি, একটা উদাস, অসহায় আত্মসমর্পণের ভাবের দ্বারাই সে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের দস্যুবৃত্তির প্রতি সাড়া দিয়াছে। কোন সাধারণ স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এই সদা-জাগ্রত কল্যাণকামনা, ঐকান্তিক সেবা-পরিচর্যা, আদেশ-নির্দেশের অলংঘনীয়তা ও আত্মবিসর্জন-তৎপরতার মধ্যে আদর্শ প্রণয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাইত। এমন কি, ধর্মলুব্ধতার বিপরীত আকর্ষণে প্রণয়ের সাময়িক অভিভব ও উপেক্ষাও বিশেষ কোন বিরাগের সৃষ্টি করিত না। কিন্তু শ্রীকান্তের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য, তাহার বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্ত, নির্লিপ্ত মনোভাবের জন্য, যাহা সাধারণের রুচিকর ও সুস্বাদু হইত তাহা তাহার চিত্তকে অতৃপ্তি ও অবসাদে ভরিয়া তুলিয়াছে। যাহা অপরের কণ্ঠে স্বর্ণহার হইত, তাহা তাহার পায়ে লৌহনিগড়ের ন্যায় অনুভূত হইয়াছে। এইজন্য প্রণয়িনীর নিশ্ছিদ্র অভিভাবকত্ব, তাহার অসপত্ন অধিকারের দাবী—তাহার অন্তরের স্বাধীনতাস্পৃহাকে পীড়িত করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী ধর্মসংস্কারের ও আচারগত শুচিতার তাগিদে যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অধিকার-লোপের ভয়ে আবার তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একটা হাস্যকর অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই আমরা তাহাকে একবার পুঁটুর, দ্বিতীয়বার কমললতার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে আসরে নামিতে দেখি। এই অশোভন প্রতিযোগিতায় তাহার যে মর্যাদাহানি হইয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে গঞ্জনা দিবার জন্যই যে লেখকের অভিপ্রেত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গৃহিণীত্বের গৌরব যেমন স্বামীর সহিত ছোটখাট কলহবিরোধকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া লয়, রাজলক্ষ্মীর প্রেমও তেমনি এই ছোটখাট অমর্যাদাকে অংগীভূত করিয়া লইয়াছে। সমুদ্রের গহন গভীরতায় আন্দোলিত, অন্ধকার নিশীথিনীর গর্ভোদ্ভিন্ন, নানা দুর্যোগ-ঝঞ্ঝাবাতে মার্জিতকান্তি এই প্রেমচন্দ্র তুচ্ছ লাঞ্ছনা-কলংকের চিহ্নগুলিকে নিজ রজত-শুভ্র কৌমুদী-প্লাবনের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এ-পর্যন্ত বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা এই—শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর প্রেমে, বাঁধিবার আত্যন্তিক ব্যগ্রতা আছে বলিয়া ইহাকে প্রেমের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই, এবং তিনি ইচ্ছাপূর্বকই ইহার সহিত কমললতার প্রেমের তুলনা করিয়া পরজাত

হৃদয়-সম্পর্কটিরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এই যুক্তিধারা মানিয়া লইলে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের অবমাননায় আমার বিস্ময়-প্রকাশ বা প্রতিবাদ-জ্ঞাপন সমর্থনযোগ্য নহে। লেখক জানিয়া শুনিয়া খোলা চোখে যাহা করিয়াছেন তাহাতে আকস্মিকতার আরোপ সমালোচকের বিচার-বিভ্রম। কিন্তু প্রশ্নের এইখানেই মীমাংসা হয় না। লেখকের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সেই উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও সমালোচকের বিচার্য। রাজলক্ষ্মীর অপেক্ষা কমললতার প্রেম যে শ্রেষ্ঠ তাহা লেখকের ব্যক্ত বা অব্যক্ত অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া মানিয়া লইলে চলিবে না, তাহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিতে হইবে। আদর্শের উৎকর্ষ যে সকল সময় সাহিত্যিক রূপায়ণের উৎকর্ষের হেতু তাহা নহে।

বিশ্বরঞ্জন বাবু কমললতার প্রেমকে বৈষ্ণব-সাধনার আসক্তিবিহীন, অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রেমের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এ প্রেম বাঁধিতে চাহে না, অধিকার-প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করে না, দৈহিক সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না—ইহা প্রেমাস্পদকে প্রীতিস্নিগ্ধ মানসস্পর্শে অভিষিক্ত করিয়াই কৃতার্থ; স্মৃতির অক্ষয় পাথেয় সম্বল করিয়াই ইহা চির-অভিসারের অফুরন্ত পথে জয়যাত্রায় বাহির হয়। হয়ত লেখকের ইহাই মনোগত অভিপ্রায় ছিল; হয়ত কমললতাকে বৈষ্ণবের আশ্রম-প্রতিবেশে, বৈষ্ণব ধর্মসাধনার অভ্যস্ত কর্মপদ্ধতির মধ্যে স্থাপন করার ইহাই গূঢ় উদ্দেশ্য। শ্রীকান্তের বৈরাগী মনও ঠিক এই রকম প্রেমের মধ্যে তাহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান-আকুতির চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে বিশ্বরঞ্জন বাবু লেখকের এই অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টি চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীকান্তের হৃদয়-রাধিকা প্রেমের যে সার্থক রূপটি দেখিবার আশায় জীবনে যে দুর্গম অভিসারে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণ রূপটি দেখিয়াছে কমললতার মধ্যে"

২

কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, কমললতার এই রূপক-প্রতিভাসে রহস্যনিবিড় প্রেমটি শরৎচন্দ্র কি ভাবে পাঠকের নিকট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোথায় ইহার অংকুরোদ্গম; কোথায় ইহার পরিণতির ইতিহাস; কোথায় ইহার ঘাত-প্রতিঘাত-চঞ্চল, আনন্দ-বেদনায় দোলায়িত পরিপুষ্টির মধ্যবর্তী স্তর; কোথায় বা ইহার শিরা-উপশিরায় সঞ্চরণশীল বেগবান রক্তপ্রবাহ ও নিগূঢ় মাধুর্যরস?

ইহা যাদুকর-রোপিত বৃক্ষের ন্যায় নিমেষের মধ্যে শাখা-প্রশাখাবহুল ও পল্লবঘন হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক ফলবান্ যে হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। বিশ্বরঞ্জন বাবু হয়ত আত্মপক্ষ-সমর্থনে বলিতে পারেন যে, রূপকের ইংগিতই এখানে যথেষ্ট; সংবেদনশীল পাঠক এই ইংগিত অনুসরণ করিয়াই সমগ্র ইতিহাসটি মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করিতে পারেন। কিন্তু যে সার্থক তথ্যসমাবেশ ও তাহার মর্মোদ্‌ঘাটন উপন্যাসের মূলনীতি, অর্ধস্ফুট ইংগিতের অনির্দেশ্যতা কি তাহার সহিত খাপ খায়? যদিই বা তাহা সম্ভব হয়, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে শ্রীকান্তের পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, চতুর্থ পর্বে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম সম্বন্ধে লেখক ত এই অর্ধ-প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির ধাঁধাঁলাগানো উপয় অবলম্বন করেন নাই। সেখানে যে প্রেমটিকে আমরা চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে দেখি, তাহার মধ্যে ত কোন ইন্দ্রজাল-সুলভ আকস্মিকতা নাই। ইহা শৈশব-সাহচর্যের স্মৃতির আশ্রয়ে উদ্ভূত হইয়া কলংকিত যৌবনের পংকস্তর হইতে নিগূঢ় জীবনীশক্তি আহরণ করিয়াছে—বাহিরের বাধা ও অন্তরের বিরোধের সংগে যুদ্ধ করিয়া অজেয়ত্ব অর্জন করিয়াছে; জীবনের নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও নিবিড় রসমাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সময় সময় ইহা মুহূর্তের বিভ্রমে আপনাকে আপনি অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই এই আত্ম-অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতি-ক্রিয়ায় ইহা আরও দৃঢ়মূল ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ধর্মসংস্কারের মরুবালুকা ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু বালুকাগর্ভে ক্ষণিক আত্ম-নিমজ্জনের পর ইহাব অমৃত-নির্ঝর আরও অজস্র ধারায় উৎসারিত হইয়াছে। এই প্রেমের গলদেশে আত্মহত্যার উদ্বন্ধন-রজ্জু শিথিল হইয়া পড়ে; ইহা আঘাতে মরে না, অপমানে গৌরব হারায় না, ভুলে লজ্জা পায় না। ইহার ললাটে অমরত্বের জ্যোতির্ময় তিলকরেখা অংকিত। শরৎচন্দ্র অপূর্ব শিল্পকৌশলে রূপ-মাধুরীর সমাবেশে প্রেমের যে প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন, পরে চেষ্টা করিয়া তাহার ভিতরের খড়-মাটি উদ্ঘাটিত করিলেও ইহার রমণীয়তা কমাইতে পারেন নাই। এই প্রেম আদর্শ না হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র ভাবধারা অনুসরণ করিয়া আমরা এই মৃত্তিকালিপ্ত ভালবাসাকেই অভিনন্দন জানাই।

ইহার সহিত তুলনায় কমললতার প্রেমকে কি অমূল-তরু বলিয়া মনে হয়

না? উহার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীকান্তের নাম গহরের নিকট শুনিয়া কমললতা কিছুদিন হইতেই শ্রীকান্তের দর্শনাভিলাষিণী ছিল, এবং শ্রীকান্তের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাহার ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অকস্মাৎ-উদ্ভূত ভালবাসা অতি দ্রুতবেগে পরিচয়ের সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া অন্তরংগতার চরম সীমায় পৌছিয়াছে। শরৎচন্দ্রের প্রেমবর্ণনার সমস্ত সুপরিচিত লক্ষণগুলিই—সেবাতৎপরতা, প্রিয়-সম্বোধন, অর্থগূঢ় স্বল্পভাষণের সাহায্যে হৃদয়বিনিময়, আমরণ একনিষ্ঠতার আশ্বাস, ভাবগদ্‌গদ প্রেমনিবেদন—এই নবজাত শিশু-প্রণয়ের অংগে বৈষ্ণব-অলংকার-বর্ণিত স্বেদ-কম্প-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক চিহ্নের ন্যায় নিমেষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়ত আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক ভাবরাজ্যে শুষ্কতরু মুঞ্জরিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কার্যকারণ-শৃংখলারচিত, ক্রমবিকাশের সুনির্দিষ্টস্তরবদ্ধ, মন্থরগতি জগতে ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কমললতার প্রেমকে বৈষ্ণব-প্রেমসাধনার পর্যায়ে উন্নীত করিলে ইহার পক্ষে হয়ত' অসাধ্যসাধন সম্ভব, কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের বিষয় না করিয়া ইহাকে গীতি-কবিতার নিরংকুশ স্বাধীনতা দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসংগত ছিল। এই ভালবাসার ইতিহাসে উচ্চ-আদর্শমূলক অনেক ভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে, এবং এই জাতীয় দুই একটি বাক্য উদ্ধার করিয়া বিশ্বরঞ্জনবাবু মৎকর্তৃক উত্থাপিত 'সুলভ ভাববিলাসে'র অভি-যোগ নিরসন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমার অভিযোগ ঠিক এইরূপ অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের দৃষ্টান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গভীর কথা অগভীর উৎস হইতে বাহির হইয়া আসিলেই ইহার ভাবগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও ইহাকে 'সুলভ ভাববিলাসে'র সন্দেহ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায় না—ইহার সুলভত্বই ইহার আতিশয্য-বিলাসের নিদর্শন। কমললতার প্রেমের সুস্থ আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়, যখন আমরা শুনি যে গহরের প্রতি তাহার মনোভাব ঠিক এই সুরেই বাঁধা ছিল। শেলী তাঁহার Epipsychidion-এ তাঁহার ঊর্ধ্বগগনবিহারী কল্পনার আবেশে গাহিয়াছেন :—

True love in this differs from gold and clay,
That to divide is not to take away.

এবং অনুরূপ আধার-নিরপেক্ষতা ধর্মসাধনামূলক প্রেমের একটা বিশেষত্ব ও

প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। কমললতার প্রেম হয়ত এই কারণে গহর ও শ্রীকান্তের উপর তুল্যরূপে ক্রিয়াশীল হইয়াও কোন দ্বৈতভাবের সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হয় নাই। শেলী উপন্যাস লেখেন নাই; লিখিলে তাঁহাকে তাঁহার উক্তির জন্য জবাবদিহি করিতে হইত। শরৎচন্দ্রও তাঁহার প্রেমকে ধর্মাভিমুখী করিয়া, ও ধর্ম-মহাসমুদ্রে একাধিক স্রোতস্বিনীর শান্তিপূর্ণ বিলোপের ইংগিত দিয়া, ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের দায়িত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না।

৩

এ সমস্ত বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বরঞ্জন বাবু যে বৈষ্ণবরস-সাধনার দোহাই পাড়িয়াছেন, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস, পদাবলী-সাহিত্যেরই আলোচনা করা যাক। সেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কি এইরূপ গূঢ়ার্থ ইংগিতের দ্বারাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে? সেখানে ত পদাবলী-রচয়িতারা ধর্মসাধনার সাংকেতিকতার অজুহাতে আমাদের তথ্য-বিষয়ক কৌতূহল ও সৌন্দর্য-রসবোধকে অপরিতৃপ্ত রাখেন নাই। বিশ্বরঞ্জন বাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এই চিরকিশোর-কিশোরীর অনুপম প্রেম, ধর্মের বিশেষ অধিকারের সুযোগ প্রত্যাহার করিয়া, অনুশাসনের ঔদ্ধত্য বিসর্জন দিয়া, মানবহৃদয়েব সনাতন রসজ্ঞতা ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি নিজ আবেদন জানাইয়াছে ও এই প্রীতিস্নিগ্ধ, সরস পথ বাহিয়াই আমাদের অন্তরলোকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পদকর্তারা ধর্মোপদেষ্টার মুরুব্বিয়ানা সুরে, নিগূঢ় সাধনাতত্ত্বপ্রচারকের বক্রোক্তিপ্রবণ ভংগীতে পাঠকের উপর অনুজ্ঞা জারী করেন নাই—"এখানে ধর্মের কথা হইতেছে, রসের দাবী করিও না; রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে আদর্শ, আধ্যাত্মিক প্রেম তাহার প্রমাণ চাহিও না, তাহা আপ্ত-বাক্যের মত স্বীকার করিয়া লও।" এরূপ পথ অনুসরণ করিলে বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রভাবহ্রাসের সংগে সংগে পদাবলী-সাহিত্য সৌন্দর্যলোকের অক্ষয়-স্বর্গচ্যুত হইয়া প্রাচীন মতবাদের জঞ্জালস্তূপ-পরিকীর্ণ, ঊষর ভূমিখণ্ডে অর্ধসমাধিস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইত। অধ্যাত্ম-মতবাদের সহায়তা কাব্যের সদ্যোজনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহার চিরন্তন আবেদনের পরিপন্থী হয়—যে ভাবের জোয়ারে ইহা সহজেই পাঠকের চিত্ত-তটসংলগ্ন হয়, ভাঁটার টানে তাহা হইতে বহুদূরে, প্রত্যাবর্তনসম্ভাবনা-বিরহিত হইয়া অপসারিত হইয়া যায়। অবলীলাক্রমে উৎসারিত ভাবাবেগ-প্রাচুর্য

যে অশ্রুসিক্ত জলাভূমির ব্যবধান সৃষ্টি করে, পরবর্তী যুগের পাঠকের রসবোধ তাহার উপর স্বচ্ছন্দবিচরণের দৃঢ় আশ্রয়স্থল পায় না। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যিকার কবি তাঁহারা যে ধর্মাবেশের ক্ষণস্থায়ী আনুকূল্যের চোরাবালির উপর তাঁহাদের কাব্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের শাশ্বত রসজ্ঞান ও রসপিপাসু চিত্তের রহস্যজ্ঞতার পরিচয় মিলে।

এখন দেখা যাউক, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কি উপায়ে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে চির-নবীন সৌন্দর্যে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে? ইহার প্রথম উন্মেষ হইতে চরম সার্থকতা ও চির-বিরহের মাধুর্য-বেদনা-মণ্ডিত পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তর আমাদের নিকট রেখায়, বর্ণে, পটভূমিকার অবকাশে, সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা অংকিত চিত্রপটের ন্যায় উজ্জ্বল, ক্রমপর্যায়-বিন্যস্ত, রসঘন নাটকের ন্যায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনের কত খুঁটিনাটি কাহিনী, কত মান-অভিমান-অনুরাগ-বিরাগের পালা, প্রণয়-লীলাভিনয়ের কত বৈদগ্ধ্য-চাতুর্য, কত হাস্য-পরিহাসে সরস, প্রচ্ছন্ন-শ্লেষ-মার্জিত উত্তর-প্রত্যুত্তর, হৃদয়াবেগের কত অনিবার্য উচ্ছ্বাস, ঘটনা-সংস্থানের কত অভিনব বৈচিত্র্য এই প্রেম-কাহিনীকে সমৃদ্ধ, রস-নিবিড় ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের উদাহরণস্থল করিয়াছে। বাহিরের প্রতিবেশ-প্রভাব ইহাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে অপসারিত করিয়া সমাজ-জীবনের জটিল সংস্থিতি ও দুশ্ছেদ্য সম্পর্কজালের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। সখা-সখীর দৌত্য, সমবেদনা, সস্নেহ অনুযোগ ও তিরস্কার, গুরুজনের বিরাগ-ভীতি, সমাজ-বিধি উল্লংঘনের সংকোচ-আশংকামিশ্রিত দুঃসাহসিকতা, পিতামাতার স্নেহ-বাৎসল্য, গোপ-সমাজের আচার-ব্যবহার ও সাধারণ জীবন-যাত্রার পূর্ণাংগ ইতিহাস এই অনুপম প্রেমের পটভূমিকা রচনা করিয়া ইহাকে রসধারা ও জীবনীশক্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। তাহার উপর, বহিঃ-প্রকৃতির পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য-সমাবেশ এই প্রেমকে কল্প-লোকের আদর্শ-সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। যমুনাতীরের শ্যামল বনানী-শোভা, ঋতুচক্রাবর্তনের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যসম্ভার, শরৎ-পূর্ণিমার কৌমুদীপ্লাবন, বসন্ত-রজনীর বিহ্বল মদিরতা, বর্ষার মেঘান্ধকার, বর্ষণমুখর নিশীথের ঘনীভূত বিরহবেদনা ও ব্যাকুল অভিসার-যাত্রা, পুষ্প-সৌরভ ও বাঁশীর আকুল আহ্বান, নৃত্যগীত-বন-ভোজনের আনন্দ-হিল্লোল, রাস-দোল-ঝুলনের পুলকাবেশ এই ঐশী প্রেমের দেব-মন্দিরে রূপমুগ্ধ কবিকল্পনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যাভিষেকের অর্ঘ্য সাজাইয়াছে। আবার, যেমন সুদূর-বিসর্পিত দিকচক্রবালের রহস্য-বিজড়িত শ্যামলিমা আমাদের

সংকীর্ণ প্রয়োজন-সীমার চারিদিকে এক উদার, উন্মুক্ত প্রসারের আভাস বহন করে, সেইরূপ এই সৌন্দর্যোপভোগের কবিতার ভাবমণ্ডলে অধ্যাত্ম-সাধনার সার্থক ইংগিত আমাদিগকে রূপ হইতে অরূপের রাজ্যে লইয়া গিয়া, আমাদের অন্তরে অসীমের প্রতি আকুতি ও ভাব-তন্ময়তার উদাত্ত অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। কত ভক্ত, কত ভাবুক, কত দার্শনিক তাঁহাদের একান্ত ভক্তি-সাধনার সমস্ত শক্তি, অশ্রান্ত অনুশীলন ও অবিরত প্রচারের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী-মনোভাবের যৌথ-প্রেরণার প্রয়োগ করিয়া, এই কবিতার মধ্যে ধর্মোন্মাদনার ভাব-বিহ্বলতার সঞ্চার করিয়াছেন; সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্য-সৃষ্টির উপরিকার বায়ুস্তরে যে অনন্তাভিমুখী অভীপ্সা অলক্ষ্য-সঞ্চারী থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া এই উভয় উপাদানের মধ্যে অন্তরংগ সংযোগ সাধন করিয়াছেন; অসীমের ঊর্ধ্ব-গগন-বিহারের মোহে সীমার জগতের মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাব উপেক্ষা করেন নাই; পরিচিত জীবনের প্রতিবেশে, পার্থিব প্রেমের রসানুভূতির মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকে ভক্তির প্রজ্বলিত অগ্নিতে, দার্শনিকতার কটাহে ফুটাইয়া ও ইহাতে অধ্যাত্ম-ভাব-গভীরতার কর্পূর-সৌরভ মিশাইয়া ইহার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবিতার অন্তরশায়ী আত্মার সহিত ইহার রূপঘন বিগ্রহের এক আশ্চর্য রকমের সমন্বয় ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহা একদিকে বস্তুতন্ত্রতারস্থূলতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতার অশরীরী বায়ব্যতা (airiness), এই উভয়বিধ অতিরেক হইতে মুক্ত হইয়াছে।

(৪)

এখন বৈষ্ণব কবিতার লোকোত্তর উৎকর্ষের মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রের কমল-লতাকে বিচার করিলে সে কি এই তুলনামূলক আলোচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করিতে পারে? মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা ও ভগবানের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মনোহারিত্ব ফুটাইবার জন্য যদি বৈষ্ণব-কবি-গোষ্ঠীর পক্ষে এরূপ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে শরৎচন্দ্র কি কেবল মাত্র এক অনায়াস-কল্পিত, অলক্ষ্যপ্রায় রূপক-প্রতিভাসে কমললতার প্রেমের নিগূঢ় মাধুর্য ও সাংকেতিকতা ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন? বৈষ্ণব কবির অবিরত, পৌনঃপুনিক মন্থনে যে অমৃতরস উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র কি তাঁহার যাদুদণ্ডের বারেক মাত্র সঞ্চালনে অনুরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন? বৈষ্ণব

কবি যে অনুকূল প্রতিবেশ, ব্যাপক বাস্তব-চিত্রণ, ভক্তিরসাপ্লুত, নিঃসংশয় ধর্মবিশ্বাস ও যুগধর্মের সোৎসাহ সমর্থনের সহায়তায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক তাহা কোথায় পাইবেন? শরৎচন্দ্র যদি কোন নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টিবলে কমললতার মধ্যে আসক্তি-বন্ধনহীন, নিষ্কলুষ বৈষ্ণব প্রেমের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহার রহস্যে তিনি পাঠকমণ্ডলীকে অংশভাক্ করেন নাই। রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার প্রেমের ধারার বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া লইলেও, কি এইটুকু ভিত্তির উপর এত বড় একটা সম্ভাবনাকে দাঁড় করান যায়? লেখক বাঁধন-লাগার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই, বাঁধন-ছেঁড়ার মহিমা এত উচ্চকণ্ঠে খ্যাপন করিলে কি হইবে? জলের তিলক কপাল হইতে মুছিয়া গেলে কেহ কি বিস্ময় অনুভব করে? ব্রজধামের মোহন-লীলার পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট না হইলে কি মথুরা-প্রয়াণ এত মর্মান্তিক করুণরসের প্লাবন ছুটাইয়া দিতে পারিত?

যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন করিয়া প্রবন্ধ শেষ কবির। রাজলক্ষ্মীর প্রেমে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার অতি আগ্রহ ও ধর্মসংস্কারের দ্বারা ইহার অভিভব শ্রীকান্তের বন্ধন-বিমুখ মনের খুব রুচিকর হয় নাই; এবং তাহার ক্লান্ত, নিরুৎসাহ আত্মসমর্পণ ও ব্যথাক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তরের নীরব প্রতিবাদেরই পরোক্ষ সাক্ষ্য। কমললতার তথাকথিত প্রেমের অনাসক্তি ও বন্ধন-শিথিলতা শ্রীকান্তের প্রকৃতির অধিকতর উপযোগী ও সেইজন্যই তাঁহার হৃদয়াবেগের পূর্ণতর তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও সদা-সতর্ক অভিভাবকত্বের নিকট শ্রীকান্ত যেন সর্বদাই সংকুচিত; প্রতিদানহীন উপকার-গ্রহণের গ্লানি যেন সর্বদা তাহার দেহে মনে সংলগ্ন। রাজলক্ষ্মীর অপ্রসুপ্ত ও সময় সময় অতি-জাগ্রত ধর্মসংস্কারের নিকটও সে নিজ অনাবশ্যকতা ও এমন কি অশুচিতা সম্বন্ধেও সংশয়াবিষ্ট; কাজেই সূর্যকিরণস্নাত পদ্ম যেমন তাহার সমস্ত দলগুলি সহজ আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত মেলিয়া ধরে, রাজলক্ষ্মীর প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীকান্তের প্রকৃতি সেরূপ সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। কমললতার সহিত কথাবর্তায় তাহার সে সংকোচ নাই; গ্রহণ-প্রতিদানের মধ্যে ভার-সাম্য, তাহাকে নিজ মর্যাদায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহার প্রণয়-নিবেদনের মধ্যে তাহার চিরাভ্যস্ত ভীরু, অপটুতার পরিবর্তে সক্রিয় সপ্রতিভতার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। শরৎচন্দ্র এই পরিবর্তনের ইংগিত দিয়া কমললতার প্রেমে আদর্শগত শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ

করিতে চাহিয়াছেন। এবং বিশ্বরঞ্জন বাবু সম্ভবতঃ লেখকের নিকট প্রত্যক্ষসূত্রে জ্ঞাত হইয়া এই প্রেমকে বৈষ্ণবধর্ম-সাধনার প্রতীকরূপে পরিকল্পনা করিয়া ইহার তথ্যগত রিক্ততাকে সাংকেতিকতার ঐশ্বর্যে পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশ্বরঞ্জনবাবু এ কথাও বলিয়াছেন যে, রাজলক্ষ্মীর প্রেম কমললতার প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহার ভবিষ্যৎ-গতি নিয়ন্ত্রন করিয়াছে। ইহার তথ্য-প্রমাণ অবশ্য খুব সুপ্রচুর নহে। অন্ততঃ লেখক রাজলক্ষ্মীর এই নূতন-শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রেমের কোন বর্ণনা দেন নাই। অবশ্য, রাজলক্ষ্মীর অনুপ্রেরণা যে কমললতার ভালবাসার উৎকর্ষের অবিসংবাদিত প্রমাণ তাহা বলা যায় না। রাজলক্ষ্মী অনেকবার অনেকের কাছেই পাঠ লইয়াছে—প্রথম, অভয়ার নিকট নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণার মহিমা সম্বন্ধে আলোক লাভ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, পুঁটুর কাছেও যে তাহাব শিখিবার কিছু ছিল না তাহা নহে। সেই হাস্যকর, অসংগতিপূর্ণ বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেও সে ধর্মচর্চার নেশায় প্রণয়াস্পদকে অবহেলা করার যে বিপদ সে বিষয়ে সচেতন হইয়াছে, ও শ্রীকান্তের প্রতি ব্যবহারের ধারা পরিবর্তন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া অভয়ার প্রেম ও পুঁটুর সহিত গাঁটছড়া বাঁধার প্রচেষ্টা যে রাজলক্ষ্মীর ভালবাসা হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হয় না। রাজলক্ষ্মী হয়ত কমললতার নিকট নিষ্কাম প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকিবে—কিন্তু এই নবলব্ধ নিরাসক্তির সহিত তাহার নীড়-রচনার প্রচণ্ড আগ্রহের কিরূপ সামঞ্জস্য বিধান হইল—তাহা অনুমানের পর্যায়ে রহিয়া গেল।

তথাপি বিশ্বরঞ্জনবাবু যে এই প্রশ্নের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সে জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আমি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অবিচারকে যে লেখকের আত্মবিস্মৃতি-প্রসূত বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক নহে —ইহা তাঁহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও আমার মূল সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। আমি এখনও রাজলক্ষ্মীর সহিত তুলনায় কমললতার প্রেমকে উচ্চতর কলাকৌশলসম্মত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কেন পারিতেছি না তাহার সবিস্তার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' অবশ্য, কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনার অংশবিশেষে অপকর্ষের অভিযোগ খুব নিরাপদ পন্থার অনুসরণ নহে—বিশেষতঃ যেখানে অপর একজন সমালোচকের চক্ষে উক্ত অংশ রসোত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। নেতিমূলক (negative) সমালোচনা অপেক্ষা ইতিমূলক

(positive) সমালোচনা নিঃসন্দেহ অধিকতর মূল্যবান, যদি এই উৎকর্ষ-আবিষ্কারের পিছনে সত্যিকার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি থাকে। বিশ্বরঞ্জন-বাবু মনে করেন যে, শ্রীকান্ত ও কমললতার মধ্যে সম্পর্কের যে আলোচনা আমি করিয়াছি,তাহা "তাহা বুদ্ধিবৃত্তি ও কলাশাস্ত্রের" সূত্রের অন্ধ আনুগত্যের জন্য ঠিক সমস্যার মর্মস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। এই অভিযোগ সত্য হউক আর নাই হউক, ইহা ঠিক যে আমার রসবোধ এই সৃষ্টির পুর্ণ মাধুর্য আস্বাদনে কৃতকার্য হয় নাই—কোথায় কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। এই প্রতিবন্ধকের প্রকৃতিটি যথাসাধ্য নির্ণয়ের জন্য যত্নবান হইয়াছি। যদি এই আত্ম-সমর্থন নিরপেক্ষ, সংবেদনশীল পাঠকের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে আমার রসগ্রহণে অক্ষমতার বিষয়ে পুনরায় স্বীকারোক্তি পেশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব

(১)

বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার নূতন নাটক লিখিয়াই ইহা সর্বজনবোধ্য হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য তাঁহার নিরক্ষরা দাসীকে পড়িয়া শোনাইতেন। দাসীর বোধশক্তির মাপকাঠিতে ইহা উত্তীর্ণ হইলে তবে তিনি ইহার সাফল্য-সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। এই পাঠকালে নাটকের পাত্রপাত্রীদের ব্যবহৃত ভাষার সহিত নিজের কথা-বার্তার ভাষার ঐক্য অনুভব করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে ঐ ভাষাকেই সাহিত্যিক অভিধানে গদ্য বলা হয়। তখন সে চমৎকৃত হইয়া আবিষ্কার করিল যে সে নিজের অজ্ঞাতসারে চিরজীবনই গদ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

এই সত্য গল্পটির মধ্যেই সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব-রহস্যটি নিহিত আছে। অতি প্রাচীনকালের সাহিত্যে পদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের একটা মুখ্য কারণ —সাধারণ কথোপকথনের চিরপরিচিত ভাষার যে সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে এই সত্যের কুণ্ঠিত ও বিলম্বিত উপলব্ধি। আখ্যায়িকা, তথ্যবিবৃতি, বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় অধুনা বিশেষভাবে গদ্যের অধিকার-ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির উপরেও বাংলা সাহিত্যে প্রায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদ্যেরই একাধিপত্য ছিল। মংগলকাব্যগুলিতে ভ্রমণকাহিনী, রন্ধনদ্রব্যের তালিকা, সাধারণ বাদ-বিতণ্ডা ও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত পদ্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৈষ্ণব চরিত-কাব্যগুলিতেও চৈতন্যদেবের জীবনের বহিরংগ ঘটনাসমূহ, এমন কি বৈষ্ণব দর্শনের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার ও আলোচনা পদ্যের এই অতি-নির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে কবিত্বশক্তির প্রাচুর্য তাহা নহে, গদ্যের সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস। যে ভাষায় আমরা প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি প্রকাশ করি, বিষয়কর্ম নির্বাহ করি, প্রতিবেশীর সহিত কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদান করি, বাজারে জিনিস কিনিতে দর-দস্তুর করি, সময় সময় ঝগড়া-বিবাদের মুহূর্তে যাহার ইতরজনোচিত অপব্যবহার করি, যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার তুচ্ছতার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, নিত্য ব্যবহার্য

তৈজসপত্রের ন্যায় যাহা কলংকস্পৃষ্ট ও ধূলিমলিন, তাহাকে যে আবার মাজিয়া ঘষিয়া সাহিত্যিক দেবপূজার কার্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, তাহার ভিতর দিয়া যে উচ্চাংগের প্রকাশ-ক্ষমতা ও সাহিত্যের অম্লান দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে পারে, এই সম্ভাবনা বহুদিন পর্য্যন্ত লেখকের মনে উদয় হয় নাই। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত গদ্যের ভাষা ও ছন্দ মৌখিক কথাবার্তায় সীমাবদ্ধ ছিল, মানুষের মুখ হইতে সরস্বতীর বীণার তারে সঞ্চারিত হয় নাই; চণ্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা ও হাটবাজার হইতে সাহিত্যের আসরে উন্নীত হয় নাই। আজকাল পদ্যের রাজ্যে গদ্যের অনধিকার-প্রবেশ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। এ অভিযোগ সত্য হইলেও ইহা গদ্যের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সুদীর্ঘ নির্বাসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। পদ্য জ্যেষ্ঠাধিকারের সুবিধা লইয়া গদ্যের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যেষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের মত সাহিত্যেরও একটা প্রতিশোধ আছে।

বংগ-সাহিত্যে গদ্যের বিলম্বিত আবির্ভাব অতিশয় দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল প্রথানুগত্যের ফল। প্রকাশরীতির নূতনত্ব নির্ভর করে বিষয় ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্যের উপর। প্রাক্-ইংরেজ যুগের সাহিত্যে এই উভয়েরই একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। যেখানে দেব-মাহাত্ম্য-প্রচার ও ধর্মভাব-উদ্দীপন লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু-নির্বাচনও এই উদ্দেশ্যের দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে প্রচলিত পদ্যরীতির উল্লংঘনের কোন প্রেরণা অনুভূত হয় না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যে প্রবল ভাববন্যা বাঙালীর জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহা কাব্যপয়ারের শান্ত, নিয়মিত বন্ধন উপচাইয়া পদাবলীর বিচিত্র ছন্দে ও অননুভূত-পূর্ব আবেগ-গভীরতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং ইহার প্রভাব গদ্যাভিমুখী না হইয়া বরং উহার বিপরীতগামী হইয়াছিল। এই ভাবোন্মাদের সংগে সংগে এক নূতন বস্তু-নিষ্ঠাও বৈষ্ণব-লেখক-গোষ্ঠীর চিত্ত অধিকার করিয়া তাহাদিগকে তথ্য-বিবৃতি ও জীবনচরিত-রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। এই মনোবৃত্তির ফলে গদ্যের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবানুরক্তির সহিত তুলনায় ভক্তি-বিহ্বলতা প্রবলতর হওয়ায়, এই রচনাগুলি মুখ্যতঃ কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং প্রকাশরীতি ও পয়ারের মোহ কাটাইয়া বস্তুতন্ত্রতার প্রতীক গদ্যে পৌছাইতে পারে নাই।

(২)

বাংলা কাব্যে এই পয়ার-প্রাধান্য গদ্যরীতির উদ্ভবকে আধুনিককাল পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার আর একটা কারণ। সনাতনপ্রথার অনুবর্তনকারীদের পক্ষে পয়ারের উচ্ছ্বাসহীন, নিস্তরংগপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়ার মত আরামদায়ক আর কিছু ছিল না। বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহা এমন একটা সহজ মসৃণতা লাভ করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন একটা চেষ্টাহীন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্যপ্রচেষ্টা অতীতের এই কারুকার্যহীন সাধারণ ছাঁচে, যেন একটা অনিবার্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিত। পয়ারের মধ্যে পদ্যরীতির ছদ্মবেশে গদ্যরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাঁটি গদ্যের প্রয়োজনীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বাস্তবিক, এই অতি-প্রচলিত ছন্দে গদ্য-পদ্যের এক সাম্যভাবমূলক মিলন দেখা যায়। পয়ারের প্রত্যেকটি চরণ যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সরল ভাবের unit; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাতে গদ্যের অন্বয়ের পর্যন্ত নিখুঁত অনুবর্তন বজায় আছে। আখ্যায়িকা বিবৃতি, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, বাদ-প্রতিবাদ ও কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের যে সমস্ত অংগে বিশুদ্ধ কাব্যোৎকর্ষের মানদণ্ড খুব উচ্চ না হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহার উপযোগিতা অসাধারণ। ইহার বিস্তার পাঠক অপেক্ষা নিরক্ষর শ্রোতার সীমাবদ্ধ ধারণা ও স্মৃতিশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নিয়ন্ত্রিত—ইহা যেন শিশু-কাব্যরসিকের তৃপ্তির জন্য ক্ষুদ্র ঝিনুকে রস-পরিবেশন। ইহার ছোট ছোট বাক্যাংশে গ্রথিত, সহজবোধ্য ভাষাবিন্যাসের মধ্যে ধ্বনি-প্রবাহের বাহুল্য নাই; অনেকগুলি পয়ার একসংগে পড়িলে তাহাদের সমতাল-বিন্যস্ত, মৃদু পদক্ষেপের অন্তরালে অতি ক্ষীণ অলংকারশিঞ্জিতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কণ্ঠসংযোজিত কৃত্রিম সুরের দ্বারাই যেন তাহাদের সূক্ষ্ম অন্তঃসংগীতের অভাব পূরণ করিতে হয়। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবির হাতে পড়িলে এই ছন্দের উচ্চাংগের কবিত্বের বা শিল্পকার্যের বাহন হইতে কোন বাধা নাই। কৃত্তিবাসের 'সীতাহরণে রামের বিলাপ' পরিচ্ছেদে এক একটি পয়ার যেন মর্মভেদী বেদনার দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছেদকাতর স্বামীর নয়ন-কোণে সঞ্চিত পতনশীল এক একটি অশ্রুবিন্দুর অনবদ্য কাব্যরূপ। শিল্পকুশল ভারতচন্দ্রের হাতে এই স্থূল, আটপৌরে ছন্দ যেন সুনিপুণ মণিকার কর্তৃক পালিশ করা হীরক-হারের চোখ-ঝলসান দীপ্তি বিকীরণ করিয়াছে। তথাপি ইহাও সত্য যে এই গদ্যোপম ছন্দ অনেক অক্ষম কবিকে প্রলুব্ধ করিয়াছে; অনেক ভাগ্যবিড়ম্বিত

কবি-যশঃপ্রার্থী কবিতার পুষ্পকরথে এই মন্দগতি, শ্রমক্লান্ত অশ্বযুগল জুড়িয়া কাব্যলোকের অমরতায় উন্নীত হইতে বৃথায় গলদঘর্ম হইয়াছে। এমন কি, বৈষ্ণব চরিতকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত ছন্দপাত ভয়ে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিয়া এই শিথিল-বিন্যস্ত ছন্দের স্থিতিস্থাপকতার অপব্যবহার করিয়াছেন—ইহার মধ্যে রসনা-রুচিকর ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা, মহাপ্রভু-চরণরেণুপূত, শ্রুতিকর্কশ দাক্ষিণাত্য জনপদের নাম, কর্ণপীড়াকর দার্শনিক পরিভাষা প্রবেশ করাইবার আগ্রহাতিশয্যে ইহাতে বাড়তি অক্ষর সংযোজনা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহিরাংগিক আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে পয়ার-ছন্দের সরল লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া কাব্য-জগতের অনেক ত্রিশংকু কবিতার স্বর্গ ও গদ্যের মর্ত এই দুইএর মধ্যবর্তী প্রদেশে লম্বমান ছিলেন—এই অবলম্বনটুকু না থাকিলে তাঁহারা বহুপূর্বেই সরাসরি গদ্যের নিম্নলোকে অবতরণ কবিতে বাধ্য হইতেন।

কিন্তু সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত হইলেও এই শতাব্দীগুলি ধরিয়া গদ্য একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। পদ্যের সংগে গদ্যের একটা প্রভেদ এই যে গদ্যকে পদ্যের ন্যায় সৃষ্টি-প্রেরণার অপেক্ষা করিতে হয় না; নিতান্ত বাস্তব প্রয়োজনেই ইহার অনুশীলন অপরিহার্য। সংবাদের আদান-প্রদান, দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন, বৈষয়িক আদেশ জ্ঞাপন ইত্যাদি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত উপলক্ষে, সাহিত্য-রচনার বিন্দুমাত্র প্রেরণা বা গভীর আবেগ অনুভব না করিয়াও, গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রয়োজনমূলক গদ্য-ব্যবহার সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও, তাহার অগ্রদূত। ভাষা প্রয়োজনের পথ ধরিয়া যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, যতটা প্রকাশশক্তি আয়ত্ত করিয়াছে তাহা শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া ইহার যাত্রাপথের পাথেয় হয়। সাহিত্য-সৌধের ভিত্তির যে অংশ মাটির নীচে প্রোথিত থাকে, তাহা এই স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োগের উপযোগী রচনারীতি। গদ্যভাষা যে মুহূর্তে কণ্ঠ ও জিহ্বা হইতে লিপিবদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়, সেই মুহূর্তেই ইহা অজ্ঞাতসারে, যত সামান্য ভাবেই হউক না কেন, সাহিত্যিক শৃংখলা ও নিয়মের অধীনতা স্বীকার করে। কথিত বাণীর অনর্গল অজস্রতা লেখনীমুখে, কতকটা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করা আকার-সংক্ষেপের মধ্যে আত্ম-সংকোচন করিতে বাধ্য হয়। অভিপ্রায়ের সুষ্ঠু প্রকাশের তাগিদ ও বোধগম্যতার দাবী ইহার অপরিমিত স্ফীতিকে ঝরাইয়া ফেলিয়া ইহার অংগসৌষ্ঠব ও গতিশীলতা বাড়াইবার চেষ্টা

করে। তারপর একদিন ইহা প্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়াইয়া মননশীলতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির রাজ্যে পদক্ষেপ করে ও উহার আঁট-সাঁট, কর্মপটু, অনুশীলন-দৃঢ় শরীরটির চারিদিকে যৌবনের লাবণ্য-রেখা ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

(৩)

ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে গদ্য-সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস-সংকলনে আমরা এই ব্যবহারিক গদ্যকে কার্যতঃ অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। ইহার প্রথম কারণ এই যে এতাবৎকাল এতৎসম্বন্ধীয় উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই; দ্বিতীয় কারণ এবম্বিধ রচনায় সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অভাব। এইজন্যই আমরা গদ্য-সাহিত্যের উৎসমুখ হিসাবে (১) শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী ও (৩) রাজা রামমোহন রায়কে নির্দেশ করিয়া থাকি। এক হিসাবে এই নির্দেশ সম্পূর্ণ সংগত, কেননা ইঁহারাই সর্বপ্রথম স্থূল-প্রয়োজন-নিরপেক্ষ হইয়া গদ্যরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হিসাবে, জ্ঞান-বিতরণ, ভাষা-শিক্ষণ ও ধর্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্ক পরিচালন বিষয়কর্ম-নির্বাহ অপেক্ষা উচ্চতর ও সাহিত্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু ইঁহাদিগের প্রতি গদ্যরীতি প্রবর্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আরোপ করিলে ঐতিহাসিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ার একটা ফাঁক থাকিয়া যায়। ইঁহারা বাক্যবিন্যাসরীতি ও শব্দ-নির্বাচনের কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ নিজ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে। কেননা ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ইঁহারা কখনই শূন্য বায়ুমণ্ডলের উপর ইঁহাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। প্রচলিত ব্যবহারিক গদ্য-রীতিই ইঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল—যে অস্ত্র তাঁহাদের হাতের কাছে তৈয়ারী ছিল তাহা লইয়াই তাঁহারা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি-খননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন. এই পূর্ব-নির্দিষ্ট কাঠামোকেই তাঁহাদের নিজ উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তুর স্বাভাবিক দাবী অনুসারে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও আরবী-পারসী গদ্যের প্রভাবে উৎপন্ন ও উভয় জাতীয় ভাষা হইতে আহৃত শব্দ-সমষ্টির সমাবেশে গ্রথিত বাংলা গদ্যে লিখিত রচনাই তাঁহাদের পথিপ্রদর্শক ও গতি-নিয়ামক হইয়াছিল।

সৌভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় রচনা এখন বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্বে 'ভারতবর্ষে'

একজন লেখক দুইটি শাস্ত্রীয় পাঁতি বা অনুশাসনের নমুনা প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমার কর্তৃক তৎপুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত একখানা গাহস্থ্য-প্রয়োজন-মূলক পত্র নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে গ্রন্থ এই সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানার প্রধান কর্মচারী ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন'। এই সুসম্পাদিত, উপাদেয় গ্রন্থে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলের প্রধানতঃ রাজনৈতিক আবেদন-নিবেদন-মূলক ১৬৯টি পত্র সবিস্তারে উদ্ধৃত ও নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পত্রগুলি সাহিত্যিক গদ্য-রচনা আরম্ভ হইবার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ববর্তী— কাজেই ইহারা, সাহিত্য-প্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলা গদ্যের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল এই অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে মূল্যবান সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য ইহা হয়ত সত্য যে আদালত বা রাজসভার ভাষা ঠিক সাংসারিক জীবনে ব্যবহার্য সহজ ভাষার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নহে— তাহা কতকাংশে কৃত্রিম। রাজপ্রতিনিধিকে সম্মান জানাইবার উপযুক্ত বাঁধা গৎ ও মুসলমান আমল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত আরবী-পারসী-শব্দ-বাহুল্য এই ভাষাকে কিয়ৎপরিমাণে আড়ষ্ট, বিকৃত ও ভারাক্রান্ত করিয়াছে। তথাপি ইহাও ভাষা-বিজ্ঞান-সম্মত সত্য যে রাজসভার ভাষা নিজ কৃত্রিম মর্যাদার জোরেই সাধারণ চল্‌তি ভাষাকে প্রভাবিত করে— এইরূপ ভাষার অনুকরণই গ্রাম্য সমাজে পর্যন্ত সুরুচি ও উচ্চ সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ অভিনন্দিত হয়। মোটের উপর ইহা নিঃসন্দেহ যে মিশনারি সাহেবেরা ও সিবিল সার্বিসের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণ সংস্কৃত-প্রভাবগ্রস্ত ছিলেন না তাঁহারা এই পত্রাবলী-ব্যবহৃত ভাষাকেই নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হাতে যে ভাষা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ইহারই বিষয়োপযোগী পরিবর্তনের ফল।

(৪)

এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে। প্রথমতঃ ইহাতে আরবী-পারসী শব্দের অতি-প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ডাঃ সেন তাঁহার ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাংলায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই অধুনা অব্যবহৃত ও অবোধ্য।

নিছক রাজপুরুষদিগকে খুসী করিবার জন্য ও রাজসভা-নির্দিষ্ট আদব-কায়দার খাতিরে যে শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছিল, তাহারা বাহ্য-প্রলেপের মত ভাষার অংগ হইতে কালপ্রবাহে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, জাঁকজমকশালী ময়ূর-পুচ্ছের ন্যায় আপনা হইতেই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি আরবী-পারসী শব্দ কৃত্রিম প্রয়োজন ও ফ্যাসানের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভাষার অস্থি-মজ্জার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত একাংগীভূত হইয়াছে। ব্যবহারের সময় কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ চিনাইয়া না দিলে আমরা তাহাদিগকে বৈদেশিক আহরণ বলিয়া চিনিতে পারি না। মনে হয় যে, যে পরিমাণে বৈষয়িক প্রয়োজনের পরিবর্তে আন্তরিক আবেগ ভাষা-প্রয়োগের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ধার-করা শব্দ-সম্পদ, তা সংস্কৃতই হউক বা আরবী-পারসীই হউক, সতেজ প্রাণশক্তি ও সক্রিয়তা হারাইয়া অব্যবহৃত বস্তুস্তূপের গুদামজাত হইতে থাকে ও কালক্রমে তাহা শব্দতাত্ত্বিক ছাড়া আর সকলের স্মৃতি হইতে বিলীন হয়। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দুইখানি পত্র হইতে দেওয়া যাইতে পারে। ১৪ ও ২৮ নং পত্রে মহারাণী কমতেশ্বরী যথাক্রমে নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের গুরুতর শাস্তি ও রাজ্য-পরিচালনার হস্তচ্যুত ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাইতেছেন। এই দুই পত্রে যেখানে যেখানে হৃদয়াবেগের মাত্রা সাধারণ সৌজন্যপুর্ণ ও স্বার্থসিদ্ধিমূলক প্রার্থনার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেখানেই ভাষার মধ্যে তাড়িত-শক্তির সঞ্চার হইয়াছে ও আরবী-পারসী শব্দসম্ভার বায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। অত্যন্ত আড়ষ্ট, প্রাণহীন শব্দ-প্রয়োগের পিছনেও যে লুক্কায়িত প্রাণশক্তি থাকে ও আন্তরিক আবেগের সংস্পর্শে ইহার স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা এই জাতীয় উদাহরণ হইতেই সুস্পষ্ট হইবে।

এই অচিরগত অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা একটা বর্তমান প্রচেষ্টার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। অধুনা কোন কোন মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী-পারসী শব্দ প্রবর্ত্তন করিয়া ইহাতে মুসলমান সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেড়শত বৎসর পুর্বে সুপ্রচলিত বৈদেশিক শব্দের ক্রমিক বিলোপই এই চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছে। ঝড়িয়া পড়া পাতাকে গাছের মূল ও শাখা-প্রবাহী রসধারার সংগে পুনঃসংযুক্ত করা যায় না। প্রত্যেক ভাষারই আহরণের যুগ আছে—তাহার পর আসে দৃঢ়ীকরণ ও সুনিয়ন্ত্রণের যুগ।

আহরণের যুগ শেষ হইলে বাহির হইতে নূতন শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ভাষার শক্তি শোষণান্তিকতার বিন্দুতে (point of saturation) পৌঁছায় ও তাহার একটা নিজস্ব প্রকৃতি পাকাপাকি রকম নির্ধারিত হইয়া যায়। তখন যে সমস্ত শব্দ প্রয়োজনের বাহির-দেউড়ি উত্তীর্ণ হইয়া ভাষার অন্তরের অন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদিগকেও যেমন বহিষ্কৃত করা যায় না, তেমনি নূতন অতিথিকেও আবাহন করিয়া আনা যায় না। ভাষার দুর্বোধ্য প্রকৃতি-রহস্য নিজ প্রয়োজনমত সংস্কৃত ও মুসলমানী উভয়বিধ আকর হইতেই শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে ; এখন ইহা পণ্ডিত ও মৌলবীর তোয়াক্কা না-রাখিয়া, কোন বিশেষ সাংস্কৃতিক ফতোয়াকে উপেক্ষা করিয়া, নিজ বিধি-নির্দিষ্ট পথে সিদ্ধি-অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এখন যদি কেহ জোরপূর্বক একদিকে 'ইরম্মদ', 'হর্য্যক্ষ' ও অপরদিকে 'তকৃশীর', 'মোখালক্' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তবে উহাতে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য রচিত হইতে পারে, উহা গোটা বাঙালী জাতির সাহিত্য হইবে না।

(৫)

এই পত্রাবলীতে নিছক শব্দ-নির্বাচন অপেক্ষা বাক্যবিন্যাসরীতি (Construction of Sentences) আরও কৌতূহলোদ্দীপক ও লক্ষণীয় ; কেননা ভাষার অগ্রগতির সহিত বাক্যের সুষ্ঠু বিন্যাসই অধিকতর সম্পর্কান্বিত। মোটামুটি ইহার বাক্যগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ ও জটিল নয়। ছেদ-চিহ্নের অপ্রয়োগের জন্যই ইহাদের বিস্তার ও বোধগম্যতার অনুধাবন কতকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ছেদগুলি বসাইয়া লইলে দেখা যায় যে ইহারা মোটের উপর সুবিন্যস্ত। স্থূল প্রয়োজন আমাদের মনে যে চিন্তা-পরম্পরা জাগায়, তাহাদের পরিধি খুব বিস্তীর্ণ নহে। ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য-বোধের সুদূর-প্রসারী ভাবাসংগ (association of ideas) নাই বলিয়াই ছোট ছোট বাক্যের unit এ ইহাদিগকে সহজেই ধরিয়া রাখা যায়। বরং ইহার ঠিক পরবর্তী যুগে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আলোচনা-প্রসারের সংগে কলানৈপুণ্য তাল রাখিতে পারে নাই বলিয়াই বাক্যগঠন আরও দ্বিধাগ্রস্ত ও ভারসাম্যচ্যুত হইয়াছে। একটা সোজাসুজি নালিশ জানান বা অনুগ্রহভিক্ষা অপেক্ষা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত লেখা, বা কাদম্বরীর অনুবাদ ও ধর্মবিষয়ক সূক্ষ্ম আলোচনায় ব্রতী হওয়া ভাষা-জ্ঞান ও বাক্য-রচনার পক্ষে অনেক কঠোরতর পরীক্ষাক্ষেত্র।

কাজেই এই সমস্ত দরখাস্তকারিদের তুলনায় রামরাম বসু, তারাশংকর তর্করত্ন ও রাজা রামমোহন রায়ের বাক্যসমূহ আরও জটিল ভাবের বাহন ও ইহার পেষণে সময় সময় অনেকটা কাবু ও বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভার-বহনের সংগে সংগে ভারবহন-ক্ষমতাও যে বাড়িতেছে তাহা সুস্পষ্ট; ভাবের ক্রমবর্ধমান বোঝা বহিয়া ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বাক্যের দৃঢ়বদ্ধ, সংহত বিন্যাসরীতি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। পদস্খলনের দ্বারা দৃঢ়তর পদক্ষেপের শক্তি অনুশীলিত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্যের দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রভাব এই শক্তি ও সংহতি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং পত্রাবলীর সহিত তুলনায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সমূহ বাক্য-গঠন বিষয়ে অসম ও ত্রুটিবহুল হইলেও, উচ্চতর সম্ভাবনার বীজ ও সাফল্যের নিদর্শন বহন করে। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের (parts of speech) অন্বয় সম্বন্ধে উভয় যুগের রচনাতেই যদৃচ্ছা-প্রণোদিত শিথিলতা দেখা যায়—কাহারও কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। বিশেষতঃ বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ জাতীয় পদগুলির সংস্থাপনের মধ্যেই বিশৃংখলার চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হয়।

এই স্থলে উপসংহারের পুর্বে আর একটি প্রশ্নের উত্থাপন প্রয়োজনীয়। গদ্য যখন প্রযোজনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রথম সোপানে পা দেয়, তখন ইহার প্রকৃতি-পরিবর্তন কোন্ বহির্লক্ষণের দ্বারা সূচিত হয়? উচ্চবর্ণের হিন্দুর ন্যায় গদ্যেরও দ্বিজত্বলাভ আছে—প্রথমতঃ প্রাথমিক ভাবপ্রকাশের তাগিদে জন্মিয়া ইহা সাহিত্যের আবেষ্টনে নূতন সংস্কারে দীক্ষিত হয়। বর্ণ-হিন্দুর ক্ষেত্রে উপবীত ধারণই এই দ্বিজত্বের বাহ্য পরিচয়—ইহার অনুরূপ কোন সুনির্দিষ্ট চিহ্ন কি গদ্যের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায়? অবশ্য বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালিদের রচনায় সাহিত্যিক উৎকর্ষ এত পরিস্ফুট যে ইহাকে আর চিনাইয়া দিতে হয় না। কিন্তু মুস্কিল হয় অনিশ্চয়তাগ্রস্ত পরিবর্তন-যুগের রচনা লইয়া। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের সংগে সংগে সাহিত্যিক গুণের স্ফুরণ সমতালে অগ্রসর হয় নাই। রামমোহন, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকসমূহ, মিশনারী ও পণ্ডিতমণ্ডলী, এমন কি অক্ষয়কুমার দত্ত পর্যন্ত লেখকদের মধ্যে উদ্দেশ্যের সংগে ফলপ্রাপ্তির কম বেশী ব্যবধান লক্ষিত হয়। হয়ত কোথায় কোথায় কয়েক পংক্তি ধরিয়া রচনা সত্যসত্যই সাহিত্যোচিত প্রসাদ ও ওজস্বিতাগুণ-মণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু এই উৎকর্ষ স্থায়ী হয় নাই, কিছুক্ষণ পরে ভাষা ও বাক্যবিন্যাস

হোঁচট খাইয়া অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয় গদ্য সাহিত্যিক গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহার মানদণ্ড—বাক্যবিন্যাস-রীতির মধ্যে ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠা। যে ভাষা ক্ষণে ক্ষণে হোঁচট খায়, দাইনে বাঁয়ে ঝুঁকিয়া পড়ে, দ্রুত ও স্বচ্ছন্দগতির মধ্যে অকস্মাৎ অতিভারাক্রান্ত হইয়া ওজন ঠিক রাখিতে পারে না, যাহার ছন্দ টলমল ও অস্থির, যাহা নূতন হাঁটিতে শেখা শিশুর মত কখন মুখ থুবড়াইয়া পড়ে এই আশংকায় পাঠকের মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে, সে ভাষা সাহিত্যিক মর্যাদাকে সাময়িকভাবে স্পর্শ করিলেও পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন নহে। যেমন মানব শিশুর, তেমনি গদ্য-শিশুরও, দৃঢ়পদবিক্ষেপই স্বাধীন সত্তা-স্ফুরণের পরিচয়। ইহার পূর্বে শিশুর অস্থিগ্রন্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ অর্ধজড় অবস্থাকে মোটামুটি গর্ভকোষমুক্ত ভ্রূণাবস্থারই মিয়াদবৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। সেইরূপ গদ্যেরও দ্বিধাহীন পদ-বিন্যাসের পূর্বাবস্থাকে প্রয়োজনমূলক জীবনের পরিধি-বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় গদ্য সর্বপ্রথম দৃঢ়বদ্ধ ভার-সাম্য অর্জন করিয়া সাহিত্যিক মর্যাদায় স্থির হইয়াছে। ইহার ছন্দ হয়ত অতিমাত্রায় আত্মসচেতন; ইহার বহু-বিস্তৃত বাক্যাংশগুলি ও গুরুগম্ভীর শব্দনির্বাচন এমন একটা কৃত্রিম অলংকারবহুল মন্থরতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সজীব ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল গতিভংগীর বিরোধী। তথাপি এখানেই বাংলা গদ্যের প্রথম নিঃসংশয়িত সাহিত্যিক রূপ লক্ষিত হয়; এখানেই সর্বপ্রথম বোঝা যায় যে বাক্য আরম্ভ করিবার পূর্বে লেখকের মনে সমস্ত বাক্যটির গঠনের একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা জাগরূক ছিল এবং প্রত্যেক পদবিন্যাস এই পূর্ব-পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ববর্তী যুগের পদবিন্যাসের আকস্মিক শিথিলতা, শব্দগুলির পরস্পরের ঘাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ার প্রবণতা, কোন নূতন চিন্তার অতর্কিত উন্মেষের ফলে বাক্যের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির পরেও অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ন্যায় বাড়তি শব্দসমষ্টির সুষমাহীন সংযোজনার সহিত তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যের গঠন-সৌষ্ঠব এবং সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ বিস্তার উন্নততর শিল্পকলা ও রুচি-বোধের নিদর্শন। রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও বিষয়-গৌরব, অক্ষয়কুমার দত্তের বস্তুনিষ্ঠা ও বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, সংবাদপত্র-সেবকদের বাস্তব জীবনের সরস বর্ণনাভংগী ও কৌতূহলী, আগ্রহশীল মনোভাব সময় সময় ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তেজনাহীন, সংস্কৃত

সাহিত্যের ভাবানুবাদ-প্রচেষ্টায় অতিনিয়মিত ও মসৃণ, প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তাপ-বর্জিত রচনার অপেক্ষা উচ্চতর সাহিত্যিক উৎকর্ষ-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অস্খলিত শিল্প-কুশলতায়। তিনি গদ্যের বিশৃংখল, ছত্রভংগ জনতাকে সুশিক্ষিত, শ্রেণীবিন্যস্ত, সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অভ্যস্ত সৈন্যদলে পরিণত করিয়াছেন। পরবর্তী লেখকেরা ইহার মধ্যে গভীরতর ভাবাবেগ, সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যোপলব্ধি, উষ্ণতর জীবন-রক্তধারা ও কাব্যজগতের সুকুমার অনুভূতিরাজি সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উৎকর্ষের চরম স্তরে লইয়া গিয়াছেন ও কবিতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমান গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাদের কৃতিত্ব, ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শ রূপ-প্রতিষ্ঠার ধ্যান-স্বপ্নেরই সফলতা সম্পাদন, ঈশ্বরচন্দ্রের আরব্ধ কার্যেরই সর্বাংগ-সুন্দর পরিসমাপ্তি।

গদ্যরীতিবিন্যাসের ক্রমোন্নতির উদাহরণ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইল।

প্রথম যুগ

১। রাণী মরিচমতীর পত্র (৬নং)—"এ কারণ সন ১১৭৯ সালে ভূটিয়ার সহিত কাজিয়া হইয়া আমার ছাওাল ৺ কোমপানির স্মরণাগত হইয়া সরকার বেহার কোমপানির দখল দেলাইয়া উতপন্বের নিস্পী (অর্ধেক) কোমপানিতে নালবন্দী (অশ্বারোহী ফৌজের জন্য কর) কবুল করিয়া কাউল নামা (প্রতিশ্রুতি পত্র) আদি লেখাপড়া আপন নামে না করিয়া—ধরেন্দ্রনারায়ণকে আমার ছাওাল রাজা করিয়াছিল তাহা ভোটেরা মঞ্জুর করে না এ কারণ—(Parenthesis) রাজার কাইমাত্রে (রাজাকে কায়েম বা সুস্থির করিবার জন্য) রাজার নামে করিয়া শ্রীযুত মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেব সহিত কোমপানির ফৌজ লইয়া ভোটীয়াকে নিরস্ত করিল।" ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন', পৃঃ ৬ পত্র পৌছানর তারিখ ৯ই মার্চ্চ, ১৭৮৭)

২। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের পত্র (১২নং)—"পরে আমার গুরু শ্রীযুক্ত ৺গোশ্বামি জীউ—৺স্বর্গীয় মহারাজ বর্তমান থাকিতে অবাধ বিশ্বাষ প্রযুক্ত রাজত্তের মোক্তেয়ারী করিতেছেন—(parenthesis) তিনি জেলার শ্রীযুত মেস্তর (Mr.) মেঘডোর সাহেবের নিকট এ সকল হকিকত (অবস্থা) জাহেরে (প্রকাশ) করাত তিনী হুজুর ইতলা (সংবাদ জ্ঞাপন)

করিলে পর এবং উকিলেরদিগের দরখাস্ত মতে জেলার সাহেবের নামে হুকুম আসীয়াছিল সেমতে ৺কুম্পানীর ফৌজ পঠাইয়া অনেক তদারক করিয়া মোখালেপের (বিপক্ষের) হাত হইতে খালাশ করিয়াছেন।" ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন', পৃঃ ১৪ ; পত্র পৌছানার তারিখ, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৮৭)

৩। মহারাণী কমতেশ্বরীর পত্র (১৪নং)—"জে জে লোক আমার পর দৌরাত্য করিআছে সে সকল লোক রঙ্গপুরে কএদ আছে তাহারদিগকে মাফিক তকঃশীর (অপরাধ অনুযায়ী) সাজা হয় কুঙর মজকুররা (উক্ত) পিতাপুত্রে পাকড়া আশীয়া বিহিত প্রতিকার হবেক এমত উম্মেদে (আশায়) ছিলাম তাহাতে হুজুর হইতে কুঙর মজকুরের নামে ইস্তাহারনামা (বিজ্ঞাপন) দিতে জিলার সাহেবের নামে হুকুম আশীআছে সে মতে জেল্বার সাহেব ইস্তাহারনামা দিয়াছেন যে তুমি যতো তকঃশীর করিআছ তাহা সকল তোমাকে মাফ হইল তুমি ছয়ে মাসের মেআদে খালিসাতে (রাজস্ব বিভাগে) কিম্বা জিলার সাহেবের নিকট হাজির হও জদি এ মেআদে হাজির না হও তবে তোমার তকঃশীর মাফ হবেক নাহি এহি শুনিঞা অধীক প্রাণ ভয় হইল সর্ব্বস্য লুটীয়া লইলেক এবং বাবা মহারাজা ও আমার প্রাণ বধীতেছিল ও ৺কুম্পানির ফৌজের সহিত লড়াই করিল এমত এমত তকঃশীর মাপ হইল ইহাতে সে বড়ই পরশ্রয় পাইল অখন কুঙর মজকুর মনে করিবেক জদি এতো তকঃশীর আমার মাফ হইল তবে মহারাজা ও মহারাণীকে মারিলে সেই তকঃশীর আমার মাফ হবেক অখন সে বাবা মহারাজার ও আমার প্রাণ মারিতে কোন সঙ্কামাত্র করিবেক না আমি তাহার দাগা ও ডাকাতির ভয় করিতাম না জদি বাবা মহারাজা শীষু না হইতেন তবে তাহার মুরাদ কী ছিল।" ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন', পৃঃ ১৯ ; পত্র পৌছানর তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮)

৪। মহারাণী কমতেশ্বরীর পত্র (২৮নং)—"বাবা মহারাজ গজশীক্কার রাজা (অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারযুক্ত) কখনো হিন্দোস্থানের পাতসাহাবের মোতাবিয়ত (বশ্যতা) করেন নাই আপন মুলুকের পাতসাহি করেন·· রঙ্গপুর জীলা মধ্যে অনেক জমিদারের স্ত্রীলোক ও বালক জমিদার তাহারা আপন একৃতিয়ারে আপন আপন জমিদারি রাখিয়া মালগুজারি (রাজস্ব আদায় দেওয়া) করিতেছে আমার বর্ত্তমানে এমত হওাতে অন্য অন্য জমিদার হইতেও বাবা মহারাজ জঘন্য হইতেছেন এ বড় সরমের কথা এ রাজ্যের রেওাজ (রীতি) মতে জিবন-মৃতা ন্যায় হইতেছি সাহেব ধর্ম্ম

অবতার আমি নিতান্ত স্বরণাগত আমার ও বাবা মহারাজার হুরমত (সম্মান) দেওা-নেওার মালিক সাহেবেরা সায়াগীর (আশ্রিত) প্রতি নেকনজর (অনুগ্রহ) রাখিয়া অনুগ্রহ পুর্ব্বক হুরমত রক্ষার্থে আমার ও বাবা মহারাজের আরজ কবুল হুকুম হবেক। ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন', পৃঃ ৩৬-৩৭ পত্র পৌছানর তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৭৮৯)

পত্রগুলির ভাষা ও গতিচ্ছন্দ স্থানে স্থানে কিরূপ সরল ও সাবলীল হইয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

দ্বিতীয় যুগ

রাম-রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খৃঃ অঃ) হইতে উদ্ধৃতি।

১। "দেখ দিল্লীর বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজাগণের মান্য তাহারা ইহার করতল।"

২। "কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দেশের যশহর নামে একস্থান বেওয়ারিশ জমিদারি দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদখাঁ মহন্দরির জমিদারি ছিল সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়ারিশ স্থান কঠিন তটে গত্যাযাতের পথ নাই।"

৩। "এই অপকাশ ক্রমে বাদসাহি সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া মহামারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল (অসতর্ক) ছিল আচানক (হঠাৎ) মারি পড়নতে অনেক অনেক মারা গেল বক্রিরা আপন আপন সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোন দিগে পলায়ন করিল ভয়াকুল শিবাগণেব মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।"

৪। "বেগম বিসন্নবদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।—চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপুর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ হা নাথ করিয়া বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমেব বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায় হায় রবে রোদন

করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল ছল আক্ষিতে রোদন করিলেন।"

(বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' অনুরূপ রচনার সহিত তুলনীয়—কাব্যাদর্শে প্রভাবিত করুণরস বর্ণনার সহিত বাস্তব জীবনের শোকাবহ ঘটনা-বর্ণনার প্রভেদ লক্ষণীয়।)

৫। "তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই।"

৬। "অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমারদের পরে তুমি তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবা যে মত আমি করিতেছি তোমার খুড়ারদিগে—"

(বাক্যবিন্যাসরীতি মথি-লিখিত সুসমাচার' জাতীয় পাদরী-রচিত বাংলা পুস্তকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছাত্রদের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।)

তৃতীয় যুগ

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৮১৮-৩০) হইতে উদ্ধৃত—

১। "এই কলিকাতা মহানগরে অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো কাহারো যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াস সাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক এক বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ পথবর্ত্তী হন।" (সমাচার-দর্পণ, ১৬ মার্চ্চ, ১৮২২, পৃঃ ১২৮)

২। "আমি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরে নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলি বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ কেহ ছোট ছোট ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে

এই বালকগুলি কোন কোন বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

"এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালিটোলার দিকে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকের দিগের জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্যকরত কহিলেক 'কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা' 'বাবুকা লড়কা' ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানা প্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিত বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে......অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোষাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাসকরণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহার দিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।" (সমাচার-চন্দ্রিকা, ২২শে জানুয়ারি, ১৮২৭; পৃঃ ১২৯-১৩০)

শ্লেষাত্মক মনোবৃত্তির প্রভাবে এই দুইটি রচনার ভাষা কিরূপ তীক্ষ্ণাগ্র, বাহুল্যবর্জ্জিত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাক্যবিন্যাসরীতির দিক দিয়া কয়েকটি মাত্র প্রয়োগ বাদ দিলে ইহা প্রায় আধুনিক ভাষার সমতুল্য হইয়াছে। তবে বাক্যের মধ্যে কোন ধ্বনি-প্রবাহ বা ভার-সাম্য এখনও অনুভূত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা ভাষায় এই দুইটি গুণ আরোপিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বাস্তব অনুভূতির অভাব সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ ও শিল্প-সৌন্দর্য-সৃষ্টির দ্বারা অনেকটা পরিপূরিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা অত্যন্ত সুপরিচিত বলিয়া তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। সংবাদপত্রলেখকদের হাতে বাক্যবিন্যাসরীতি যে পরিমাণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা হইতে আর একপদ অগ্রসর হইলেই আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্যে পৌছাইতে পারি। এইখানেই বাংলা গদ্যের প্রথম আত্ম-সচেতন পরিণতি ঘটিয়াছে। ইহার পর বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির হাতে ইহা কেবল শিল্প-সৌষ্ঠবের গণ্ডী ছাড়াইয়া উচ্চতর সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; এবং বিচিত্র, উচ্ছল প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নূতন নূতন সৌন্দর্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

(১)

আধুনিক বংগ-সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যে কোন মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইলেই এই প্রাধান্যের অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া যায়। বহুদিন পূর্বে বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সাঁতে ব্যুভ উপন্যাসের এই প্রসার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাস সমগ্র সাহিত্যকে গ্রাস করিয়া লইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কেবল ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই সার্থক হইয়াছে তাহা নহে; সুদূর বংগদেশের সাহিত্য সম্বন্ধেও ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে। এখন প্রত্যেক নূতন চিন্তা, মানব-জীবনের প্রত্যেক নূতন সমস্যা, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার, দর্শন ও সমাজ-নীতির গণ্ডী ছাড়াইয়া উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আলোচিত হইতেছে; এমন কি, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসাও উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগের উপন্যাস সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নূতন রকমের গৌরব ও মর্যাদার দাবী কবিতেছে—ইহার উদ্দেশ্য কেবল পাঠকের মনোরঞ্জন করা অপেক্ষা আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। আমাদের বংগ-সাহিত্যও উপন্যাসের এই নব-লব্ধ গৌরবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; নূতন সমস্যা আলোচনা ও মানবের প্রাথমিক ভাবগুলির খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে ইহার ক্রমশঃ অধিকতর প্রবণতা দেখা যাইতেছে। ফলতঃ আমাদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার যে একটা মুখ্য অংশ উপন্যাস রচনার দিকে নিয়োজিত হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। সেইজন্য ইহার বর্তমান কৃতিত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়।

পূর্বে উপন্যাসের যে একটা গভীর ভাবগত ও উদ্দেশ্য-গত পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে সমালোচকেরা 'বাস্তবতা-প্রধান' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। আমরাও আমাদের আধুনিক উপন্যাস-গুলিকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়াছি, এবং ইউরোপীয় বাস্তবতা-প্রধান

উপন্যাসগুলির লক্ষণ ও উদ্দেশ্যসমূহ আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ঐ সংজ্ঞাটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। বাস্তবতা যে উপন্যাসের জীবনী-রস ও প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি তাহা সকলেই মানিয়া লইবেন। বাস্তবতার প্রেরণাতেই উপন্যাসের জন্ম; মধ্য-যুগের অসাধারণ, কল্পনা-প্রধান, আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত ও ধর্মাভিমুখী জীবন-কাহিনী হইতে সাধারণ ও সত্য জীবনে প্রত্যাবর্তনই উপন্যাসের প্রথম কাজ। Richardson, Fielding প্রভৃতি প্রথম যুগের ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে এই তীব্র বাস্তবতা, অতি সাধারণ জীবনের রসোপলব্ধি তাঁহাদের রচনার প্রধান লক্ষণ। Fieldingএর উপন্যাসগুলি কতকটা ভ্রমণ-কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত; নানারূপ কৌতূহলপূর্ণ সংঘটন, অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি ও মারামারির উত্তেজনা, ঘটনা-পারম্পর্যের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন তাহাদের উপর কতক-পরিমাণে রোমান্সের অসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জীবন্ত-চরিত্র-সৃজন ও তাৎকালিক সমাজ ও সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি নিখুঁত ও সত্য বিবরণ ইহাদিগকে বাস্তবতা গুণেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। Richardson এর উপন্যাসে অসাধারণত্ব ও বাহ্য-ঘটনা-বৈচিত্র্য একেবারে বর্জিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস Pamelaতে একজন নিম্নশ্রেণীর দাসীর প্রণয়-নির্যাতনের অভিজ্ঞতা অতি সূক্ষ্ম ও পুংখানুপুংখ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—কোনও অসাধারণ বা চমকপ্রদ ঘটনার দ্বারা পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করা হয় নাই। কিন্তু নির্যাতিত দাসীটির প্রতিদিনকার তুচ্ছতম কাহিনীটি আশ্চর্য নিপুণতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। রিচার্ডসনের উপন্যাসে যে অবিমিশ্র, অসংস্কৃত বাস্তবতার মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

এখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে রিচার্ডসনের বাস্তবতা ও আধুনিক যুগের বাস্তবতার মধ্যে প্রভেদ কি? বাস্তবতা যখন সকল যুগের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ, তখন বর্তমান যুগের উপন্যাসকেই বিশেষ করিয়া বাস্তবতা-প্রধান বলার হেতু কি? প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকদের যে বাস্তবতা, তাহা নিতান্ত সরল ও সাধারণ প্রকারের; তাহা প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার রসানুভবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; বিশেষতঃ তাহা জীবনের প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি

সাধারণ জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত উপন্যাস কল্পনার সংকীর্ণতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবের জন্যই মানব-চিত্তের গভীরতর আদর্শ-বিকাশগুলিতে অবতরণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহারা যে চেষ্টা করিয়াও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই রোমান্সের অসাধারণত্ব ও দীপ্তি বর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেরূপ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের বাস্তবতার একটি বিশেষ তীব্রতা ও গূঢ় অর্থ আছে—ইহা জীবনের চিরপ্রথাগত রোমান্সের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ও গুরুতর অভিযোগেব উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কট প্রভৃতির উপন্যাসে জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে সৌন্দর্য ও আদর্শ-প্রিয়তার (idealism) জন্য প্রকৃত সত্যকে বিসর্জন করা হইয়াছে। রোমান্সে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের সহিত তুলনায় কল্পনারই আধিক্য দেখা যায়। জীবন-সমস্যার যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, তাহাতে সত্য অপেক্ষা ভাব-প্রবণতারই অধিক মর্যাদা রক্ষা হইয়াছে: পুণ্যের সহিত সুখের যে একটা নিত্য সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে, তাহা আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত দেখিতে পাই না। তারপর জীবনের কতকগুলি বিকাশকে ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়া নিয়মিতভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে; অথচ এই অনাদৃত, উপেক্ষিত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেই জীবন-রহস্যের গোপন বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই সংকীর্ণতার ফলে মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে। অনেকটা এইরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই আধুনিক বাস্তবতা-ধর্মী ঔপন্যাসিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা সত্যের নগ্নমূর্তির সাক্ষাৎ লাভের জন্য তথাকথিত সুনীতি ও সুরুচির দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা রোমান্সের রঙীণ আলোক বর্জন করিয়া সত্যের তীব্র জ্যোতিঃর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন; জীবনকে আদর্শলোকের জ্যোতির্মণ্ডল হইতে সরাইয়া আনিয়া তাহাকে সত্যের আলোকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা সগৌরবে এই অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইয়াছেন; বাস্তব জগৎ ও উপন্যাস-জগতের মধ্যে পূর্বকালে যে একটি ব্যবধান ছিল তাহাকে অতিক্রম করিয়া উপন্যাসকে সম্পূর্ণ ও অবিমিশ্র-ভাবেই বাস্তবানুগামী করিয়াছেন। প্রথম যুগের বাস্তব উপন্যাসের এরূপ স্পর্ধা

ও আত্ম-গৌরব ছিল না—তাহারা নিতান্ত বিনীতভাবে নিজ ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলি করিয়া যাইত। চিরপ্রথাগত গণ্ডীগুলি অতিক্রম করিবার দুঃসাহস তাহাদের ছিল না, নিষিদ্ধ ফলের মধ্যে জীবনের গোপন রহস্যের অনুসন্ধানই তাহাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে নাই। এই আদর্শ ও প্রসারের বিভিন্নতাই এই দুই জাতীয় বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাসের মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

(২)

ইউরোপীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস যে কতদূর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুবিদিত ; সুতরাং তাহার কোন বিস্তৃত পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে কিরূপ সামাজিক ও চিন্তা-গত অবস্থার জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে এরূপ একটি গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হইল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হইবে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে বহুদিন ধরিয়া দুইটি ধারা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক যুগে রোমান্সের প্রতি প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; তাহার পরবর্তী যুগে বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য একটা বিশেষ ব্যগ্রতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইউরোপের বিগত যুগটিকে মোটের উপর রোমান্টিক যুগ বলা যাইতে পারে ; ইহাতে সকল বিচিত্র বিকাশের মধ্যে কল্পলোক-সৃষ্টির চেষ্টা, কল্পনার লীলা-ময়তা ও আদর্শের অনুসরণই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই রোমান্সের বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই পরবর্তী যুগে আর্টকে বাস্তবতার দিকে প্রবলবেগে ঠেলিয়া দিয়াছে। উচ্চ বিষয়ের ধ্যান-ধারণায় ও রঙীণ স্বপ্নময়তায় বিরক্তি জন্মিলে মানুষ স্বভাবতঃই বাস্তব জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে আপন মনকে নিয়োজিত করে, তাহাকে আকাশ-বিচরণ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মৃত্তিকার সহিত নিবিড়, ঘনিষ্ঠ সংযোগে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তারপর পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান মানুষের জীবন-বিশ্লেষণের প্রণালীর উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—জীবনটাকে লইয়া সে রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, নির্মম সত্যনিষ্ঠার সহিত সে সমস্ত পুরাতন, কল্পনা-প্রসূত সংস্কারকে পরিহার করিয়া জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে বসিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রবৃত্তি সমূহের কিরূপ প্রকৃতি, ঠিক কি ভাবে তাহারা মানব-মনের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহারা কতদূর পর্যন্ত আত্ম-সংযমের বশীভূত, কিরূপ অনিবার্য বেগের সহিত তাহারা

সময় সময় শাসন-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে, মানব-মনে পাশবিক ও ঐশিক উপাদান সমূহের কিরূপ আশ্চর্য সংমিশ্রণ হইয়াছে—ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য প্রশ্নগুলির কেবল সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে উত্তর দিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না; আমাদের উচ্চ আকাংক্ষা ও আদর্শসকল এসত্যের প্রখর আলোকে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া উঠিতেছে; আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ছিন্নপক্ষ হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু বাস্তবতা-ধর্মী ঔপন্যাসিক সত্যনিষ্ঠার দোহাই দিয়া আমাদিগকে এই সমস্ত আশা-ভংগের মনোকষ্ট অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিতেছেন। আবার, ইউরোপের অধিকাংশ লোকের মনেই প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রকৃত বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। আমাদের বর্তমান জীবনে সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষতঃ, এই ব্যবস্থার ফলে স্ত্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক বিধিবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর ইহাদের একটা গভীর সন্দেহ ও তীব্র অভিযোগ আছে। ইহাদের এই অভিযোগ কেবল যে সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, ইহারা তাহাদের নিজের জীবনেও এই বিদ্রোহ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ও জীবনকে এক নূতন আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং তাহাদের রচিত সাহিত্যে তাহারা যে সমস্ত পরিবর্তনের আভাস দিতেছে, যে নূতন আদর্শের প্রতি অংগুলিসংকেত করিতেছে, তাহাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকুক বা না থাকুক, তাহারা যে কেবল একটা স্থূলভ রুচি-বিকারের পরিচয় মাত্র নহে, পরন্তু জীবনের গভীর প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে উদ্ভূত তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যে দৃঢ়-ভিত্তির উপর আমাদের এই সনাতন সমাজ-সৌধ ও নৈতিক আদর্শ রচিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা তাহার তলে কর্দম ও পংকিল প্রবাহের আবিষ্কার করিয়া ইহার ক্ষণভংগুরত্ব ও কৃত্রিমতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের শান্তিময় সংসারের চতুর্দিকে শৃংখলিত প্রবৃত্তির ক্ষুব্ধ গর্জন শুনা যাইতেছে; আমাদের সমুদয় যত্ন-রচিত ব্যবস্থার পিছনে অবরুদ্ধ বন্যার প্রলয়-কল্লোল অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইতেছে; আমাদের পরিচিত যন্ত্র-বদ্ধ জীবন-যাত্রার মধ্যপথে ধ্বংসের বিরাট গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া আছে। 'বর্তমানকালের বাস্তব উপন্যাস আমাদের আপাত-দৃষ্টিতে নিরাপদ জীবনের মধ্যে এই সমস্ত অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনার প্রতি আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে।

ইউরোপের এই আধুনিক বাস্তব উপন্যাস-সাহিত্যের সম্বন্ধে আরও দুই

একটি কথা বলিবার আছে। যাঁহারা বর্তমান যুগের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, তাঁহারা বাস্তব সমস্যার আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও উচ্চ আদর্শবাদ বা গভীর সহানুভূতিকে বিসর্জন দেন নাই। তাঁহাদের উপন্যাসে বাস্তব ও আদর্শবাদের একটা চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক হার্ডির নাম এই হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে নির্মম বিশ্লেষণের সহিত একটা গভীর, করুণ মনোভাব ও খেদপূর্ণ সহানুভূতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তিনি জীবনের স্বাভাবিক কলুষ-প্রবণতা ও প্রলোভনের নিকট শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ভাবলেশশূন্য, শুষ্ক নির্মমতা, বা কুৎসিতের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর আকর্ষণ এই উভয়বিধ দোষকে পরিহার করিয়াছেন। পাপ ও পদস্খলন তাঁহার শুদ্ধ, সংযত, অনাবিল করুণাধারায় ধৌত হইয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা এই উচ্চ আদর্শে উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু বাস্তব উপন্যাসের প্রকৃত গৌরব বুঝিতে হইলে আমাদের হার্ডির ন্যায় ঔপন্যাসিকের নিকট যাইতে হইবে।

আবার কেবল চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বাস্তবতা ঔপন্যাসিকের আর্টের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পূর্বকালের উপন্যাসে ভাল-মন্দর মধ্যে সীমারেখা যেরূপ সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত জীবনানুগামী বটে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বাইবেলে লিখিত আছে যে শেষ বিচারের দিন ভগবান সমুদয় মনুষ্যকে পাপী ও পুণ্যবান এই দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু কোন মানব-ভাগ্য-বিধাতার হস্তে ও জীবনের এপারে এরূপ সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ মোটেই সম্ভবপর নহে। পূর্বকালের ঔপন্যাসিকেরা তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একেবারে শাদা ও কালো এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীতে ভাগ করিতেন; আধুনিকেরা এই শ্রেণী-বিভাগে বিশ্বাস করেন না বলিয়া তাঁহাদের চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই ধূসরবর্ণ, ভাল-মন্দে মিশ্রিত। সেই জন্যই দেখা যায় যে পূর্বকালের আদর্শ-চরিত্র নায়ক ও নায়িকা ক্রমশঃ উপন্যাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। চরিত্র-চিত্রণে যাহা কিছু অস্বাভাবিক ও অসাধারণ—অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, অতর্কিত অনুতাপ প্রভৃতিও ক্রমশঃ উপন্যাসের সীমা-বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে। আবার ভাষার দিক্ দিয়াও অপরিমিত উচ্ছ্বাস ও কেবল কবিত্বময় বর্ণনা বর্জনের

দিকেও চেষ্টা চলিতেছে। সর্বত্রই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতি, মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতি একটা সতর্ক, সজাগ দৃষ্টি খুলিয়া রাখার লক্ষণ সমগ্র বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে এই নূতন পরিণতি কেবল কতকগুলি লোকবিশেষের খেয়ালের দ্বারাই প্রবর্তিত হয় নাই, পরন্তু একটা গুরুতর সামাজিক ও ভাবগত পরিবর্তনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত নূতন উপন্যাসের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, নারী-পুরুষের মধ্যে যেরূপ নূতন সম্পর্ক গঠন করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। প্রতি পাতায় লেখকের উদ্দেশ্যের গভীরতা ও ভাব-প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায়—লেখক যে কতকগুলি প্রকৃত ও অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তিনি যে কেবলমাত্র কাল্পনিকতার সূক্ষ্ম জাল বয়ন করিতেছেন না, তাহা আমরা নিঃসংশয়িতভাবে অনুভব করি। সুতরাং যে বাস্তব উপন্যাসে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, যাহা কেবলমাত্র একটা কলুষিত প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য সুরুচির সীমা লংঘন করে না, বা যাহাতে আলোচিত সমস্যাগুলি কল্পনা-প্রসূত না হইয়া জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত, তাহা উচ্চ অংগের আর্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমাদের কোন দ্বিধা হয় না। এখন এই সমস্ত মূল সূত্রগুলি মনে রাখিয়া বংগ-সাহিত্যেব আধুনিক উপন্যাসের ধারাটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বোধহয় তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

(৩)

বংগ-সাহিত্যে বংকিমচন্দ্রের পর হইতেই এই নূতন ধারার প্রবর্তন হইয়াছে। বংকিম যে অদ্ভুত শক্তির সহিত কল্পনা ও বাস্তব তথ্য মিশাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন সে শক্তি তাঁহার কোন পরবর্তী লেখক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন নাই। যে মন্ত্রবলে তিনি অতীতের সিংহদ্বার খুলিয়া বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র-রহস্য তাঁহার সহিতই লোপ পাইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বংকিমের অন্ধ ও অক্ষম অনুকারিবৃন্দ তাঁহার ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক প্রণালীর রহস্যটি মোটেই ধরিতে পারেন

নাই ; ইতিহাস তাঁহাদের হাতে বিকৃত হইয়া তাহার বাস্তব স্বরূটি ও বিশ্বাস্যতা হারাইয়াছে ; রোমান্স আতিশয্য-দুষ্ট ও কল্পনা-স্ফীত হইয়া একেবারে অপ্রাকৃতের চরম সীমায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বংকিম যেরূপ সুকৌশলে ইতিহাস রোমান্স ও বাস্তব জীবনকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন, অদ্ভুত প্রতিভা-বলে তাহাদের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্তীদের মধ্যে সেই গুণের একান্ত অভাব। বংকিমের প্রতিভা আমাদের সমাজ-জীবনের চিরন্তন অভাবগুলি কল্পনার প্রভাবে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া, একরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছিল বলিলেও চলে ; তাঁহার মৃত্যুর পরে আমাদের প্রকৃত জীবনের একান্ত দৈন্য ও রিক্ততা, অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের একান্ত অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া ঐতিহাসিক ও রোমণ্টিক উপন্যাসের পথে অনতিক্রমণীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বংকিমের পরবর্তী কোন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকই তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিকতার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই এবং যাতায়াতের অভাবের জন্য সেই পথের রেখা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বংকিমচন্দ্রের পরে উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে গভীর পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান-বলে বংকিম-প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কার্যে লাগাইয়াছেন। যদিও বংকিমের শেষ বয়সের উপন্যাসে এই বাস্তব-প্রবণতা স্পষ্টই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যেও রোমান্সের দীপ্তি ও উত্তেজনা আনিবার জন্য লেখকের একটা প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'বিষবৃক্ষে'র অকস্মাৎ অন্তর্ধান ও অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলন রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানী ; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পিস্তলের শব্দটি রোমান্সের ক্ষীণ নিঃশ্বাসবায়ুরূপেই আমাদিগকে স্পর্শ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হইতে এই রোমান্সের ক্ষীণ ইংগিত ও আভাসগুলিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে—তিনি রোমান্সের মোহ ও উত্তেজনা হইতে নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াই বাস্তব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি 'নৌকাডুবির' ও 'গোরার' মত উপন্যাসে,

যেখানে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘটন আমাদিগকে রোমাণ্টিক পরিণতির প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখে, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাভাবিক আশার বিরুদ্ধা-চরণ করিয়া অসাধারণ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সাধারণ ও বাস্তব ফলাফলের দিকে আমাদিগকে লইয়া যান। সুতরাং আমাদের আধুনিক উপন্যাসে যে নূতন ধারাটি প্রবর্তিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই তাহার প্রথম উৎপত্তিস্থল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসে বংকিমের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়। তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' ঐতিহাসিক উপন্যাসেব আদর্শে লিখিত ও সেই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণ-বহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবল-ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই; ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের রুদ্র মূর্তি ও হিংস্র ভীষণতা অপেক্ষা বসন্ত রায়ের আনন্দবিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ জীবন-কাহিনী আমাদের মনে গভীরতর ভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনু-ভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবন-পাত্র যে করুণ, মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—যে উদাস, বিরহ-ব্যথাতুর রাগিণী তাঁহার গীতি-কবিতার বাঁশীতে এরূপ মনোহর সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শোনা যায়। 'প্রতাপাদিত্য' তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নহে—সংসারের নির্মম ক্রূরতা, যাহা আততায়ীভাবে আমাদের প্রকৃত সুখ ও শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে ও আমাদের সুকুমার, সৌন্দর্যপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দয় পেষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্তি মাত্র। সেইরূপ 'রাজর্ষিতে'ও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রংগভূমি যেন দুইটি আত্মার দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মোগলসৈন্যের আক্রমণ, শাহ সুজার রাজধানী—এই সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক-ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজীর মত চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের জনশূন্য প্রান্তরের উপর রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; তাহার অর্থহীন কোলাহল ও ব্যর্থতর চেষ্টার পশ্চাতে এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি নীরবে স্থির হইয়া আছে। এক

বালিকার করুণ-কোমল হৃদয় ও একটি শিশুর অর্ধোচ্চারিত, অস্পষ্ট কথা তাঁহাকে সংসারের সাধারণ প্রচেষ্টা হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে ও তাঁহার গভীরতম অন্তরে যে শান্তির মংগল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে, অবিরত বারিসেকের দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই দুইখানি উপন্যাসে ইতিহাস এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রসে ভরপুর হইয়া তাহার কঠিন বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিশেষত্ব ইহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেই প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'—এইগুলিই তাঁহার পূর্ণ প্রতিভার দান এবং এইগুলিতেই তাঁহার বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে তিনি সম্পূর্ণরূপে বংকিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে যদি কিছু রোমান্স থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী, অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের খুব তীব্র বিকাশ, ও বাহ্য বৈচিত্র্যের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী। এইখানে উপন্যাস-সাহিত্য অতীতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া এক নূতন পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণেই ইহাদের প্রধান রস; অন্তরের প্রবৃত্তি-সমূহের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও সংঘাত বর্ণনাতেই ইহাদের মুখ্য আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের উপন্যাসে রোমান্সের অবসর কত অল্প, এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উপর জোর করিয়া অসাধারণত্ব আরোপ করিতে গেলে, অস্বাভাবিকতাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে। বংকিমের উপন্যাসের সহিত তুলনায় ইহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অবিমিশ্র বাস্তবতা অনেক বেশী এবং লেখকের মনোবৃত্তি ও আদর্শও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বংকিম তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও কল্পনার রঙীণ আলো ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বৈধ ও অবৈধ যে কোন উপায়েই হউক জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শ-লোকের আলোকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ধীর প্রবাহটির অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের বাস্তব জীবনে স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেইগুলিতেই আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বংকিমের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা যে কম বা অগভীর তাহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে—তবে তিনি অন্তর্দৃষ্টি-বলে একটি বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া খুব অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দীর্ঘকালব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের

একটা সাধারণ সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া অর্থপূর্ণ ইংগিতের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চিত্রটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের গ্লানি ও বিরোধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চিত্রটিকে আরও অনেক বেশী পূর্ণাংগ করিয়া তুলিয়াছেন ও পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্বাচিত তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে বাস্তবতার ভাবটি দৃঢ়তর ভাবে অংকিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই রোমান্স ও বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।

বাস্তবতার পরিমাণ লইয়াও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে আর একটি সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'য় যে বাস্তব গুণটি দেখা যায় তাহা নীতি ও রুচির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ; আজকাল 'বাস্তবতা'র মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আসিয়া জড়িত হইয়াছে, বাস্তব বলিলেই যে প্রচলিত-নীতি-বিরুদ্ধ জীবনের একটা উপেক্ষিত অংশের কথাই মনে পড়ে, ইহাদের মধ্যে বাস্তবতার সেই তীব্র প্রকাশটির সেরূপ প্রাধান্য নাই। 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে বাস্তবতা আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছে—দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা সংকীর্ণতা ও বন্ধন আছে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ইহাদের মধ্যে তোলা হইয়াছে; স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কটিকে বেষ্টন করিয়া যে একটি ভাব-প্রধান, তথা-কথিত পবিত্রতার গণ্ডী রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাহিরের প্রলোভন ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে প্রবেশ করান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংযম ও সুরুচির সহিত এই বিপজ্জনক বিষয়ের সীমান্তরেখাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন— আগুনে ঝাঁপ দিবার পূর্বে পতংগ যেমন একটা ব্যাকুল আগ্রহের সহিত দীপ্ত অগ্নিশিখার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে, লেখকও সেইরূপ একটা মনোহর অথচ ভয়াবহ নূতন অনুভূতির চারিদিকে দ্বিধাগ্রস্ত অথচ প্রচণ্ডরূপে আকৃষ্ট মানবাত্মাকে ঘুরাইয়াছেন। অগ্নিশিখাকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পতংগের মনে কি ভাব জাগে তাহা বোধহয় মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত; কিন্তু এই কান্ত-ভীষণ আদর্শের মোহ যে হতভাগ্যকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মানসিক অবস্থা অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রতিরুদ্ধ-বেগ-চঞ্চল ও একটা অপ্রত্যাশিত ভয়ানক পরিণতির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত জীবনটা একমুহূর্তে কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া কক্ষ-ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় একটা দুর্নিবার মত্ত ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আলোড়িত হইতে থাকে; চক্ষুর সম্মুখে নূতন নূতন বিভীষিকা আলেয়ার আলোর মতই অস্থিরভাবে কাঁপিতে থাকে, জীবনের পরম আশ্রয়

ও একান্ত নির্ভরগুলি ধূলিসাৎ হইয়া যায়—যাহা কিছু জীবনের আদর্শ ও সাধনার লক্ষ্য ছিল সমস্তই অর্থহীন কুসংস্কারে পরিণত হইয়া পড়ে। একদিকে চরম সার্থকতার স্বর্গ ও অপরদিকে পতনের অতল-স্পর্শ গহ্বর তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। জীবনের এই অগ্নি গর্ভ মুহূর্তগুলিই বাস্তবতা-ধর্মী ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে বর্ণনীয় বস্তু—এবং ইহাকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, সৌন্দর্যস্রোতে গলাইয়া ও মিশাইয়া দিতে হইলে, অসাধারণ কলা-কৌশল ও সৌন্দর্য-জ্ঞানের প্রয়োজন—নতুবা তাঁহার সৃষ্টিকার্য ব্যর্থ প্রয়াসমাত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এক 'ঘরে বাইরে' ছাড়া আর কোথাও প্রলোভনের এই প্রলয়ংকরী মূর্তি দেখান হয় নাই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ জীবনের উজ্জ্বল ও আদর্শমূলক বিকাশগুলিকে কোথাও একেবারে বাদ দেন নাই। 'গোরাতে' যে সমস্ত সামাজিক ও ধর্মজীবন-গত সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সহিত একটা বিরাট আদর্শের জ্যোতিঃ সম্মিলিত হইয়াছে। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ যেমন ঘোরতর বস্তু-তান্ত্রিক, নিখিলেশও সেইরূপ ঘোরতর আদর্শবাদী; উভয়েই প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে—নিখিলেশ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে বিধি-নিষেধের বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে একেবারে বিশুদ্ধ আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাহে; সন্দীপ তাহার সর্বগ্রাসী লালসার তৃপ্তির জন্য তাহার ব্যক্তিত্বের বিপুল শক্তিতে সমস্ত নিয়ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে উন্মুখ। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথে আদর্শবাদের সহিত বাস্তবতার একটি সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাঁহার মধ্যে বাস্তবতা কিরূপ আকারে ও কতটা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত। এখানে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী ও প্রাচুর্যগুণোপেত লেখকও বাস্তব প্রণালী অনুসরণ করিয়া মোটে ৪।৫ খানির বেশী উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই। আর এই উপন্যাসগুলির বিষয়-বস্তুর আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহারা সাধারণ জীবন-যাত্রার বিবরণ হইতে নির্বাচিত নহে, আমাদের বংগদেশের প্রাত্যহিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে সেরূপ কাহিনী খুব অনায়াসলভ্য নহে। এক 'চোখের বালি'কেই আমরা আমাদের সাধারণ

জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্ত দেখিতে পারি, অন্যান্য উপন্যাসগুলি কিছু না কিছু অসাধারণ সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হইতে উচ্চ কলা-কৌশলের উপযোগী বিষয়-নির্বাচন করা ও তাহাকে একখানি বৃহদাকারের উপন্যাসের মধ্যে বিস্তার করা কতটা দুরূহ ব্যাপার। বোধহয় এই বিষয়-নির্বাচনের দুরূহতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ বড় উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া ছোট গল্প রচনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ হইতে বাস্তব উপন্যাসের প্রসার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আশাপ্রদ ধারণা হয় না।

(৪)

রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র বাস্তব উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, ও নানা দিক দিয়া উহার মধ্যে রস ও উচ্চাংগের কলাকৌশলের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর একনিষ্ঠতার সহিত উপন্যাসের সেবা করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাস্তবতাও আরও অধিক ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। রবীন্দ্রনাথে যাহা অস্ফুট ও অর্ধোচ্চারিত ছিল, শরৎচন্দ্র তাহাকে প্রচণ্ড শক্তি ও অসংকোচ নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের প্রকৃত সামাজিক জীবনের পরিচয় যেন একটা শোভন অন্তরাল ও সূক্ষ্ম যবনিকার মধ্য দিয়া সংসাধিত হইয়াছিল—সেই জন্যই তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ আবরণহীন ও নগ্ন করিয়া দেখেন নাই,—ইহার আকাশ-বাতাস, ইহার জীবন-যাত্রা ও সমস্যা ইহার হৃদয়হীনতা ও বিরল মাধুর্য সকলেরই উপর একটা স্বচ্ছ মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-কাহিনীগুলির মধ্যে এই দূরত্বের সুরটি বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী; তাঁহার কবির প্রাণ যেন এই অতি-সাধারণ জীবন-যাত্রার ভিতরকার রহস্যটির মর্যাদা প্রাণপণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছে, অতি-পরিচয়ের অবহেলার মধ্যে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছে। তিনি তাঁহার 'দৃষ্টিদান' নামক সুন্দর গল্পে তাঁহার অন্ধ নায়িকার মুখে যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই একটু সামান্য পরিবর্তিত ভাবে তাঁহার বাস্তব-চিত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য—সেগুলিতে যেন বস্তু-অংশ যতদূর সম্ভব ছাঁকিয়া ফেলিয়া রস-অংশটুকুকেই ঘনীভূত করিয়া তোলা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র কিন্তু এরূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া আমাদের সামাজিক

ও পারিবারিক জীবনকে দেখেন নাই—তিনি পল্লীগ্রামের মানুষ বলিয়াই আমাদের পল্লীসমাজকে এত সূক্ষ্মভাবে ও এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমাজের সমস্ত নীচাশয়তা, হৃদয়হীনতা ও ক্ষুদ্রতার তিনি এমন একটি নির্মম চিত্র দিয়াছেন, যাহা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরল; এবং এই চারিদিককার সর্বব্যাপী কঠোরতার মধ্যে করুণা ও সমবেদনার যে ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত আছে, তাহাও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে মর্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বিষয়-নির্বাচনে ও সামাজিক চিত্রাংকনে শরৎচন্দ্র আরও গভীরতর স্তর স্পর্শ করিয়াছেন, বাস্তবতার পথে আরও নির্মম ও একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি উপন্যাসে হতভাগ্য মানুষের উপর আমাদের এই সংকীর্ণমনা, অন্ধ, প্রাণহীন আচার-সংস্কারের ভারে অবসন্ন ও অচেতন-প্রায় হিন্দুসমাজের বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী এক অসহ্য বেদনার ও দৃপ্ত বিদ্রোহের রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন অধিকতর সুপরিস্ফুট, ও এই অনাবৃত বাস্তবতার মধ্য দিয়া তিনি যে করুণ রসের ভোগবতী-ধারা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আর্টের দিক দিয়া তাঁহার বাস্তবতাকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

শরৎচন্দ্র বাস্তবতার আর একটি পথ দিয়াও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। 'বাস্তবতা'র যে বিশেষ অর্থটি আজ-কাল সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আরও গভীরতর রেখায় অংকিত দেখা যায়। তিনি আমাদের সামাজিক জীবনের এমন একটা দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, যাহা এতদিন পর্যন্ত নৈতিক অনুশাসনের জন্য সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত ছিল। প্রেম বস্তুটি যে কত বিচিত্র ও কত বিস্ময়কর, ইহার ক্রিয়া যে কতই নিগূঢ় ও অপ্রত্যাশিত, ইহা যে কিরূপ অসম্ভব ও বিসদৃশ ঘটনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, দীর্ঘদিনের মোহ-নিদ্রার পর কত অকস্মাৎ ইহা নব-লব্ধ চেতনার ন্যায় জাগিয়া উঠে, জীবনের সমস্ত গ্লানি ও কদর্যতার মাঝে কিরূপ আশ্চর্য উপায়ে নিজ জীবন ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া থাকে, দেহের সমস্ত কলংককালিমার স্পর্শ হইতে আপনার মুক্তি সাধন করে, জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে নিজ ভগবদ্দত্ত গৌরব-মুকুটের দীপ্তি ম্লান হইতে দেয় না—প্রেমের এই রহস্য-মণ্ডিত, মহামহিমময় জীবন কাহিনীটি, যাহা আমরা সাধারণতঃ একটা উচ্ছ্বাসময় অস্পষ্ট কল্পনার মধ্য দিয়া অনুভব

করি, তাহাই শরৎচন্দ্র একেবারে অতি প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছ অনুভূতির রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমের এই রহস্যময় জীবনী-শক্তির উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি বিশেষভাবে সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতার জীবন-কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। যাহাদিগকে ঘটনাচক্রে দুর্দমনীয় প্রলোভন বা পুরুষের আশ্বাস-বাণীতে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপনের জন্যই পাপের পিচ্ছিল-পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে রমণীসুলভ কোমলতা বিদ্যমান ও একনিষ্ঠ প্রেম নিজ উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই তাঁহার বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। সমাজের চক্ষে যে পদস্খলন তাহাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, যাহার জন্য তাহারা চিরদিন সমাজের গণ্ডী হইতে নির্বাসিত হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের পক্ষে তাহাই তাহাদের প্রেমের বিচিত্র স্ফুরণের হেতু হইয়াছে—তাহাই তাহাদিগকে প্রেমের আসল স্বরূপটি চিনাইয়াছে ও প্রেমের অনপনেয় মহিমাটি তাহাদের মনে গাঢ়তরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সমাজ তাহাদিগকে কোন অধিকার দেয় নাই; কিন্তু এই অধিকারচ্যুতির ফলেই তাহারা প্রেমের সনাতন গৌরবটি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, আরও ব্যাকুল প্রতীক্ষা, শংকিত অভ্যর্থনা ও করুণ-কঠোর প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া তাহাকে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রেম প্রায় সুপ্ত-অচেতন ভাবেই সমস্ত জীবনটি কাটাইয়া দেয়, গৃহকার্য সম্পাদন ও সন্তান-পালনের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিচিত্র অনুভূতি ডুবাইয়া দেয়, কর্তব্যকে আপন সিংহাসনে বসাইয়া নিজেকে সেই সিংহাসনের একপার্শ্বে সসংকোচে সরাইয়া রাখে, সেই প্রেম এই পতিতাদের মধ্যে আশ্চর্যরূপে সতেজ ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়া একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ও গৌরবের দাবী করিয়াছে; তাহাদের অন্তরে যে ব্যর্থতার অশ্রুস্তর জমাট বাঁধিয়া আছে, সেই তুষার-কঠিন প্রদেশ হইতে একটা উগ্রতর উজ্জ্বলতার সহিত, আরও অদ্ভুত বর্ণচ্ছটা-মণ্ডিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এই নব-জাগ্রত প্রেমের প্রতি মুহূর্তে এক নূতন অনুভূতি ও নবীন প্রকাশ; ইহা যৌবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা একটানা, বৈচিত্র্যহীন স্রোতে প্রবাহিত নহে; ইহার মধ্যে প্রণয়ের অনন্ত সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহু একটা জোয়ার-ভাটা আসিতেছে, অহরহ একটা গূঢ় আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চলিতেছে, অভিমান-ক্রোধ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বিকারের ভিতর দিয়া ইহার অন্তরস্থ মাধুর্য আরও গাঢ়তর ও সুস্বাদু হইয়া উঠিতেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লইয়া আমাদের সাহিত্য-জগতে যে একটা ঘোরতর বিচার-বিতর্কের ঝড় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আর্ট ও নীতির মধ্যে যে একটা ক্রমবর্ধনশীল বিরোধ-ভাব আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার মধ্যে নিষ্পত্তি করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় এবং কোন একটি সাধারণ সূত্রের প্রয়োগে সে বিরোধের মীমাংসা অসম্ভব। প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থা অনুসারে স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে লেখক যে পরিমাণে প্রচলিত নীতির সীমা উল্লংঘন করিয়াছেন সেই পরিমাণে কলা-সৌন্দর্য অবতারণা করিতে পারিয়াছেন কি না। তারপর, লেখক যে সমস্ত বাস্তব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের সমাজের পক্ষে কতখানি প্রকৃত সমস্যা, কতটুকুই বা কাল্পনিক তাহারও বিচারের প্রয়োজন। আবার এই সমস্ত বাস্তব সমস্যার উপর লেখকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ছাপ না থাকিলে তাহারা আমাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না বাস্তবতার নামে যাহারা অবাস্তবতা চালাইতে চাহেন, আর্ট হিসাবে তাঁহাদের এ অপরাধ অমার্জনীয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মোটের উপর একটা আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুর শুনিতে পাওয়া যায়—আর তিনি যে সমস্ত বাস্তব সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহারা প্রায়ই আমাদের সমাজের অবিসংবাদিত প্রয়োজনের উপর অধিষ্ঠিত এবং আমাদের প্রকৃত জীবনের মধ্যেও কম-বেশী প্রতিফলিত। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী লেখক ও অনুকরণকারীদিগের হাতে বাস্তবতা আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক ও অনুমানসিদ্ধ অবস্থার বিরক্তিজনক বিশ্লেষণে পরিণত হইয়াছে, ও কুৎসিত প্রসংগ অবতারণার উপায় মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। যে সব সমস্যা আমাদের নিজের নয়, বিদেশ ও ভিন্ন সমাজ হইতে আমদানী, যে বিদ্রোহ আমাদের গৃহকোণে ও পারিবারিক জীবনে ধূমায়িত হয় নাই, কিন্তু জাহাজ বোঝাই হইয়া সদ্য বন্দরে অবতরণ করিয়াছে, যে আশা-আকাংক্ষা আমাদের সামাজিক জীবনে মুকুলিত হয় নাই কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেগুলির উপর বাস্তবতা-ধর্মী উপন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে যে তাহার ভিত্তি বিশেষ দৃঢ় ও প্রশস্ত হইবে না ইহা নিশ্চিত। আর এই বাস্তব সমস্যার আলোচনার মধ্যে যদি লেখকের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি না থাকে, ইহা যদি লেখকের প্রাণের রসে সিক্ত

ও সিঞ্চিত না হয়, ইহাতে তিনি যদি অপরের উক্তি ও ধার-করা ভাবের সন্নিবেশ করেন, তবে বাস্তবতা তাহার সমস্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণ হারাইয়া উৎকট বীভৎসতাতে পরিণত হইবে। আমাদের বাস্তবতা-ধর্মী উপন্যাসের বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত মূল সূত্রগুলি সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

(৫)

যাহা হউক আপাততঃ এই প্রসংগের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া শরৎচন্দ্র ভবিষ্যৎ উপন্যাসের জন্য কতখানি নূতন রাজত্ব জয় করিয়াছেন ও কিরূপ উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির যেন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি আমাদের এই বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের মধ্যে যে নূতন রসধারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবসর আছে। কিছুদিন ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে তিনি প্রায় একই রকম চরিত্র সৃজন ও ঘটনা-বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন মাত্র—তাঁহার প্রতিভার নবীন উন্মেষ যেন প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য ও গূঢ় রসের সঞ্চার করিয়াছেন—(১) পতিতা বা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা রমণীর চরিত্রে তিনি এক অপরূপ মাধুর্য ও আশ্চর্যরূপ বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ প্রেমের আবিষ্কার করিয়াছেন ; ও (২) আমাদের সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে তিনি ভালবাসাকে একটি নূতন ও অপ্রত্যাশিত প্রণালীর মধ্যে প্রবাহিত করিয়া তাহার ঘাত-প্রতিঘাত ও ভাব-বৈচিত্র্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসে ভালবাসা বিবিধ ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিমাতা সপত্নী-পুত্রের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহপরায়ণ এবং সংসারের সাধারণ বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই স্নেহ যেন একটা প্রতিরুদ্ধ-প্রবাহ নদীর ন্যায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে ও পরিবারের ভিতর নানারূপ নূতন আবর্ত ও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে ;—ইহাই শরৎচন্দ্রের খুব মনের মত বিষয়

ও সামান্য পরিবর্তনের সহিত তিনি একাধিকবার এই বিষয়ের আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে এই বিস্ময়কর নূতনত্বই আকর্ষণের প্রধান কারণ হইয়াছে। এক একখানি উপন্যাস স্বতন্ত্রভাবে পড়িবার সময় এই একই প্রকার ব্যাপার ও প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি আমাদিগকে ততটা পীড়িত করে না বটে, কিন্তু সমস্ত উপন্যাসগুলির এককালীন আলোচনার সময় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে এই পুনরাবৃত্তি কল্পনা-দৈন্যের পরিচায়ক। অবশ্য কোন কোন পরিবারে এই অসাধারণ বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু যদি আমাদের সামাজিক জীবনে এই বিশেষত্বই মাত্র কেবল আলোচনার বিষয় হয়, তবে যেন সমাজের চিত্রটি ঠিক সত্যানুযায়ী হয় না—অসাধারণ স্ফুরণগুলির উপর অত্যধিক জোর দিয়া সমাজের আসল স্বরূপটি বিকৃত করা হইয়াছে, এই ধারণা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। শরৎচন্দ্রের সমস্ত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যেই একটা পারিবারিক সাদৃশ্য (family likeness) সহজেই লক্ষ্য করা যায়—সকলেই স্নেহপরায়ণা, কিন্তু একটা প্রখর তেজস্বিতা ও প্রভুত্বপ্রিয়তার দ্বারা অন্তরের এই স্নেহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ও পরিবারের অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে ভুল বুঝিয়া বা তাহাদের এই হিতকর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া একটা বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিষয়টি খুবই উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীচরিত্র অভিন্ন-প্রকৃতি হইলে ও তাহাদের ব্যবহার একরূপ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে, তাহাতে বৈচিত্র্যের হানি হয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ সমস্ত পতিতাকেই যদি শ্রেষ্ঠ সতীত্বগুণের অধিকারিণী করিয়া, দেখান হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থার এইরূপ বৈপরীত্য-সাধনে আমাদের সত্যনিষ্ঠা সায় দিতে চাহে না। এইরূপে বাস্তবতার কেন্দ্রস্থলে এক নূতন রকমের অবাস্তবতার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং শরৎচন্দ্র যে ইহার জন্য অনেকটা দায়ী তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং শরৎচন্দ্র যে নূতন পথ প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বেশী দূর অগ্রসর করিতে পারে নাই—তিনি জীবনের যে অংশ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা ঠিক কেন্দ্রস্থল না হইয়া সীমান্ত-প্রদেশ-পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে, ও এই নবাবিষ্কৃত পথ দিয়া ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক যে তাঁহার বিজয়-রথ অধিক দূর চালাইতে পারিবেন সেরূপ আশার বিশেষ ন্যায়সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৬)

এই বাস্তবতা-প্রধান, বিদ্রোহী উপন্যাসের বিরুদ্ধে আর এক প্রকার উপন্যাসের প্রবর্তন হইয়াছে, যাহাতে বিদ্রোহের পরিবর্তে আমাদের সনাতন সামাজিক ও নৈতিক আদর্শকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, ও তাহার গৌরব ও মহিমা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। উপন্যাসের এই বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহিলা-ঔপন্যাসিকেরাই সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয়। বস্তুতঃ, এই উপন্যাস-ক্ষেত্রে মহিলাদের আবির্ভাব বোধহয় সাহিত্য-জগতে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। এই স্ত্রী-লেখিকারা আমাদের উপন্যাসের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, আমাদের জীবনের একটি বিশেষ দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; এবং তাঁহারা যে কার্য করিয়াছেন, তাহা কোন পুরুষের পক্ষে সমান কৃতিত্বের সহিত করা সম্ভব ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। স্ত্রী-প্রকৃতি রহস্যময়ী—এই সত্য সকল দেশের সাহিত্যেই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিশেষত্বের জন্য, অপরিচয় ও অনভিজ্ঞতার জন্য এই প্রকৃতিগত রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়াছে। যে লজ্জা-সংকোচ আমাদের স্ত্রীজাতির প্রধান ভূষণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা তাহাদের মনের উপর বেশ একটি ঘন অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ঔপন্যাসিকের পক্ষে দুর্লংঘ্য অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবাধ ও অসংকোচ মিলনের কোনই সুযোগ নাই; কোন পুরুষ-ঔপন্যাসিকই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্পর্ধা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আমাদের নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ- প্রত্যেকের সহিত আমাদের যে বিশেষ সম্পর্ক তাহাকে সেই আসনে বসাইয়াই দেখি, তাহাকে সেই নির্দিষ্ট আসন হইতে সরাইয়া অপরাপর দিক্ হইতে দেখিবার কোন চেষ্টা করি না। আবার সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক কর্তব্যের চাপে আমাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফুরণ হয় না। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষেরা যাহা কিছু লেখেন, সমস্তই খুব সংকীর্ণ প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহারা যে গৃহস্থালীর একটা সজীব যন্ত্র মাত্র—এই ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য স্ত্রীলোকের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার আলোচনার জন্য, তাহাদের মূক, সংকুচিত আশা-আকাংক্ষাগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিবার

জন্য, স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল—পুরুষের হাতে চিরকাল চিত্রতুলিকা থাকিলে রমণীর প্রকৃত পরিচয় লাভ আমাদের মধ্যে অসম্ভব হইত। বিশেষত আমাদের জীবনের এই অধ্যায়টি একেবারে অপঠিত রহিয়া গিয়াছে; স্ত্রীলোকের অন্তরের ইতিহাস এপর্যন্ত প্রকৃতভাবে লিখিত হয় নাই—যাহারা সংখ্যায় এত বেশী ও প্রকৃতিতে এত বিচিত্র, তাহাদিগকে আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াই সন্তুষ্ট আছি। সেইজন্য যে উপন্যাস স্ত্রীজাতির প্রকৃত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিবে, তাহাদের বাহিরের ঐক্যের মধ্যে অন্তরের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে কত অধিক তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এই মহিলা ঔপন্যাসিকদের প্রথম পথ-প্রদর্শক বোধ হয় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী; এবং তাঁহার পর বর্তমান যুগে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, ৺ইন্দিরা দেবী এবং সীতা ও শান্তা দেবী উপন্যাস-ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলিকে স্ত্রীলোকের দিক হইতে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ করুণরস, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহানুভূতির সহিত স্ত্রীজাতির নীরব সহিষ্ণুতা, ও প্রচ্ছন্ন বেদনাটিকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে তাঁহাদেব মধ্যেও একটা কল্পনা-দৈন্যের, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও কতকটা পুরুষোচিত ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। ইঁহাদের প্রায় সকল উপন্যাসেই দাম্পত্য মনোমালিন্যের কাহিনীই সামান্যরূপ পরিবর্তিত হইয়া আলোচিত হইতেছে—এই দাম্পত্য কলহে কখনও বা স্বামীর, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীর প্রতিই আমাদেব সহানুভূতি প্রবলতর হয়। এই বিরোধের কারণ ও বিস্তৃত বিবরণ প্রায় সকল উপন্যাসেই অভিন্ন, কেবল শেষটি কোথায়ও বা মিলনান্ত আর কোথায়ও বা বিয়োগান্ত। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোকের সুরটি, স্ত্রীজাতি-সুলভ লঘুস্পর্শ ও সূক্ষ্মদর্শিতা, ইঁহাদের অনেকের মধ্যে একটা পুরুষোচিত পাণ্ডিত্যাভিমান ও বিশ্লেষণ-বাহুল্যের নীচে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। ইংরেজী উপন্যাসে যেমন Jane Austen অথবা George Eliot এর প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতে লেখিকার জাতি-পরিচয় মুদ্রিত আছে, আমরা যেমন লেখকের নাম না জানিয়াও তাহাদের রচনার মধ্যে স্ত্রী-হস্তের কোমল স্পর্শটি অনুভব করি, আমাদের দেশের স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস ভিন্ন অন্য কোথাও সে স্পর্শটি পাওয়া যায় না। তাঁহাদের

সাধারণ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পুরুষের আদর্শ ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি-দত্ত শক্তিটি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা যদি এই নিষ্ফল অনুকরণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তির অনুশীলন করেন, গৃহকোণের যে রহস্যটি পুরুষ-চক্ষুকে এড়াইয়া নীরবে কবি-প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাকে সূর্যালোকে টানিয়া বাহির করিতে পারেন, স্ত্রী-চরিত্রকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অন্তরংগ পরিচয়ের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহারা আমাদের উপন্যাসকে গৌরবমণ্ডিত করিতে এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অনুমান করা যাইবে যে আমাদের বংগ-সাহিত্যে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ নহে। যখনই কোন লেখক আমাদের জীবনের মধ্যে কোন নূতন রসধারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তখনই দেখা গিয়াছে যে এই রসধারা কিছুদিনের পর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অবিচ্ছিন্ন বেগ ও প্রবাহ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদের বাস্তব-জীবনের সংকীর্ণতা ও উচ্চ আর্টের পক্ষে অনুপযোগিতা। আমাদের জীবন ক্ষুদ্র স্বার্থে ও ক্ষুদ্রতর বিরোধে এতই খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত, শুধু বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাতে এতই বিব্রত যে ইহাতে উচ্চ আর্টের উপাদান নিতান্ত দুর্লভ—ইহা কোন আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর বা কোন প্রবল চিন্তাধারার প্রবাহে মুখরিত হয় না। সেইজন্য ঔপন্যাসিক তাঁহার বিষয়-নির্বাচনে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়েন—বাস্তব জীবন তাঁহার উপযোগী হয় না বলিয়া তিনি কেবল অসাধারণত্বের খোঁজেই ফিরিয়া বেড়ান। সুতরাং তিনি প্রথম হইতেই বাস্তবের একটা রূপান্তরিত বা বিকৃত রূপ, সাধারণ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম লইয়া আরম্ভ করিতে বাধ্য হন। আমাদের বাস্তব জীবনের আরও একটা অসম্পূর্ণতা এই যে, ইহা হইতে একটা পূর্ণাংগ উপন্যাসের উপযুক্ত প্রচুর উপাদান সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব—ইহা দীর্ঘজীবিতায় যত হীন, রস-প্রাচুর্যের দিক দিয়া ততোধিক অভাব-গ্রস্ত। আমাদের জীবনে যে বিরোধ বা সমস্যাসংকুলতা, তাহা বড় জোর একটি ছোট্ট গল্পের কলেবর পূর্ণ করিতে পারে ইহাকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করিতে গেলে বুনন খুব ফাঁক হইয়া পড়ে এবং মন্তব্যের প্রাচুর্য দিয়া বক্তব্যের ক্ষীণতা পূরণ করিতে হয়। আমাদের দাসত্ব-লাঞ্ছিত, সীমাবদ্ধ জীবনে বিরোধ কেবল

অন্তর্গূঢ় হইয়া গুমরিয়া মরে, কোন দুঃসাহসিক কার্যের ভিতর দিয়া বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল অলস মধ্যাহ্নে কপোত-কূজনের মত একটা নিষ্ফল ক্ষোভ ও হতাশ শ্রান্তির সুরটিকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে মাত্র। প্রতিভা এই দুর্ভেদ্য পাহাড় কাটিয়া যে রাস্তার রেখাটি বাহির করে, কিছুদিন পরে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে সেই পথটি আবার রুদ্ধ হইয়া যায়। বংগ-সাহিত্যে উপন্যাসের ইতিহাস এই নূতন পথ আবিষ্কার ও অল্পদিন পরেই তাহার স্বাভাবিক বিলোপের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। এই সমস্ত কারণেই মনে হয় যে আমাদের সামাজিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন না হইলে আমাদের মধ্যে উপন্যাসের পরিণতির সম্ভাবনা খুব অল্প। উপন্যাসের সহিত তুলনায় বরঞ্চ ছোটগল্পেরই সামাজিক অবস্থার সহিত উপযোগিতা বেশী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে আমাদের জীবনের যত বৈচিত্র্য, যত রসধারা, যত রোমান্স ঘনীভূত হইয়া আছে, বোধ হয় সমস্ত উপন্যাসগুলি একত্র করিলেও তাহার অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের জীবন-নাটক যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহার রংগমঞ্চও তদনুরূপ ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। একটি ক্ষুদ্রায়তন গল্পের পরিধির মধ্যেই আমাদের বাস্তব-জীবনের যাহা কিছু গাঢ় ভাব, যাহা কিছু সমস্যাসংকুলতা তাহার বোধহয় বিনা কষ্টে স্থান সংকুলান করা যাইতে পারে। প্রভাতকুমারের ক্ষুদ্র গল্পগুলিও স্বাভাবিকতা, সরলতা ও হাস্য-রস-প্রাচুর্যে আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আমাদের জীবন যতদিন পর্যন্ত বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ, রসসমৃদ্ধ ও প্রকৃত জাতীয়ভাব-পুষ্ট না হইয়া উঠিবে, ততদিন উপন্যাস তাহার অস্বাভাবিক পিংগলতা পরিহার করিয়া স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে না। বোধ হয় প্রত্যেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখিবার সময় এই সত্য মনে মনে অনুভব করেন। তাঁহারা যদি এই সত্যকে সাহসের সহিত স্বীকার করিয়া ইহাকে প্রকৃত কার্যে পরিণত করেন, এবং কেবল সংখ্যাধিক্যের মোহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া অনুপযোগী বিষয়ালোচনার দ্বারা সাহিত্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া না তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী মংগল হইতে পারে— এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় নিতান্ত অসংগত হইবে না।

সমাপ্ত